বাংলা অনুবাদ ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া. 1960

মূল রচনা : মানবেনী ভবায় (গুজরাটী)

Manaveni Bhavai (Bengali)

ডিস্ট্রিবুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমাণ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-110016 দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীশ্যামল কুমার মিত্র, নালন্দা প্রেস, 159-160 বিধান সরণী, কলিকাতা-700006 হইতে মুদ্রিত।

এক সফল প্রয়াস

পান্নালাল প্যাটেল যে অত্যন্ত প্রতিভাবান কথাশিল্পী এ কথা তাঁর রচনা প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য-অনুরাগী পাঠক মাত্রেই জানতে পেরেছে। বঙসল মেঘাণী ভাই (স্বঃ ঝবে্রচাঁদে মেঘাণী) তাঁর দুটি উপন্যাসকে—'বল্লালমণাং' (বিদায়) ও 'মল্লেলা জীব' (প্রিয়পাত্র)—এই কারণেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছোটো বড়ো অন্য সমস্ত রচনা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কিন্তু 'মানবীনী ভবাই' অন্য সব রচনার থেকে আলাদা। গল্পের শিল্প-চাতুর্য আমরা 'মল্লেলা জীব' এবং 'সুখ দুঃখ—না সাথী' (সুখ-দুঃখের সঙ্গী) উপন্যাস দুটিতেও পাই। কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় 'মল্লেলা জীবে' আগাগোড়া যে শিল্পসৌষ্ঠব বর্তমান, পরিমার্জনার অভাবে 'মানবীনী ভবাই'-য়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু শিল্পের সার্থকতা—শিল্পের বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা কাহিনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক বেশি প্রকাশিত। দুঃখ ও বেদনা প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে অনুকম্পা জাগিয়ে তোলে—সে অনুকম্পা যদি কেবল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় তা হলে শিল্প হয়তো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে কিন্তু রীতির দিক দিয়ে শালীনতা প্রাপ্ত হয় না। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন —Beauty is the grandeur of good! ঠিক সেই ভাবেই শিল্প যখন ব্যক্তি ছাড়িয়ে গোষ্ঠীর ছোটো ছোটো সুখদুঃখের আধার নিয়ে সৃষ্টির আলোড়নকারী তরঙ্গমালার মধ্যে নিজের নৌকা চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তখনই তা সার্থকতার দাবি করতে পারে।

আদি কবির অনুকম্পা তো জেগে উঠেছিল ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগব্যথায়— কিন্তু সেই অনুকম্পা-জনিত বাণীর বিষয়বস্তু হল

রামের বনবাস ; মহৎ শিল্প ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনাকে উপেক্ষা করে না, বরঞ্চ তাকে উপরে তুলে ধরে। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকা ঘটনার বিন্দুগুলিকে একত্রিত করে পাঠকদের অনুকম্পাকে জাগিয়ে তোলে, সমাজের অসুস্থতার মূলে কোথায় কোথায় আঘাত করা প্রয়োজন তা মুখর না হয়েও জানিয়ে দেয়।

মহাভারতের আদিপর্বে শান্তনু, গঙ্গা, শিখণ্ডী ও ভীষ্ম -চরিত্রগুলি কেবল তাদের ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশের জন্যে চিত্রিত করা হয় নি। তারা নিজেদের অজান্তেই কুরুক্ষেত্র ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলার কুশীলব মাত্র।

লে মিজারেবল উপন্যাসের জাঁ বালজাঁক শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয়, সমগ্র সমাজের বেদনার প্রতীক, তা না হলে এই সাহিত্যকৃতি অন্য বহু রত্নকণাসম উজ্জ্বল কাহিনীর মতো দ্বিতীয় অধ্যায়েই শেষ হয়ে যেত। একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে যদি তার গল্প লেখা হত তা হলে তার কারাজীবনের দুঃখ এবং বিশপের দ্বারা তার হৃদয় পরিবর্তন—এই দুটি প্রসঙ্গেই কাহিনী শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কেবল জাঁ বালজাঁক আর বিশপই জগৎ নয়, সমাজও রয়েছে। সেখানে জাঁ বালাজাঁকের মতো মানুষকে সৎ বা অসৎ পথে ঠেলে দেবার জন্যে সকলেই আগ্রহী। সেইজন্যেই ভিক্টর হুগোকে থেনার ডিয়রের মতো নিষ্ঠুর ধূর্ত, অরণ্যের সৌন্দর্যে বিভোর মোবুফ, আদর্শবাদী এঞ্জোলর্স, প্রেমিকা মেরিয়ম এবং অত্যাচারী নিয়মের পূজারী শিকারী কুকুরের মতো হিংস্র জেবার্টের মতো পাত্রপাত্রীকে নিয়ে আসতে হয়েছে আর গল্পের পটভূমিকাকে জেল থেকে আরম্ভ করে গীর্জার পরিবেশে আবর্তিত করে বিপ্লবীদের অবরোধ সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়েছে কারণ জাঁ বালজাঁক শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়। ক্ষুধার্ত পাগলী বুড়ী থেনার ডিয়রের মৃত্যুর পর তাকে মেরিয়ম চুম্বন করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। এমন ইচ্ছার পোষণকারী তরুণীও জাঁ বালজাঁকেরই একটি রূপ। বিপ্লববাদীরা ওর তৃতীয় রূপ। হুগোর এক সৃষ্টির কাহিনী লেখার ইচ্ছে ছিল। এ-সব ছাড়া

সেই মহৎ শিল্প সার্থক হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক মহান শিল্প তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তা ব্যক্তিবিশেষের কাহিনীকে সৃষ্টির সুখদুঃখের মাধ্যম করে তুলতে পারে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'নৌকাডুবি'কে 'ঘরে-বাইরে'র সঙ্গে তুলনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'নৌকাডুবি'ও একটি বিশিষ্ট শিল্পকৃতি, কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'-তে যে তীব্র উন্মাদনা আর তার প্রকাশের সামঞ্জস্য দেখা যায় 'নৌকাডুবি'তে তা পূর্ণরূপে অনুভব করা যায় না। কারণ নৌকাডুবিব রমেশ ও কমলার সংঘাত ও ভাবনা ব্যাপক ও জটিল হওয়া সত্ত্বেও তা যেন ঐ চরিত্রদের সঙ্গেই জন্ম নিয়ে তাদেব সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়; 'ঘরে-বাইরে'র নিখিল, সন্দীপ অথবা বিমলার দুঃখের ক্রীড়াক্ষেত্র একই সঙ্গে ব্যষ্টি-সমষ্টির যুগ্ম ক্ষেত্র।

শ্রীপান্নালাল প্যাটেল 'মানবীনী ভবাই'-এর মতো কালপ্রধান উপন্যাসে এক নতুন দিগন্তেব উন্মোচন করেছেন। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। উপন্যাসের নায়ক কালুর কথা তার নিজের কথা নয়; গুজরাটের পটভূমিকায় চার দশক পূর্বে বসবাস-কারী— নতুন ও পুরোনো কালেব সন্ধিক্ষণে দিক-পরিবর্তনোন্মুখ গ্রামগুলির কথা। কালু সেখানে এক নিমিত্ত মাত্র। নিমিত্ত সৃষ্টির এক উপাদান হওয়াতে সুখ ও দুঃখ কম হয়ে যায় নি বরঞ্চ কাহিনীর ভূমিকা ও গতিকেন্দ্র বদলে নতুন রূপ নিয়েছে।

মানবীনী ভবাই গ্রাম-সমাজের কাহিনী। তাকে গতিশীল করার শক্তির উৎস কাল বা সময়। সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে প্রধান চরিত্র, কাল এবং অন্য সকলেই তার সংকেতে চলছে। সমগ্র সমাজকে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে শুধু মাত্র কালুকেই পাত্র হিসেবে সৃষ্টি করে শেষ পঁচিশ বছরের বাস্তব চিত্র হুবহু ফুটিয়ে তুলতে পারার জন্য পান্নালাল উত্তরকালে আমাদের এখানে (গুজরাতী সাহিত্যে) অনেকেরই পথ-প্রদর্শক হবেন।

যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ হবার পর মানুষের দুঃখ-সুখের জগতে

ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত কাজের পরিণামস্বরূপ যে সুখ-দুঃখের সে অংশীদার হয়, তার থেকে অনেক বেশি দুঃখসুখের ভাগীদার সে সামাজিক (পারিবারিক নয়) কর্মের পরিণামস্বরূপ হতে এর ক্রমবর্ধমান প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে। প্রখ্যাত সমাজচিন্তাবিদ গ্রেহাম ওয়ালেস একে 'আমাদের সামাজিক উত্তরাধিকার' নাম দিয়েছেন এবং বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের চেয়ে এই পারম্পর্য আমাদের সুখ-দুঃখ রচনা করার প্রধান মাপকাঠি বলে জানিয়েছেন। এই বিশেষ উপলব্ধি রাজনীতি, সমাজনীতি এবং কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করলেও সাহিত্যে এতদিন এর সার্থক রূপায়ণ হয় নি। ব্যক্তি চরিত্রই প্রধান— এপর্যন্ত এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ বিশ্ব যদি ফেরগ্রীব ভূগোলের নিয়মমতো বিবর্তিত হতে থাকে অথচ আমাদের স্কুল-কলেজে টোলেমীর ভূগোল পড়ানোর মতোই অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্য এটা। চরিত্রসমূহের ভেতরেও যে চরিত্র— যাকে নাটকের সূত্রধার বলা হয়—সে তো এখন আমাদের সামাজিক অবস্থারই প্রতিভূ। এই অবস্থা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয় নি। মানবীনী ভবাই স্পষ্ট ভাবে এই অবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, ঘটনা সংঘটনে তার প্রভাব ইত্যাদি আমাদের সামনে তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছে। এই গ্রন্থকে প্রশংসা করার এটাই সবথেকে প্রধান কারণ।

কালু নির্ভীক ও সৎপ্রকৃতির যুবক। লেখকের বর্ণনা অনুসারে এই নির্ভীকতা ও সততার ভিত্তি কিছুটা বিবাদ বিমর্ষে অবিচল, দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতার অধিকারী বাবা এবং দৃঢ়-সংকল্পচেতা মার কাছ থেকে পেয়েছে। উপন্যাসের প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণিত বালার চরিত্রের যে ছবি ফুটে ওঠে তাই সমগ্র কাহিনীর কাঠামো। বহু শতাব্দীর পুরোনো গ্রামগুলি আজও টিঁকে আছে। তার প্রধান কারণ, ঝগড়া-বিবাদকে মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় কারণ দুঃখের কাছে পরাজয় স্বীকার না করা, দুঃখ থেকে পালিয়ে না যাওয়ার সংকল্প, চাষের জমির সঙ্গে জোঁকের মতো

কৃষকদের লেগে থাকার অভ্যাস। শঠতা ও ঈর্ষার অবতার স্বরূপ তার ছোটো ভাইয়ের মুখরা স্ত্রী মালী কালুর জন্মপ্রসঙ্গে শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলে জবাব দেবার জন্যে বালার স্ত্রী সচেষ্ট হতেই সে স্ত্রীকে বলে ওঠে "চুপ কর, চুপ কর। ভগবান যদি খুশি মনে দিয়ে থাকেন তো কেউ কোনো অপকার করতে পারবে না। যা, তুই ঘরে চলে যা। ঝগড়া-বিবাদের চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর নেই তুনিয়াতে।"

অন্যদিকে একান্ত শান্তিপ্রিয় বালা প্যাটেলের মধ্যে দুঃখকে বরণ করে নেবার মতো বিবেচনা বুদ্ধি ছিল। অর্ধেক বীরত্ব ও অর্ধেক ভক্তির সহায়তায় সেও কোনো রকম অসন্তোষ প্রকাশ করে না। সংসারের মধ্যে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে যখন সাধু পালিয়ে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে লেঙ্গটের গল্প বলার সময় যা-কিছু সে বলেছে তা যেন কালুর উত্তরজীবনের মূল কথা, 'তোরা জানিস কি? সাধু নিশ্চয় জাতে বদ্যি-বামুন ছিল— তা ছাড়া অন্য কোনো জাতের হলে পালাতই না। কেননা চাষারা দুঃখের দিন ভালো ভাবেই কাটাতে পারে। সাধুর মতো যদি ভাই তারাও পালাত তা হলে তো এই পৃথিবী শেষ হয়ে যেত! আর পালাতে যাবেই বা কেন? সাধু চলে যেতেই সে বুঝতে পেরে যায় যে এভাবে খাটে পড়ে থাকলে দিন কাটবে না, তাই সে উঠে দাঁড়াল। শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে সে গট গট করে ওই পাহাড়ে গিয়ে ওঠে— তোমরা সকলে দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে থলি নিয়ে বসে গঁদ বেছে রাখছে।' তিন বছরের কালুকে সে ফুলের মতো সযত্নে নিজের মজবুত বলিষ্ঠ কাঁধে তুলে নিয়ে বলে, 'এই হল সংসারের গলদ। দুঃখের দিন যে পরিশ্রম করে কাটাবে বেচারা সাধুর সে ক্ষমতা কোথায়? সে তো কেবল ভগবান এই চাষীদেরই দিয়েছেন…এই যে আমাদের এত…আরে আমাদের সকলের দুঃখ-কষ্ট রয়েছে কিন্তু দেখে নিয়ো তোমরা একটার পর একটাকে আনন্দের সঙ্গেই জয় করে নেব। কি বল খোকা?'

এই দুঃখকে জয় করে নেওয়া— পিষে গুঁড়ো করে হজম করার মনোবল, মজুতদার ব্যবসায়ীদের এই ঠাট্টা এবং কিছুটা দাক্ষিণ্য, পরিশ্রমের ভারে মৃতকল্প এই লোকেদের সত্য গৌরব কাহিনীর মহত্ত্ব সূচিত করে। বালা প্যাটেল শুধু নিজের কথাই বলে না— এই অব্যবস্থা, লুঠতরাজ, দৈব-দুর্বিপাক, মজুতদার ব্যবসায়ী, সরকার এবং আফিম প্রভৃতি দ্বারা নিপীড়িত নিষ্পেষিত ও লুণ্ঠিত তবু আশ্চর্য ক্ষমতার বলে বেঁচে থাকা ও গানের সুরে সুরে মুখরিত গাঁয়ের মেহনতী সমাজের যে মহত্ত্বের কথা বলে, তা কল্পনা বা ক্ষণিক ভাবাবেগে গড়ে ওঠা মহিমার কথা নয়— ইতিহাসের জ্বালাময়ী অধ্যায়কে অতিক্রম করে সার্থক হয়ে ওঠার মহিমা। অন্য দিকে কালুর কাছে এই শব্দগুলোই পিতার থেকে পাওয়া তার জীবনমন্ত্র।

চার বছরের কালুর কানে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বালা প্যাটেল তাকে নিজের ভাই—মুখরা অশালীন স্ত্রীর জন্য হীনমন্য পরমার হাতে সঁপে দিয়ে সে বিদায় নেয় এ পৃথিবী থেকে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদায় নেয় সেই ছোট্ট গাঁয়ের এক সাত্ত্বিক সত্তা।

যতদিন এই মহৎ সত্তা গ্রামে উপস্থিত ছিল ততদিন মালীর কোনো অনিষ্ট প্রচেষ্টা সফল হয় নি। রাজুর সঙ্গে কালুর বিয়ের সম্বন্ধ হোক এটা সে চায় নি। সেজন্যে সে কম হৈ-হট্টগোল করে নি ও নিজের কপাল কম চাপড়ায় নি। কিন্তু গাঁয়ের 'ডাইনী' ফুলী-মার সঙ্গে বালার যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকার দরুন সে কিছুতেই পাকা দেখা বন্ধ করতে পারে নি। বালা বিদায় নেবার পর সে ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। ছেলেবেলা থেকে যারা একসঙ্গে খেলেছে, মাটির ঘরবাড়ি তৈরির খেলা, লুকোচুরি খেলেছে— ক্ষেতের আলে বসে একসাথে হাসাহাসি করে কাটিয়েছে যারা তাদের দুজনকে সে আলাদা করে দেয়— আর তাতেও যেন বিধাতার সন্তোষ হয় না তাই তাদের খুড়শাশুড়ী ও জামাই-এর সম্পর্কের আত্মীয়তায় সংসারে রাখে। সাগরপারের দূর দেশে চলে গেলেও হয়তো বা অতটা মানসিক কষ্ট থাকে না। কিন্তু সে রইল তার নিজের শ্বশুর বাড়িতে

—যেন ঠিক পাশের বাড়িতে। তার নিজের সংসারে যে আসে তার নাম ভলী কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে সে একটি ঢেঁকি। ওদিকে আবার মৃত্যুর আগে কালুর মা তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেয় যে সে যেন দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে। কালুর অবস্থা অনেকটা শূলের ওপর শুয়ে থাকার মতো— তার থেকে নামতেও পারে না আবার মৃত্যুও আসে না চট করে। নিজের শ্বশুরবাড়িতেই দয়িতা রয়েছে বলেই কল্পনার ঘোড়া বারবার ছুটতে থাকে, 'তুনিয়ার লোকে যা ইচ্ছা হয় করুক, একবার তাকে আমার সংসারে আনতে পারলে লোকেরা ধিক্কার দেয় দিত কিন্তু জীবনটা উপভোগ তো করে নিতে পারতাম।' সে ভুলে যায় যে সে নিজেই রাজুকে উপদেশ দিয়েছিল যে, 'অবস্থাপন্ন পরিবার আর সুপুরুষ স্বামী পেলে তো তুনিয়ার সব মেয়েই সুখের ঘরসংসার পাততে পারে কিন্তু গরিব শ্বশুরবাড়ি দরিদ্র স্বামীকে নিয়ে সংসার করাই প্রশংসার যোগ্য।'

কিন্তু রাজু ভিন্ন রক্তে তৈরি হয়েছিল যেন। তাকে এধরনের উপদেশ দেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর যে মহিয়সী রূপ প্রকাশিত করেছে, এ তারই ফলশ্রুতি। সে যেন যৌবনের উচ্ছলতা, বাচালতা, আনন্দ-উন্মাদনা— সব-কিছুই বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসার পাঁচ ক্রোশ রাস্তাতেই ফেলে ছড়িয়ে এসেছে। একবার অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্যে নাকের নথ বিক্রি করতে রাজুকে প্রস্তুত দেখে কালু তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই যদি রাগ না করিস তো একটা কথা জানতে চাই। তুই কি সত্যিই দয়ালজীকে সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলতে চাস রাজু?'

রাজুর মুখে তুঃখের মেঘ এসে জমা হয়। ব্যথাকাতর মুখে হেসে বলে, 'তুমিও আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছ? তুনিয়ার সবাই বিশ্বাস করে যে মানুষটার মৃত্যুর পথ চেয়ে রাজু বসে আছে। কিন্তু কেন? কোন্ সুখের জন্যে? তোমরা সবাই ভেবে নিয়েছ যে রাজু খুব তুঃখে আছে। কিন্তু কিসের তুঃখ? বাবা-মায়ের তুল্য ভাসুর-জা,

তাদের ছেলেমেয়েরা আমার ভালোবাসার কাঙাল, আমার নিজের মানুষটিও তাই।' সে হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'তোমার মতো ফিটফাট বাবুটি হয়ে হয়তো দিনের মধ্যে দশ-বিশটা গালিগালাজ করতে পারত কিন্তু এ তো আমার হুকুম তামিল করতেই ব্যস্ত, প্রতি পদে আমার মন জুগিয়ে চলতে চেষ্টা করে। তবে আমার কিসের দুঃখ?'

কালু রাজুর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে। স্নেহভরা দৃষ্টিতে বলে, 'তোর মতো মেয়ে আমাদের সমাজে খুব কমই আছে রাজু, আমি তো আর একটাও দেখতে পাই না।'

লেখকের এ কথাটা ঠিকই। রাজুর মতো মেয়ে সেই সমাজে আর একটাও হতে পারে না। রাজু তো শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অলকা, ভৈরবী, অন্নদা, পার্বতী প্রভৃতি ঐ ধরনের অন্যান্য মহিয়সী নারী-চরিত্রের উদাহরণ গ্রহণ করার পর আমাদের শিল্পীর হাতে গ্রামের মাটিতে বপন করা বীজের থেকে তৈরি চারা গাছ। এই চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করার মতো আর কোনো গাছ যদি সেই গ্রামাঞ্চলে খুঁজে না পাওয়া যায় তো তার জন্যে কালুকে কোনো দোষ দেওয়া চলে না।

বৃদ্ধ বালাও গ্রামের জনতারই একজন। সেই জঘন্য ঈর্ষা প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বুড়ী মালীও গ্রামেরই একজন। ডাইনী ফুলী-মা, কাসম, বেচাত সকলেই গাঁয়ের চরিত্র। স্বয়ং কালুও। কেবল সেই শুধু যুগসন্ধিকালের ফল। কিন্তু রাজুর জন্মসূত্রের বীজ গ্রামীণ নয় যদিও সার-মাটি-জল-হাওয়াতেই সে বেড়ে উঠেছে।

কেউ যেন না ভেবে বসেন যে আমি শ্রীপান্নালাল প্যাটেলের চরিত্র-সৃজন-প্রতিভার কোনো ত্রুটি ধরার চেষ্টা করছি। শ্রীপান্নালাল প্যাটেলের প্রতিভা পরিচয় বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। তা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগপ্রসারী প্রভাবের হাত থেকে কোনো সংবেদনশীল শিল্পীর এড়িয়ে থাকার উপায় নেই, এটা তর্কাতীত বিষয়। আমাদের কেবল দেখতে হবে যে সেই

প্রভাব লেখক কিভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত করে তার নিজের সাহিত্যরচনায় প্রকাশ করতে পেরেছেন ; সেই প্রভাব অনু-করণের পর্যায়ে থেকে গেছে, না, আত্মিক চেতনায় দ্রবীভূত হয়ে গেছে।

পান্নালাল তার 'মল্লেলা জীব' এবং অন্য সাহিত্য রচনার মধ্যে এই সুর আত্মস্থ করতে পেরেছেন যা পাঠকমাত্রেই বলে দিতে পারে। জীবী ও রাজু যা-কিছু বলে বা ধারণা করে তা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আঁচ করে নিজের রীতি ও অভ্যাস মতোই করে যায়। কোন্ অবস্থায়, কী করে আগের থেকে তা কখনোই ভাবে না, তারা তো অন্য পথে যাবার জন্যে ব্যস্ত। অথচ নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে তাও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে এই ভেবে যে শক্তিমান আর নির্ভীক নর-নারীর পক্ষে এটাই শোভন।

সংসারের রীতি-নীতি আর ধর্মের বিধি-নিষেধ তাকে বাধা দিতে পারে না। তাকে বাধা দেয় কেবল তার নিজের বিবেক ও সুকুমার বৃত্তি। রাজু ভেবে দেখে যে কালুর সঙ্গে তার বিয়ের পাকা দেখা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে তার নতুন শ্বশুরবাড়ির তো কোনো দোষ নেই! আর কালুর বউ ভলীরই বা তাতে দোষ কোথায়? তা হলে কালুকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? দুর্ভিক্ষের সময়ে কালু রাজুদের বাড়িতে এসে দেখে যে একদিনের খাবার মতোও চাল আটা কিছুই নেই। উপোস করে কাটাচ্ছে তারা— না খেতে পেয়ে যারা মরেছে বাড়ির সামনেই তাদের চিতা জ্বলছে— গাঁয়ে এমন কেউ নেই যে কিছু শস্য ধার দিতে পারে— বাড়ির পুরুষেরা কোথাও সামান্য কিছু দানা পাওয়া যায় কিনা তার জোগাড়ে গেছে— না খেয়ে খেয়ে আর ভাবনাচিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া রুগ্‌ণ রাজু বলে :

'তোকেই বা চিনতে পারার মতো অবস্থা রেখেছিস কোথায়?... চাল আটা কি বাড়িতে একদম নেই?'

রাজু হাসে।... কিন্তু সমস্ত শরীর তার দুর্বল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তাই হাসিতে রক্তোচ্ছ্বাস আর থাকবে কী করে? 'অল্পস্বল্প আছে, একদম খালি কখনো হয় কী?' কিন্তু কালু বিশ্বাস করে না। সে জালার মধ্যে ধনুকটা ঢুকিয়ে অনুভব করে দেখে। তাতে দেখা গেল কিছুই নেই, একেবারেই খালি। হুকোর জন্য আগুন নিতে রাজুকে অন্য ঘরে যেতে দেখে সে বলে :

'বাড়িতে রান্নার চাল ডাল থাকলে তবেই-না উনুনে আগুন দেবে?' আর রাজু ফিরে আসতে বলে, 'হুকো সাজবার দরকার নেই, চল আমার সঙ্গে, এগিয়ে আয় দেখি।' রাজুর চেহারা দেখে সে হাসবে না কাঁদবে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কালু আবার বলে, 'আমি তোকে এভাবে বেঘোরে মরতে দেখতে কিছুতেই পারব না।'

'মরলে মহল্লার সকলেই বেঘোরে মরবে। আমি তো আর একা নই?…দুনিয়ার লোকে বলবেই বা কী? দুনিয়ার কথা না-হয় ছেড়েই দাও কিন্তু প্রাণ তো সকলেরই সমান, তাই নয় কী?'

আমিই দুনিয়া, দুনিয়াকে আমি পরোয়া করি না। তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস আমার আছে। কিন্তু এখানে, 'অন্য সকলের প্রাণ আমারই মতো—' এটাই হল সকলকে নিজের সঙ্গে একাত্মা করে নেবার অনুভূতি।

রাজু সমাজকে ভয় করে না। এ জগতে প্রাণবন্ত মানুষেরা কেউই সমাজকে ভয় করে না; মৃত্যুকেও নয়। রাজু নিজেই তো বলে, 'তুমি মৃত্যুতে বিস্মিত হচ্ছ কিন্তু আমি তো…মৃত্যুর জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছি…। রোজই তিন-চারটে চিতা ঐ সামনে জ্বলছে দেখতে পাই। ওদের সঙ্গেই একদিন আমারও জ্বলবে।' প্রাণবান ব্যক্তি তো মৃত্যুকে সাদর অভ্যর্থনা করে— তা সে যখনই আসুক-না কেন? কিন্তু রাজুর সেজন্যেও কোনো ভাবনা চিন্তা বা ব্যস্ততা নেই। তার চিন্তা কেবল আশপাশের যারা সরল দুর্বল তাদের পরিচর্যা করার ব্যাপারে। এই বিচক্ষণতা পুঁথিগত বিদ্যাবুদ্ধি থেকে আসে না, নিজের প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু থেকেই এর উৎপত্তি। হাজার

মানা করলেও ফুল যেমন সুগন্ধ বিতরণ করবেই তেমনি প্রাণবান ব্যক্তি নিজের জীবন বা মৃত্যুর কোনো ভাবনা না করেই তার ক্ষমতার সুফলটুকু উপহার দেবে। প্রায় মাসখানেকের মতো দানা জোগাড় হয়েছে দেখে রাজু খুশি হয়ে বলে, 'এই এক মাসে তো আবার সাম্রাজ্য গড়ে নিতে পারব।' মেহনতী মানুষের আত্মবিশ্বাসের ধ্বনি এটা। রোজ লাঙল চালিয়ে, হাতুড়ি পিটে আর কুড়ুলের কোপ লাগাতে লাগাতে তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে যে, যার দুটো হাত ঠিকমতো মজুত আছে তাকে কে ভয় দেখাবে ? অন্যের কাছ থেকে বীজের ধান-গম নিয়ে আসার পরও লোকদের আত্মবিশ্বাসের ওপর তার কোনো প্রভাব না পড়ার এমন দৃষ্টান্ত বড়ো একটা দেখা যায় না।

এই-সব পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রাণশক্তি নির্ভিকতা মনোবল এবং চারিত্রিক উত্তরণের চিত্র স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্য ছাপ্পান্নর দুর্ভিক্ষকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে লেখক তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও অবস্থা বর্ণনার এই আলেখ্য আমাদের সাহিত্যে সুদীর্ঘকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বর্তমান দশকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবীর মতে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শাশ্বত ঐতিহ্য প্রতিভাত হয় 'আহ্বান ও তার প্রত্যুত্তরে' : Challenge and response-তে। যে সমাজ উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারে সেই সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বয়স্কতা প্রাপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে— যেখানেই সমাজ রয়েছে সেখানেই সংস্কৃতি থাকবে এমন কোনো কথা নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে যে স্বীকার করে নিতে পারে না, তার অধীনস্থ হয়ে থাকতে চায় তার পায়ের নীচে মাটি সরে যাচ্ছে বুঝতে হবে। 'মানবীনী ভবাই'-এর কৃষিকাজের দ্বারা জীবন-নির্বাহকারী কালু-রাজু ছাপ্পান্নর দুর্ভিক্ষ তাদের কৃষিপ্রধান সমাজের গলা টিপে ধরে কামড়ে, মাড়িয়ে দলে পিষে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার কিভাবে

মোকাবিলা করেছিল? ছাপ্পান্নর দুর্ভিক্ষ শেষ হতে সমকালীনদের কাছে তার স্মৃতিই সব থেকে বেশি অস্বস্তিকর ছিল। নানার মতো স্বামীরা নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, ছেলেদের কাছে মার মৃতদেহ আচ্ছাদিত করার মতো কাপড় পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না, ভলী-রুথীর মতো স্ত্রীলোকেরা নিজেদের লজ্জা-শরম ভুলেছিল— মানুষের কাছে তখন একটাই বাসনা কেবল জেগে ছিল— কেমন করে হোক খাবার জোগাড় করা ; ভিক্ষে করে, চুরি করে, কুকুরের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা ফেলে দেওয়া এঁটো পাতা চেটে— স্ত্রীরা তো তাদের শরীর পর্যন্ত বেচে পেটের আগুনকে ঠাণ্ডা করে। মানুষের এই চারিত্রিক অধঃপতন দেখে গল্পেতে শংকর ঠিক কথাই বলেছিল, —'এই পৃথিবী সর্বংসহা তাই সব-কিছুই চলতে দিচ্ছে।' স্ত্রীরা স্বামীর সামনে, মা মেয়ের কাছে, মেয়ে বাপের কাছে লজ্জা-শরম ত্যাগ করছে।—কাল মরতে হতে পারে ভেবে আজকের দিনটা যেমন করে হোক কাটিয়ে দাও, যতক্ষণ বাঁচতে পারো বাঁচো, যা পারো ভোগ করে নাও, কোন্‌টা বা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা নীতি কোন্‌টা দুর্নীতি ভুলে যাও। সকলেই যখন একটা দুর্দম আবেগে অনুপ্রাণিত তখন তারা দুজনে আর কীই-বা করতে পারে।

রাজু তো উপোস করে দিন কাটায়। ভাসুর ও স্বামীর মৃত্যুর পরে গাছের ডাল পাতা নিয়ে এসে জায়ের বাচ্চাদের পালন করতে থাকে এবং এই-সমস্ত দেখেশুনে সমাজব্যবস্থা ভগবান মজুতদার ব্যবসায়ী আর রাজার ওপর রেগে গিয়ে কালু তার মাথা গরম করলে সে কালুকে ধমক লাগায় :

'খবরদার! আবার যদি এমন আজেবাজে কথা বলেছ কি দেখবে! এই-সব ভাবতে ভাবতেই মরতে বসেছ। নিজের শরীরের দিকে একবার তাকাও তো? বলতে পারো সব থেকে বদ ডাইনী কে?'

কালুর কাছে রাজুর গালিগালাজ গুড়ের মতো মিষ্টি লাগে। হাসতে হাসতে কথার মধ্যেই বলে ওঠে, 'সবচেয়ে বড়ো ডাইনী তো পেটের জ্বালা কিন্তু…'

রাজু বলে ওঠে, 'না, সর্বনাশা ডাইনী হচ্ছে চিন্তা।'

দুর্যোগ দুর্বিপাক— দুর্যোগের এমন কী ক্ষমতা যে আমাদের মন ভেঙে দেবে? শরীর ভেঙে গেলে মানুষের মৃত্যু হয় না, যখন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বুক ভেঙে যায় মানুষ তখন মরে। তখনই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে।

মানুষের ওপর, ভগবানের ওপর প্রকৃতি, সমাজব্যবস্থা সমস্ত-কিছুতেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেও কালু সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর শ্রদ্ধা হারায় না। সে বলে, 'মানুষ খারাপ নয়, খিদেই যত নষ্টের।' কারণ সাধারণ মানুষের ওপর যদি শ্রদ্ধা হারিয়ে যায় তা হলে সেদিন মানবজাতিকে অতল সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া শেষ উপায় বাকি থাকে কিন্তু প্রকৃতি অথবা সামাজিক অব্যবস্থা মানবজাতিকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করলেও মানব-আত্মাকে শৌর্য ও বীর্যের শিখরে দেখতে অভ্যস্ত কবিপ্রতিভা তো বলবেই, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষে পেছনের সারা পথ ছেয়ে যেতে দেখলেও মানুষের ওপরে শ্রদ্ধা হারাব না। প্রাণবন্ত গ্রাম্য কিষান কালুও তাই বলে, 'ভাই, খিদেটাই সর্বনাশা, মানুষ খারাপ নয়।' কিন্তু এ-সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা সকলের নেই। যে নিজের আত্ম-মর্যাদাকে ত্যাগ করে না—যে অযোগ্য, অক্ষমতার সঙ্গে আপস করে নিজের মর্যাদাকে অবদমিত করে, আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে না, সেই এ-সত্যকে অবলম্বন করে দৃঢ় থাকতে পারে। সেই কারণেই মৃত্যু শিয়রে এসে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কালু ভিক্ষে নিয়ে জীবন-ধারণে আপত্তি করে, নিজের নুলো হাত দিয়ে থালা-বাসন মেজে পরিষ্কার করে এক গাল ভাত নেয় কিন্তু অন্যদের সঙ্গে ভিক্ষে নেবার লাইনে দাঁড়িয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের খিচুরি-ভোগ নিতে রাজী হয় না। চতুর বুদ্ধিমতী রাজুর উপদেশও সে মানতে পারে না। লাভাস্রোত উদ্গীরণকারী আগ্নেয়গিরির মতোই বার বার তার অন্তরের ক্ষোভ বিদ্রোহ করে ওঠে, সে বলে:

'আমি বলতাম যে, পেটের জ্বালার থেকে বদ আর কিছু নেই কিন্তু

আজ তার থেকেও অনেক বেশি আপত্তিকর জিনিস দেখলাম··· খিদের থেকেও বেশি খারাপ ভিক্ষে করা। খিদে কেবল হাড়-মাংস গলিয়ে দেয় কিন্তু এই ভিক্ষে, সত্যি বলছি, রাজু, আমাদের গর্ব ও আত্মাকে পর্যন্ত শেষ করে দেয়।' শেষে রাজুর বকা-ঝকা ও অনুরোধে যায় বটে কিন্তু ভিক্ষে নেবার জন্যে অন্যদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে নিজে কিছুতে দাঁড়াতে চায় না, 'যারা তাদের গোলা থেকে ভিখারী ব্রাহ্মণ এক সাথে যতটা শস্য নিতে পেরেছে তাই দান করে দিয়েছে, যার সম্পদের কাছে সমস্ত পৃথিবী —বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা ব্যবসায়ী শেঠ এসে হাত পেতে দাঁড়ায় আজ তাদেরই হাত পাততে হচ্ছে?' এটা কী করে সে মেনে নিতে পারে? সে দল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। সিপাই তাকে বাধা দেয়:

'এই নুলো! কোথায় যাচ্ছিস চলে?'

'কোথায় আবার, আমার নিজের ডেরায়।'

'ভাগ্ বেটা হায়না, দাঁড়িয়ে থাক্ লাইনে। কী রে, শুনতে পাচ্ছিস না?'

'আমি যদি এই ধর্ম-ভিক্ষে না খেতে চাই, তা হলে?'

'কেন খাবি না রে শালা? এরা সকলে নিচ্ছে আর তুই কেন নিবি না? খুব যে লাটসায়েব হয়ে গেছিস দেখছি!'

কালু বিরক্ত হয়ে বলে, 'লাট হলে তো নিতুম, কিন্তু আমি চাষা তাই নেব না! তুই হাতে-পায়ে ধরলেও নেব না। যদি গুলি চালাতে চাস তো চালিয়ে দে বুকে, এই দাঁড়িয়ে আছি।'

সুন্দরজী শেঠকে ভালো বলতে হবে। সে তাকে কাছে ডেকে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, 'প্যাটেল ভাই, তুই কেন এই সাহায্য নিতে চাস না?'

কালু কী জবাব দেবে এর? আর দিলেও সে জানত এরা চাষীর মনকে মোটেই বুঝতে পারবে না। সামনে পড়ে থাকা এই ফসলের

সবটাই আমাদের— এ-কথা বললে ফল কিছুই হবে না। উল্টে আমার বুকে হয়তো গুলি চালিয়ে দেবে। অবশ্য ফল হতে পারত যদি এই শস্যের মালিকরা আজ হাত পাতার বদলে হাত উঠোতে পারত, তা হলে এই বন্দুকধারীরাও ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালাত!··· কালুর সেই জ্বলন্ত চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল ঝড়ে পড়ে, 'কি আর বলব শেঠ! বুকের সামনে আমাদেরই রোজগারের এই পুরস্কারের জমা করা স্তূপ দেখে আমার অন্তঃকরণ কী বলে ওঠে।'

এই অন্যায়ের— এই অব্যবস্থার প্রতিকার করাই এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। কথাশিল্পী তো প্রত্যক্ষভাবে শেঠের সজ্জনতার মাধ্যমে তাকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'ভাই, নিজের রোজগার করা জিনিস হাত পেতে নিতে তোর যেমন লজ্জা হচ্ছে, আমারও এই দানধ্যান করতে তেমনিই লজ্জা হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীকে যারা পালন করে, তাদের আমি আর ক'দিনই-বা পালন করতে পারি!··· কিন্তু পাগলা, কীই-বা আর করা যেত। প্রকৃতির কাছে আমরা সকলেই নিরুপায় ···অন্য সকলকে বলে দিস যে তোমাদেরই জিনিস তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।'

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেঠের এই নিরুপায় স্বীকারোক্তি সে সময়ের ঐতিহাসিক বাতাবরণে স্বাভাবিক ও সংগত ছিল— এবং কালুকে সে তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু লেখক কালুকে সেই স্থানের ও কালের সামাজিক জাগরণের বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই সকলের না খেয়ে অভুক্ত মরার থেকে লুঠপাট করা তার কাছে সংগত কাজ বলে মনে হয়। খিদের চোটে মৃতপ্রায় ভীলেরা গোরু-বাছুর চুরি করে নিয়ে যায়; তার নিজের কাছে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সে তাদের আক্রমণ করে না। বরং নিরস্ত্র তাদের পাথর ছুঁড়ে গোরু-বাছুর মারবার চেষ্টা করতে দেখে, সে ভুলে যায় যে, সে তাদের মেরে তাড়িয়ে গোরু-বাছুরের দলকে ছাড়িয়ে বালা প্যাটেলের ছেলের উপযুক্ত কাজ করতে এসেছিল। সে মনে মনে বলে, এরা কখন-বা এটাকে মারতে

পারবে, কখন-বা খাবার মতো অবস্থায় পৌঁছবে, আর বেচারা জন্তুটার মুক্তি হবে কখন ?

উন্মুক্ত তলোয়ার নীচে ফেলে দিয়ে বলে, 'যা বেটা তোরাই নে সব ; হে দুর্ভিক্ষের ভগবান, তোর সর্বনাশ হবে, তুই মানুষের এই রকম অবস্থা করেছিস !'

ভগবানকে এইভাবে গালাগাল দিয়ে কালু শেঠের মতোই নিরুপায় ভাব দেখিয়ে, এই অবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব নয় জেনে সে তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এতে কোথায় যেন বোকামো লুকিয়ে আছে, অন্যায় রয়েছে, বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। মহাজনদের শস্যের গোলা খবরদারী করতে আসা সেপাইদের কাছে টোটাভরা বন্দুক দেখে সে চিৎকার করে ওঠে :

'আরে হতভাগা খুনীরা ! গাড়ি থেকে শুধু টোটা আর বন্দুকই নামালি, ওরে মূর্খ, তার চেয়ে কিছু চাল-গম নামালে পারতিস। আরে মুখপোড়া, মৃত্যু তো এখানে চলতে ফিরতে পায়ে এসে জমা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তোরা সেই প্রাণ নেবার যন্ত্রপাতিই গাড়ি থেকে নামালি ! বাঁচবার মতো কিছু জিনিস যদি নামাতিস তো বুঝতাম··· মানুষ মারার তো নানা কায়দা-কানুন রপ্ত করেছিস, তার বদলে বাঁচিয়ে তোলার কোনো কায়দা বার করতে পারলে স্বীকার করতুম যে, সত্যিই তুই ছত্রিশ কলার অধিকারী···আমরা ভাবতাম তোরা দেবতার অবতার, কিন্তু না, এখন দেখছি তোরা দেবতার চেহারায় কোনো রাক্ষস।'

এর মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠছে বিশ্বব্যাপ্ত মানব-আত্মার আর্তনাদ। এখানেই রয়েছে এই প্রচণ্ড অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আবেদন।

সাগরপার থেকে আগত ইংরাজদের জ্ঞান-গরিমা এই গ্রামের অন্ধকূপে পড়ে থাকা পরস্পরবিবাদী গেঁয়ো মানুষদের থেকে অনেক বেশি উন্নত। তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এদের থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল। কিন্তু কালুর বিচারে তার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রও এই সিদ্ধান্তের নীচে দস্তখৎ করে বলবেন,

'তাদের রাজত্বকালেই সবচেয়ে বেশি দুর্ভিক্ষ ও আকাল দেখা গেছে।'

এই ভাবেই ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কাব্যিক দর্শনের মিলন ঘটে।

বর্তমানে কি সেই দর্শন অনুপযোগী হয়ে গেছে? কালুর আর্তনাদ কি এখন আর শোনা যায় না?

একটা পরমাণু বোমা তৈরি করতে সাড়ে ছশো কোটি ডলার লাগে। উড়োজাহাজের এক স্কোয়াড্রনে একটা ছোটো রাষ্ট্র পরিচালনায় যে অর্থের প্রয়োজন, তা খরচা চলতে পারে। ছোটো ছেলেমেয়েরা দুধ পায় না, অসুস্থ রোগীদের ওষুধ দিতে পারা যায় না, নিরাশ্রয়েরা আশ্রয় পায় না, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু পরমাণু বোমা, বিষাক্ত গ্যাস আর যুদ্ধ-জাহাজের বাহিনী ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এতে খরচের জন্য পয়সার কোনো অভাব হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যেন ধ্বংসসাধনের ব্রতে নিয়োজিত হয়েছে। তা না হলে বৃষ্টির জলকে বাঁধ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা সঞ্চিত করে দুর্ভিক্ষকে কি প্রতিরোধ সম্ভব ছিল না? কিন্তু দুঃখের কথা, এই যে আমার শিক্ষাদীক্ষা, এই অন্যায় ও বিনাশমূলক কাজের হোতাদের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর। তারা সকলেই এই সুবৃহৎ সমস্যার সমাধানের জন্যে মিলিত হয়ে একবার যদি এই ক্ষুদ্রকায় রাজপুরুষদের না বলে দেয়! সমাজ-সংস্কারক, শিল্পী আর বিজ্ঞানীদের সাহায্য ছাড়া এই যুদ্ধবাজ রাজপুরুষেরা কী করতে পারে?

কালুর এই নালিশের প্রতিকার করার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের এই মিলিত আর্তনাদ তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা দেবে না কেন? আর তাদের মানবতাবোধ যদি এতেও না জেগে ওঠে, তা হলে কালুর কথামতো, 'আকালপীড়িত কেউ যেন এদের ধাক্কা দিয়ে আঘাত দিয়ে ঠিক পথে চালিত করে।' তা হলে এই ইচ্ছাকেই কি কার্যকর করতে হবে?

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের কাছে রয়েছে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও কৃপা। তার ব্যবহার যদি জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করা হয় তবেই বর্তমান জগতের অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কৃপা করার মালিক স্বয়ং ঈশ্বরও কোনো বাধা দিতে সক্ষম হবে না। 'মানবীনী ভবাই' তার সহৃদয় পাঠকদের কাছে এই বক্তব্যটুকুই তুলে ধরতে চায়।

আর এই বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য লেখক কোন্ নীতির আশ্রয় নিয়েছেন? কেমন ভাষায় পেশ করেছেন এ-সমস্যা?

এই বিবিধ সমস্যাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই যেন পান্নালালের ভাষা বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে এ-কাহিনীতে। কুশলী শিল্পী যেমন বিশিষ্ট শিল্পকর্ম শুরু করার আগে সব-কিছু ঠিকমতো ব্যবস্থা করে নেয়, তেমনি পান্নালাল প্যাটেল আলোচ্য উপন্যাসের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন। নতুন শব্দ, নতুন বাক্য-বিন্যাস, অনবদ্যভাবে সুন্দর বর্ণনার প্রকাশ পাতায় পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। যে-কোনো অধ্যায় খুলে তার শিরোনামা দেখুন এবং পরে ঘটনার বর্ণনা, তার নিগূঢ় অর্থ ও পরিমণ্ডল লক্ষ্য করুন।

'মানবীনী ভবাই' কৃষক সমাজের কাহিনী। তাই এখানে আবাদ-কালীন বিভিন্ন ঋতুর হুবহু চিত্র জায়গায় জায়গায় ফুটে উঠেছে :

'আষাঢ় মাসের তৃতীয়ার রাত্রির আকাশ যেন আলোড়িত হয়ে উঠতে থাকে। নিশুতি রাত ধরিত্রীর বুকে আঁধির ঝড় তুলে তাণ্ডব শুরু করেছে। ভোরের মুরগী ডাকার সাথে সাথেই আকাশ আর মাটি এক রেখায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

'আর সকাল হতে না হতেই মেঘেরা গর্জন করতে করতে পাহাড়ের উত্তর সীমানায় পৌঁছয়। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ইত্যাদি মেঘের সঙ্গে কোথায় যেন সব হারিয়ে গেল।

'এক রাতের মধ্যেই পৃথিবী যেন তার চেহারা বদলে ফেলেছে। কাল পর্যন্ত পৃথিবীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতো মাটি থেকে উত্তপ্ত বাষ্প উঠছিল। কিন্তু আজ মাটি এত ঠাণ্ডা নরম ও সুন্দর হয়ে

উঠেছে যে, তাতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এধারে-ওধারে খানাডোবা সব জলে ভরে গিয়েছে। আর ব্যাঙের দল জাঁতার আওয়াজের মতোই নানা সুরে ডাকছে। শীর্ণ শুষ্ক বনরাজি এক রাতেই যেন নতুন পাতায় সজ্জিত হয়ে উঠে এক দৃষ্টিসুখকর সবুজ রঙ মেখে মৃদু মৃদু হাসছে। পাখির দল আকাশের কোন্ এক প্রান্ত থেকে যেন খেলতে আর গান গাইতে নেমে আসতে থাকে—

'কিন্তু একলা শুধু পৃথিবীর কথা কেন? তীব্র বেগে প্রবহমান বাতাসও আজ শীতল মলয়সমীরে মৃদুমন্দভাবে বইছে। পৃথিবীর যা-কিছু সুবাস, তা মুক্তহস্তে ছড়িয়ে দিতে থাকে। নতুন পাতার শীষগুলো হাসতে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখাকে দোল দেয় আর নদীতীরের ঘন জঙ্গলে ও দূরের পাহাড়ে যেন লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। আর সূর্য? কাল তো আকাশবাতাসকে আগুনের উত্তাপে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হয়ে বসেছিল। কিন্তু আজ সে যেন আবির ছড়িয়ে হাসছে।'

এর পরে লেখক জীবজন্তুদের আনন্দ, বলদগুলোর ফুর্তি, বীজ বপনের আনন্দে মশগুল গ্রামবাসীর বর্ণনা করেছেন।

যেন সৃষ্টির কোথাও কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই— কোনো কিছুই কোথাও বেসুরো নয়। এবং এবার দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দুঃখের জাঁতা', 'কষ্টের দিন', 'ঢেঁকীর পরে মাথা, ভগবান' ইত্যাদি অধ্যায়-গুলো পড়ুন।

'একে তো গরমের দিন, তার ওপরে কোনো কাজকর্ম নেই, আর গরম যদিও-বা কম, মাথার ওপর খোলা তলোয়ার ঝোলে।— দিন যেন কাটতেই চায় না। রামা তো ঠিক কথাই বলে: বেচারা এই দিনের পা বোধ হয় না খেতে পেয়ে ভেঙে গেছে, তাই চলতেই পারছে না।'

কালবৈশাখী ঝড় ওঠে কিন্তু এ-বছর মাঠের ঘাস হাওয়ায় ওড়ে না —ঘাস হলে তবেই না উড়বে? খড়কুটো আর শুকনো পাতাও ওড়ে না।

তার মানে গাছের পাতা শুকিয়ে যাবার আগেই লোকেরা খেয়ে ফেলে থাকবে হয়তো !

'উড়ছিল কেবল লু্য এবং জমির ধুলো অথবা উড়ছিল হয়তো কিছু লোকের মাথার শুকনো চুল ।'

প্রায় বারো মাস ধরে বৃষ্টি পড়ছে না। আশা ছিল, জ্যৈষ্ঠের শেষ পনেরো দিনে নিশ্চয় বৃষ্টি পড়তে শুরু করবে। কিন্তু বরুণদেব সেই যে গেছে তো গেছেই। কিংবা তার জল হয়তো শেষ হয়ে গেছে অথবা ফেরার পথে রাস্তাটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে তখন শুধু মৃত্যুর বৃষ্টি হতে থাকে! মাঠে-ঘাটে বনে-বাজারে আর রাস্তায় যে দিকেই তাকানো যায় শুধু মানুষের মৃতদেহ। কোথায় পোড়াবে বা কোথায় কবর দেবে! তাই শোক প্রকাশ কিংবা অশৌচ ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকাজের কথাই উঠছে বা কোথায়! যারা পেছনে পড়ে থাকছিল, তারা আত্মীয়স্বজনের এইভাবে মৃত্যুর ওপারে পৌঁছে যাওয়াতে খুশিই হয়ে ওঠে! ভাবটা যেন— দেখো না এ-সব, তা হলে দুঃখও পেতে হবে না।

গ্রামের ঋতু, আবহাওয়া ও তার কার্যকর সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা পড়তে হলে, "পৃথিবীর বোঝা বহনকারী" অধ্যায়টা পড়ুন। পাঁচ লাইনের মধ্যেই ঋতু-চক্রে আবর্তিত গ্রাম সজীব হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসের নাম যদি "মানবীনী ভবাই" না দেওয়া হত তা হলে "পৃথিবীর বোঝা বহনকারী" নামটা যথাযথ হতে পারত।

শুধু বর্ণনা বা চরিত্র চিত্রণে কেন, কাহিনী বলায়, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বিষাদের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করার মতো।—কোথাও উজ্জ্বল মুক্তার মালার মতো, কোথাও অগ্নিপিণ্ডের তীব্র জ্বালা, কখনো খাপখোলা তলোয়ারের মতো সরল ও ঋজু, কখনো-বা আবার অন্তরের অন্তস্তলে বিঁধে থাকা কাঁটার মতো বেদনাবহ কিংবা হৃদয়-আলোড়নকারী উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বাস।

মালীর ভাষাশৈলী তো সকলের ওপরে। বুড়ী মালীর সবরকমের

বাধা দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও কালুর পাকাদেখার উৎসব বন্ধ হল না। তার চোখের সামনেই আনন্দ-হুল্লোড় হতে থাকায় সে নিজের স্বামী আর ছেলেদের বলে :

'মরে যা, মরে যা, মানুষের বেহদ্দ সব। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথাও সাধুদের দলে মিল গে যা। কোথায় গেল হতভাগা রণছোড়টা? এমন অপদার্থ বেআক্কেলে ছেলে আমার পেটে জন্মাল কী করে? তাড়িয়ে দে সব বউদের বাপের বাড়িতে।···বিয়ের পাকাদেখা নাহয় হল কিন্তু ঐ অপয়াটার বিয়ে যদি হতে দিই তো আমাকে কুকুর বলে ডাকিস, বুঝলি!'

আর সত্যিই এই অন্ধ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মালী কালু ও রাজুর বিয়ে উদ্‌যাপিত হতে দেয় না। কিন্তু শিল্প-সংগতি ও বিধাতার পরিহাসের চরম উদাহরণ আমরা পাই "মালীর মৃত্যু" অধ্যায়ে।

দুর্ভিক্ষের জন্য আশপাশের টিলা ও পাহাড়ের ওপরে বসবাসকারী ভীলেরা গাঁ লুঠপাট করতে আজ আসবে কি কাল আসবে এমন একটা দুশ্চিন্তা সকলের মনে। রোজ রাত্তিরে পাহাড়ের ওপরে মশালের আলো নাবতে দেখা যায় আর শোনা যায় উল্লাসের চিৎকার। সকলেই যে যার সঞ্চিত ফসল ও গহনাপত্র লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মালী সমস্ত পরিবারের গহনা লুকিয়ে না রেখে নিজের কোলে নিয়ে বসে থাকে, 'মাগীদের গয়না সব বার করে আমার কাছে নিয়ে এসো দেখি— ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী করতে হবে তা আমি জানি। হতভাগা তোরা সব সরে যা এখান থেকে! এই মাথার চুল এমনি এমনি সাদা হয় নি।'

কিন্তু বুড়ী মালী সেই গয়নার পুঁটলি সমেত লোপাট হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মাটিতে পা ঘষটে ঘষটে তাকে মরতে হয়। যে তাকে লুঠ করেছিল সে তার লজ্জা নিবারণের জন্যে একটা সুতো পর্যন্ত গায়ে রেখে যায় নি— মৃতদেহ আচ্ছাদিত করার জন্য কাপড় 'অপয়া' কালুর কাছ থেকেই জোগাড় করতে হয়।

চিতার ওপরে বুড়ীর মৃতদেহ রাখা হলে কেউ কেউ বলে ওঠে,

'আরে ভাই মুখশুদ্ধির জন্য মুখে কিছু উৎসর্গ করা—'

নানা রেগে যায়, 'হতভাগী আমাদের হাতে রুপোর আংটি ফাংটি কিছু থাকতে দিলে তবেই না তার থেকে ভেঙেটেঙে দিতাম কিছু! নাও নাও, ও-সব ছেড়ে দাও, সব ঠিক আছে। আধমন গয়নার সব নিয়েই তো পালিয়েছে।'

কালুর মনে এই ছেলেদের ওপরে ঘৃণা জন্মে যায়। সে নিজের হাতের আঙুলের আংটি থেকে সামান্য একটু অংশ ভেঙে বুড়ীর মুখে গুঁজে দেয়।

লেখকের পরের কটাক্ষের তুলনা হয় না, "এই লোকেরা জানত না যে মালী ওপরে চলে গেছে। তা না হলে কালুর দেওয়া এই রুপোর টুকরো থু থু করে ফেলে দিত।"

কালু ও রাজু যেমন জেদী, বুড়ী মালীও তেমনি জেদী আর তার ছেলে নানিয়াও যে জেদী হবে এ আর আশ্চর্য কী? বুড়ী গয়না মাটিতে গর্ত করে লুকোতে না দিয়ে তাদের তো ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছে আর এখন, 'এমন জায়গায় যাবার জন্য রওনা হয়ে গেছে যে পেছনে ঘোড়া ছোটালেও ধরতে পারা যাবে না।' আর সেই কথা ভেবেই রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে নানিয়া বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চেঁচিয়ে বলে—'পালিয়ে গেলি—কিন্তু মনে রাখিস ওখানে স্বর্গে গিয়ে—যদি তোর গলা কামড়ে না ছিঁড়ে ফেলি তো আমি তোর পেটে একটা পাথর জন্মেছিলাম জানবি!'

কালাশ্রয়ী সার্থক উপন্যাস রচনা করা অত্যন্ত শক্ত প্রচেষ্টা। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের লেখক একের পর এক ঘটনা জুড়ে যান। বিভিন্ন ঘটনার পরম্পরায় ভাষাকে গতিশীল করে তোলা লেখকের পক্ষে যেমন সহজ তেমনি সেই ভাব ও ভাষার গতিময়তার অন্য ত্রুটিবিচ্যুতিকে পাঠকের ভুলে যাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাব উপন্যাসের দিকনির্দেশ করে দেয়। কিন্তু কালপ্রধান উপন্যাসে কালই একমাত্র গতি : তা কখনো মৃদু গতিশীল বা কখনো দ্রুত বেগবান। পাত্রপাত্রীকে

তাদের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কালের সেই গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়। লেখক এ ক্ষেত্রে ঘটনার হৈ-হট্টগোল বিশেষ মেলাতে পারেন না। কাল বলতে বোঝায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রগত ও সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে নিয়তির অপ্রতিরোধ্য পরিণতির মিলন। আর ভবিতব্যের হাতে পতিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় এক জায়গায়, পরিণতি প্রাপ্ত হয় অন্যত্র। পাশা খেলার পরাজিত মোহাচ্ছন্ন যুধিষ্ঠিরের নিজের সম্পত্তি ও সহধর্মিণীকে ত্যাগ করা, বেদ গ্রন্থে পাশার প্রশংসনীয় উল্লেখ থেকে নিয়ে মাতুল শকুনি প্রভৃতি সমস্তই ভবিতব্যের মধ্যে শামিল। অন্যতম বিশিষ্ট উপন্যাস "ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে"র নাতাশার বাহ্যিক রূপকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তা তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রকাশ নয় বরঞ্চ তৎকালীন যুদ্ধের অনিশ্চয়তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের ফল।

সেই কারণেই কালপ্রধান উপন্যাসে লেখককে পাঠক ও চরিত্রের সঙ্গে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তাঁকে দেখাতে হয় যে, যা-কিছু সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি আসলে সব-কিছুই দৈব ও সামগ্রিক ঘটনার কর্মফলের হাতে। এ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে সঠিক পথ নির্ণয় করতে বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন এবং সে কথা বুঝতে না দেওয়া সাধারণ শিল্পকর্মের কাজ নয়।

'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসে পান্নালাল প্যাটেল এক নির্দিষ্ট কালে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সাথে টানাপোড়েন সংগ্রাম ও সংঘর্ষে লিপ্ত, আত্মসমর্পিত সমাজের চিত্রাঙ্কণ করেছেন। বাজিকরের দড়ির ওপর খেলা দেখানোর মতোই এ এক অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবুও লেখকের অঙ্কিত—বালা প্যাটেল, পরমা প্যাটেল, কালু, ফুলী-মা, মালী প্রভৃতি চরিত্র সুচিত্রিত। কখনো আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলে এক কথাতেই তাদের যেন চিনে ফেলব।

উপন্যাসের এখানে-সেখানে কিছু ত্রুটি যে থেকে যাবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে নানিয়ার রাজুকে উপপত্নীরূপে গ্রহণের ব্যাপারে কাসম ও শংকর প্রভৃতির এগিয়ে আসা

বিন্দুমাত্র উচিত হয় নি। কাসম প্রভৃতিরা এ কাজে এগিয়ে না এলেই যে ভালো হত এ কথা যে-কোনো সাধারণ পাঠকমাত্রই বলবে। সেই রকমই সৌষ্ঠবের ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে ধরলে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের কোনো আবশ্যকতা ছিল না। যে-কোনো পাঠকই সোজাসুজি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উপন্যাস শুরু করতে পারত।

এর থেকেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হল শেষ অধ্যায় "নির্মল আকাশে" কালুর তৃষ্ণা (মানসিক ?) মেটানোর জন্য তার মুখেতে রাজুর স্তন দেওয়া ; এর অনিবার্যতা স্বীকার করা যায় না। এতে উপন্যাসের সামগ্রিক রস ঘনিভূত হতে পারে না। যৌন বিকৃতি পৃথিবীতে অনেক রকমেরই রয়েছে কিন্তু কালু মনেপ্রাণে যে ধরনের চরিত্রের মানুষ তার মধ্যে এ ধরনের অভিব্যক্তি না হলেই স্বাভাবিক হত।

পরিমার্জনের অভাবে কিছু কিছু এ ধরনের ত্রুটি রয়ে গেলেও তা কচিৎ আমাদের চোখে পড়ে। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই, "দুঃখের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েও— দুঃখের মেঘ সামান্য কেটে যেতেই, খুশিতে মেতে উঠে গানে গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করার তৎপরতা। দাবানলের ধ্বংসের পরও নতুন পাতার উন্মেষ হতে যেখানে দেরি লাগে না এমন গ্রাম্য সমাজ আর তাদের অগ্রদূত কালু, যার পায়ের ঝঙ্কৃত শব্দে রাজুর মতো আমাদেরও ভরসা হয়, যমদূত তো ছাড়, স্বয়ং যমরাজ নিজে এসে উপস্থিত হলেও তার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই যে কালুকে শেষ করে দিতে পারে।"

মহাভারতে যক্ষ প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছিল : "সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কালের কাহিনী।" আমরাও তাতে সম্মতি দেব আর প্রার্থনা করব যে ভাই পান্নালাল প্যাটেল অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠে যেন আমাদের উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড উপহার দেন। [১]

গ্রাম দক্ষিণমূর্তি
আম্বালা (সৌরাষ্ট্র) —দর্শক
তারিখ : ১৬. ১২. ৫২

---

১ লেখক সে সময়ে যক্ষা রোগে অসুস্থ ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড "ভাংগ্যাঁনা মেরু" ও তৃতীয় খণ্ড "ধর্মর বলেণু" গুজরাতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

॥ এক ॥

ক্ষেতের মাচায়

অঘ্রাণের মধ্যরাত্রি নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে যায়। মাঠে গম ও ছোলার কচি চারাগুলো পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে যেন বাতাসে দুলছে। একধারে মাচার ওপরে ক্ষেতের পাহারাদার ঢুলতে ঢুলতে একঘুম সেরে নিচ্ছে। পাশে ধুনির আগুনও যেন ছাইচাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সবুজ ফসলে ভরা সেই বিস্তৃত ক্ষেতের আশেপাশে টিলার ওপরে গ্রামগুলিকে আবছা আঁধারে ধোঁয়ার মতো লাগে। সারা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন। ওপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ শান্ত নীরব ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

শুধু নদীর দিকে টিলার ধারে ঐ মাচার কথা আলাদা ; সেখানে ধুনিতে একনাগাড়ে আগুন জ্বলে।

মাচার সামনের দিকে বুড়ো মতন দেখতে একজন পাহারাদার লাঠি হাতে ক্ষেতের দিকে মুখ করে বসে ছিল। কুমড়োর মতো প্রকাণ্ড বড়ো মাথায় ছাই রঙের মোটা মোটা চুল হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে। তার কোটরগত চোখের দৃষ্টি নদীতটের দিকে—তারও ওপারে আকাশের সীমানাছোঁয়া পাহাড়ের ওপরে কিংবা অন্য কোথাও নিবদ্ধ। ধুনির আগুনের তাপে তার বাঁ-দিকটা বেশ তেতে উঠেছে কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। অথচ তার মাঝারি কাঠামোর চর্বি ও মাংসে পুষ্ট শরীরে এ-সবের কোনোই প্রভাব নেই। তার ডানদিকটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমে অবশ অথবা আগুনের তাপে বাঁদিক গলে গেলেও দুটোই তার কাছে সমান।

পাহারাদার এক গভীর শ্বাস নেয়, বুকের পাঁজরা যেন মাংস ঠেলে বাইরে এসে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে স্থির হল। সে

যেন তার দৃষ্টিটাকে সেইসঙ্গে ফিরিয়ে আনে। সে আগুনের তাপ থেকে বাঁ হাত সরিয়ে এনে ডান হাতে ধুনির সামনে খালি-পড়ে-থাকা নারকেলের হুকোটা তুলে নেয়। অলস বাঁ হাতে সেটা রেখে চিমটে দিয়ে কল্কেটা পরিষ্কার করে নেয়, তামাক ভরে, টিকে রাখে এবং বেশ বেছে বেছে জলন্ত কয়লার টুকরো তুলে দেয়।

হুঁকোয় কল্কেটা বসিয়ে নলেতে মুখ রেখে আবার সে ঘন আঁধারের দিকে তাকায়।

এ অবস্থায় তাকে যে-কেউ দেখলে তার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে : সামনের এই নিঝুম নির্জনে যেখানে অন্ধকার ছাড়া আর-কিছুই দেখা যাচ্ছে না সেখানে অনিমেষ দৃষ্টিতে কী দেখছে ?

কিন্তু এমন ভাবে সে তো চারজন লোকের মাঝখানে বসলেও তাকিয়ে থাকে। প্রশ্নও করে কেউ কেউ তাকে : 'ও কালু কাকা, আপনি প্রায়ই ওমনি ভাবে ঐ পাহাড়ে ওধারের মাঠের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন কেন ?'

কালু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কখনো বলে ঃ 'তা ঐ পাহাড়ে তো অনেক কিছু আছে ভাই ! উঠতে উঠতে সব কিছুই যে ওখানে ডুবে গেছে। —আবার কখনো হাসবার চেষ্টা ক'রে ঐ একই জবাব অন্য ভাষায় দেয় : 'ঐ পাহাড়ে আর তার খাদে এবং আরও ওপারে নিজের হারিয়ে যাওয়া জীবন ও অতীতের ফেলে আসা চার-পাঁচ দশককে খুঁজে বেড়াই।'

এখনো হয়তো সেইধরনেরই কিছু উত্তর দিত : 'ঐ অন্ধকারেতে আমি আমার ব্যর্থ বিগত যৌবনকে, আমার অন্তরের নিভৃত আড়ালে যাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম তবুও যে চিরকাল আমার কাছে পর হয়েই রইল সেই রাজুকে, রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যে আজও শত্রুতা করে চলেছে সেই খুড়তুতো ভাই নানাকে আর আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে প্রতাপকে খুঁজে বেড়াই।'

আর-একবার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অলস খালি হাত দিয়ে চোখ দুটি মুছে নেয়। সামনের আকাশে একটা জলন্ত তারা খসে পড়তে

দেখে হাসবার চেষ্টা করে : 'আজ আমার জীবনে এটুকু আলোও যদি থাকত।' কিন্তু ততক্ষণে সেই তারার দীপ্তি আঁধারে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। মাথা নাড়তে নাড়তে কালু আবার হাসে। হেসে সে যেন বলতে চায় 'আমার বেলাতেও ঠিক এইরকমই হয়েছিল', তার পরে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'তা না হলে আমার কিসের অভাব? বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে আমি, তাও আবার বাবার ষাট বছর বয়সে আমার জন্ম হয়েছিল।…আমারও স্ত্রী ছিল বিনীত, বাধ্যের, ছিল দুই মেয়ে, প্রতাপের মতো বুদ্ধিমান ছেলে…।'

হঠাৎ তার গলার স্বর তীব্র হয়ে যায়, যেন সে ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বেটা শয়তান পাজী নানা, তুই রাজুকে আমার কাছ থেকে নাহয় ছিনিয়ে নিয়েছিস। কিন্তু আমার একমাত্র ছেলেকেও—তাকে মেরে ফেললেও তবু ভালো ছিল কিন্তু তাকে সাধুর কাছে সঁপে দিয়েছে।…তার দুধের দাঁত এখনো পড়ে নি, কে জানে আজ সে বেঁচে আছে কিনা…!'

কালু এরপরে এমন করুণ ভাবে কাঁদতে শুরু করে যে আশি বছরের বুড়ীও তার কাছে হেরে যাবে। সেই স্তব্ধ প্রহরে আঁধার রাত যেন থেমে প'ড়ে তার কান্না কান পেতে শুনতে থাকে।

'ওরে আমার প্রতাপরে, আমার এই ঘোড়ার মতো তেজী বলদ তুই ছাড়া কে চালাবে?…হাতির মতো এই মোষ কার জন্যে রাখলাম তবে·· রাজুর অপেক্ষায় থেকে আমি আমার যৌবন পার করেছি… আর মাণিক আমার, তোর চলে যাওয়া দেখতে হল এই বুড়ো বয়সে! হায় ভগবান, এর থেকে অনেক বেশি ভালো হত যদি তুমি আমাকে ছাপ্পান্নর দুর্ভিক্ষের দিনে মেরে ফেলতে। তাহলে আজকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। হায়রে ভাগ্য। মন শুধু কোনো কথা শুনতে চায় না, নিজের ছেলেই যদি শুনত—এখন তো বেনে-মুদীর হিসেবের খাতায় এই জমিজমা, এই কুঁয়ো আর ঘরবাড়ি, এই-সব জন্তু-জানোয়ার··· আঃ রাজু, আমার এই বাকী বয়সটুকুও হিসেবের খাতায় দেনার-দায়ে জমা হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ বাদে কালু প্রকৃতিস্থ হল। নিজের এই মানসিক দুর্বলতার জন্য সে লজ্জা অনুভব করে। হুকোটা আর-একবার ভরে নেয়। চিন্তার হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ঘুম। এ কথা ভেবেই যেন শুয়ে পড়ে।

ঘুম আসে না। কিন্তু কান্নার জন্যে অথবা 'কী আশ্চর্য মানব-জীবনের এই নাটক' এই ধরনের বিষণ্ণ চিন্তায় মনটা যেন কিছুটা হাল্কা হয়।

তারপর তার এই দীর্ঘ জীবন— কত ঘটনার ঢেউ সেখানে, কখনো ছাপ্পান্নের দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর সময়, কখনো আবার ছোটোখাটো আনন্দের মুহূর্ত— পঞ্চাশ বছরের এই জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সামনের ঐ কালজয়ী-পাহাড়ের দেওয়ালে একটা নাটকের মতো ভেসে উঠতে থাকে, ঠিক যেন গ্রামের বারোয়ারী মণ্ডপে কোনো যাত্রা অভিনীত হয়ে চলেছে।

॥ দুই ॥

অভিনন্দন

ছাপ্পান্নের দুর্ভিক্ষের প্রায় বছর পঁচিশ আগের কোনো এক গ্রীষ্মের দুপুর সেদিন। মালবা থেকে গুজরাট পথ পেরিয়ে দেবা মুদী নিজের প্রায় শ' পাঁচেক বলদ নিয়ে ফিরছিল। খদ্দেরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ঘিয়ের ডিবেগুলো একটা র‍্যাকের তাকে জমিয়ে রেখে বেনে তার গ্রামের দিকে মোড় ঘুরে চলতে আরম্ভ করে। বলিষ্ঠ চেহারার কৃষকেরা সার তৈরি ও ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারের কাজ শুরু করছে, কেউ খাপড়ার টালি তৈরি করছে, কেউ কেউ ছাদে টালি লাগাচ্ছে, অন্য অনেকে খড়মাটি ইত্যাদি দিয়ে ঘরের দেওয়াল মেরামত করছে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ফুল ও ফলে ভরা ছোটো ছোটো পলাশ গাছ বরুণদেবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে আর ওধারে নদীতীরের কামরাঙা ও জাম গাছ নতুন পাতার পোশাক পরে বর্ষামঙ্গলের জন্য সাজতে বসেছে।

গাঁয়ের নিম গাছগুলোও যেন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে আবার ও পাড়ার জীর্ণ শীর্ণ নিম গাছটা তো আনন্দে মেতে উঠে হাওয়াকে শন শন করে প্রবাহিত করে নিজের বিশাল শাখা-প্রশাখায় দোলা দিতে থাকে।

রাত হয়ে আসে। পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা শুয়ে পড়েছে। বাসনপত্র মাজা-ঘষার আওয়াজও স্তব্ধ হয়েছে। বয়স্করা খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকছে : 'ফরররর্—ফাঁ! ফরররর্—ফাঁ!'

শুধু ঐ পুরোনো নিমগাছ শ্মশান জাগানো ভূতের মতোই প্রলয় নৃত্যে মেতে উঠেছে যেন : 'হিস্স্স্—হা হিস্স্স্—হা।'

আর সেই নিমগাছের পাশেই এক বাড়িতে শব্দ হচ্ছিল। বাড়ির

ছোটো দাওয়ায় প্রায় ষাট বছরের এক বৃদ্ধ একবার খাটে শুচ্ছে আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসছে অধীর উত্তেজনায়। মাঝে মাঝে দরমার তৈরি বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়ে যে আলোর রেখা বাইরে এসে পড়ছে তার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তবে কৃশকায় রোগা কাঠামোর শরীরে হৃৎপিণ্ডটা যেন ঢেঁকিতে ধান কোটার মতো 'ধবাক্-ধবাক্' করে বাজছিল।

বাড়িটা বাঁশের চাঁচ-দরমার তৈরি। ছাতে ছাঁচে ঢালাই টালির বদলে হাতে তৈরি টালি পাতা। বুড়োর পরণের জামাকাপড়ও বেশ কিছুটা বিচিত্র—কুঁচি দেওয়া ঢোলা কামিজ, আর হাতে-বোনা ধুতি, বেশ মোটা ও খাটো। তবে হ্যাঁ, খুটিতে টাঙিয়ে রাখা পাগড়ির কাপড়টা কিছু মিহি। কেবল জামাকাপড়ই নয়, মানুষটাও আসলে একটু আলাদা, তার মন-মেজাজ ভিন্নপ্রকৃতির।

এই বৃদ্ধের কথাই ধরুন : ষাট বছর বয়স হতে চলেছে অথচ ওর একহারা চেহারা বেশ মজবুত। হাড়গুলো যেন বেশী চওড়া।

কিন্তু বর্তমানে তার অবস্থা— হয়তো অসুস্থ রুগীর মতো নির্জীব দুর্বল হয়ে খাটের মধ্যে ডুবে থাকে, পরক্ষণেই আবার ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে দরজার চৌকাঠের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ঠিক যেন চুরি করতে যাচ্ছে, কখনো কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে কিংবা দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে।

কিন্তু কীই-বা দেখতে পাবে? আঁতুরের বিছানা গোয়ালঘরের এককোণে পাতা হয়েছিল।

অবসন্ন হয়ে সে আবার খাটে বসে পড়ে। সুন্দর একগাল দাড়ি-ভরা মুখে কখনো শিশুর মতো আনন্দে জেগে ওঠে বা কখনো অসহায় স্তব্ধতা ছেয়ে যায়।

হঠাৎ তার কানে যন্ত্রণাকাতর শব্দ এসে পৌঁছয়। বুড়োর বুক কেঁপে ওঠে। ঠোঁট বিড়বিড় করে বলে: 'হে ভগবান! নৌকো তীরে প্রায় এসে লেগেছে! সোওয়া সের মাটির একটা ঢেলা ছেলের

চেহারায় দিয়ে দে !···ছেলের জন্যে দু-দুটো বিয়ে করে পাঁচবছর তো বেঁচে থেকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি, ভগবান ! সেই নরক থেকে একজনকে তুমি স্বর্গে টেনে নিয়েছ। কিন্তু প্রভু ! আজও ছেলের আশা ত্যাগ করতে পারি নি, সেইজন্যে—'

ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। বুড়োর হৃদয় যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। কলস্বনা স্ত্রীলোকদের কথার শব্দ সে অনুধাবন করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। সে এমন অস্থির হয়ে পড়ে। আর দু-চার মুহূর্ত দেরি হলে সে ঠিক চিৎকার করে উঠত : 'কী হল ?'

কিন্তু তার আগেই দরজা খোলার চি-র-র-র করে শব্দ হল। স্ত্রীলোকদের বাইরে বেরিয়ে আসবার ব্যস্ততা থেকেই বুড়ো বুঝতে পেরে যায়। তার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখে প্রদীপের আলোর মতো আনন্দ ফুটে ওঠে। সে চোখ বন্ধ করে নেয় আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার মতো ভান করে শুয়ে থাকে।

কিন্তু কতক্ষণ ? ভেতরে ভেতরে আনন্দের ঢেউ সব-কিছু যেন তোলপাড় করে দিয়েছে। লম্বা করে ছড়িয়ে রাখা পা গুটিয়ে নিয়ে সে কুকুরছানার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। মুখ থেকে হাসি আর গানের সুরের এক মিশ্রিত আওয়াজ বেরিয়ে আসে। এক মধ্য-বয়সী স্ত্রী এগিয়ে এসে 'ভাই অভিনন্দন জানাচ্ছি' এ কথা বলার আগেই সে উঠে বসে। চিবুকের কাছে সিঁথি কাটা কানের কাছে পাক দেওয়া সেই সুন্দর দাড়ি যেন ফুরফুরিয়ে হেসে ওঠে। আর গোঁফে তো—

'ভাই অভিনন্দন নাও ! বউদির ছেলে হয়েছে।'

বুড়ো বিহ্বল দৃষ্টিতে হা করে তাকিয়ে থাকে। না সে হাসতে পারে, না তার কান্না আসে। মুখের কোনো শব্দই বার হয় না তার।

কিন্তু বুড়োর দিকে কারোর তখন খেয়াল ছিল না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ সাতজন স্ত্রীর মুখে কেবল সেই একই কথা :

'বুঝলে যমুনা বোন, খালি হাতে ছেড়ো না এবার। ষাট বছর বয়সে কাকার ঘরে ছেলের জন্ম হয়েছে—'

দ্বিতীয় আর একজন শেষ করে : 'আর একেবারে ঠিক রাজপুত্রের মতো ছেলে।'

বুড়োর চোখে জল ভরে আসে। ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে। কিন্তু কোনো কথা ফোটে না। শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে। বোনকে বলে : 'অনেক ধন্যবাদ বোন।'

বোন কিছু বলতে পারে না। ফুলী-মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে : 'তা তো হল, কিন্তু এই অভিনন্দনের জন্য আর কী দিচ্ছ সেটা তো বলো?'

'বোন যা চাইবে।' আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বালা তার বোনের দিকে তাকায়।

অন্য স্ত্রীলোকেরা বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। বুড়োর গরিব অবস্থা দেখে কিংবা তার উদারতা দেখে কিনা কে জানে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলে না।

'ছেড়ে দিয়ো না কিন্তু যম্‌না বোন।' এ কথা যে বলেছিল সেও চুপ করে থাকে। বলল যখন তখন উল্টো কথাই বলল, 'যা চাইবে বোন তা একটু ভেবে চিন্তে চেয়ো। চাইলে তো অনেক কিছুই চাওয়া যায় কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয় ভাই।'

'মিথ্যে মিথ্যে এ-সব কথা হচ্ছে।' সবচেয়ে মোটা মতন দেখতে স্ত্রীলোকটি, বালার ছোটোভাই পরমার বউ মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'যেখানে ঘরেতে জলখাবারের ঘটিটাও ফুটো সেখানে অভিনন্দনের জন্যে কী আর' —

এই কথাটা যেন কলস্বনা ঝর্নার গতি হঠাৎ পাথর ফেলে রুদ্ধ করার স্তব্ধতা আনে কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই ফুলী-মা বলে : 'অভাব-অনটন তো থাকেই, তা ব'লে সবদিন কি আর এক রকমের হয়। তাছাড়া বালা-ভাইকে ভগবান ছেলে দিয়েছে। দুদিন বাদেই সে বড়ো হবে, রোজগার করবে।' বৃদ্ধা যম্‌নার দিকে ফেরে :

'অবশ্য এ তো ঠিক কথা যে ব্রাহ্মণ আর বোন পদে পদে দাবি-দাওয়া করতে পারে, তাই বলছিলাম যে এখন—' বুড়োর দিকে চেয়ে বলে : 'ঠিক আছে এই আনন্দ উপলক্ষে হাঁড়ি কলসী দেবেন অখন।' এবং যমনাকে জিজ্ঞেস করে : 'কী, কম মনে হচ্ছে না তো তোর ?'

'না, ভাই। না। ভাইয়ের বাড়ির একটুকরো কাপড় পেলেও বোনের কাছে তা—'

ফুলী-মা বুড়োকেও জিজ্ঞেস করে : 'আর আপনার ?' চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে : 'খুব বেশি বলে কি মনে হচ্ছে ?'

'না, না, ফুলী বৌদি।' হাসবার চেষ্টা ক'রে বালা আবার বলে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই আনন্দের দিনে অনেক কিছু দেবার। কিন্তু সেই যে কথায় বলে না, খরগোশের আগের পা দুটো যত জোরে ছোটে পেছনের পা দুটো তত দৌড়তে পারে না ! তা না হলে তো—'

যমনা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলে ওঠে : 'কী যে বল দাদা তার ঠিক নেই। আমার কাছে তো ভাইয়ের ঘরের সামান্য কিছু মিললেই লাখ টাকা পাওয়ার শামিল্। তা ছাড়া ফুলী-মা তো ঠিকই বলেছে যে এখনো তো নেবার অনেক সুযোগ আসবে।'

'ঠি—ক, ঠিকই তো।' ফুলী-মা সায় দেয়। তার পরেই যেন তার খেয়াল আসে : 'তোমরা সবাই এখানে ছুটে এসেছ ওদিকে তার কাছে তো—চল চল ঘরে চল সব, আর—'

ফুলী-মা সকলকে নিয়ে এগোয়। দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে আসে, 'মনে পড়ে আপনার বালাভাই ?' বলতে বলতে খাটিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'সেদিন সেই আষাঢ়ের সকালবেলা লাঙল চালাতে চালাতে আপনি দোঁহা গাইছিলেন—সেই মজুরের দোঁহাটা গাইতে গাইতে আপনি থেমে গিয়েছিলেন আর আমি জিজ্ঞেস করতে কী উত্তর দিয়েছিলেন সে কথা মনে পড়ে ?'

বুড়ো চোখ ছোটো করে যেন অতীতের ভাবনার ওপর আলোকপাত করছে। বলে ওঠে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ'—

বৃদ্ধা কথার মধ্যেই বলে, 'আপনি বলেছিলেন যে গান তো প্রাণ

খুলে গাইছি কিন্তু লোকেরা হয়তো পেছনে হাসছে—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই ছড়াটা : দেবদেবীর কাছে—'

'হ্যাঁ···সেইটাই ! কিন্তু এবার তো ভগবান আপনাকে ছেলে সত্যি সত্যিই দিয়েছে, আর—'

বুড়ো না জিজ্ঞেস করে আর থাকতে পারে না, 'কেমন আছে ফুলী বৌদি ? আমার—'

'ঠিক যেমনটি আপনি সেই ছড়াতে গেয়েছিলেন। আবার একবার মনে মনে ভেবে নিন গানটা—' ফুলী-মা হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বালা সেই সদ্যোজাত দুর্লভ মাটির ময়ূরটিকে যেন সত্যি সত্যিই ধরিত্রীকে সমর্পণ করছে সেই বিশ্বাসেই বিগলিত হৃদয়ে গদগদ স্বরে বারবার সেই ছড়াটা গাইতে থাকে—

দেব-দেবীনে পারে মেলতাঁ
সৌ কো মরঘাঁ নে বকরা শাঁ ঢোর।
পণ মারে ধরতী নে ঘোলে মেলবো
মোঁথী মাটীনো রমতেরো মোর ॥

(সকলেই তো দেবদেবীকে মুরগী ছাগল ভেট দেয়। কিন্তু আমার ধরিত্রীর কোলে সেই দুর্লভ মাটির তৈরি হাসিখুশি ময়ূর সমর্পণ করতে ইচ্ছে হয়।)

॥ তিন ॥

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী

মানবজাতির মধ্যেই বোধহয় সন্তানলাভের ইচ্ছে বিশেষ করে পুত্র সন্তান সবচেয়ে বড়ো কামনা হবে— তা না হলে বালার ঋণের পরিমাণ তার মাথায় যত চুল ছিল প্রায় তার সমান সমান। লোকেরা বলত, বুড়োর ঘরের চালা আর তার দেহ দুই পড়ো পড়ো।

এই ষাট বছর বয়সের ছেলে কবে বড়ো হয়ে তার বুড়ো বয়সে অন্ধের যষ্টি হবে, কবেই-বা রোজগার করতে শিখবে !!

কিন্তু সত্যি বলতে কি চাকরি করার কথা বুড়োর ভাবনার মধ্যেই আসত না। প্রায় আধডজন বাচ্ছা এর আগে হয়েছিল—বুড়ো বলত, 'ওরা সব তো ভাগ্যে লেখা ছিল না। কেবল শুধু খেলবার জন্যে আমাকে দিয়েছিলেন। বছর দু-বছর টেনে খেলার সুযোগ দিয়ে ঠাকুর তাদের নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।' শেষের দুটো বাচ্ছা জন্মানোর সাথে সাথেই মারা গিয়েছিল, কেবল এর কারণটা বুড়ো বালা খুঁজে পায় না।

তার স্ত্রী এবং গাঁয়ের লোকেরা অবশ্য অন্য কথা বলত : 'ঠাকুর মোটেই নেন নি। তিনি ভালো মনেই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ যে শত্রু রয়েছে সেই বংশলোপ করার জন্যে কিছু ফুস-মন্তর টন্তর করে।'

শত্রু আর অন্য কেউ নয় ; বালার ছোটো ভাই পরমার স্ত্রী মালী। বুড়ো বালা তার সারাটা জীবন অন্যের বাচ্ছাদের সঙ্গে খেলা করে কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল, 'ও-সব ডাকিনী যোগিণী কথার কথা কেবল ! নইলে সমস্ত তল্লাটের ওঝা নিয়ে এসে সমস্ত বাড়ি ঝাড়-ফুঁক করিয়েছি— কিন্তু একটাও বাঁচে নি। ও-সবই ভগবানের লীলাখেলা !'

তবুও মানুষের মন অবুঝ, তাই বুড়ো এবার নতমস্তকে বার বার

প্রার্থনা জানাচ্ছিল, 'হে ঠাকুর, এবারও যদি আগের মতোই করতে চাও তো ছেলের আগে তার মা আর আমার মৃত্যু দিয়ো। কিন্তু ছেলে টেনে নিয়ে আমাদের মৃত্যুকে পেছিয়ে দিয়ো না।…আর সব কিছু পারলেও এবারে আর আমি ভাইয়ের বউয়ের বিদ্রূপ সইতে পারব না। হয়তো শেষে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।'

বুড়ো তাই মনে মনে ঠিক করেছিল, 'কোনো জ্যোতিষী পেয়ে গেলে আমার ছেলের ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করে নেব।' ক্রোশ পাঁচ দূরে ডেগতিয়া গাঁয়ে বর্ধিষ্ণু কিষাণদের বসতি ছিল। সেখান থেকেও বার-দুই ঘুরে আসে। সেখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশ ভালোই কিন্তু কাশী পর্যন্ত ঘুরে এসেছে এমন কাউকে পাওয়া গেল না। তবুও বুড়ো মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল, যাই হোক-না-কেন ব্রাহ্মণ তো বটে। ওদের জিভেও সত্যের অধিষ্ঠান, যা লিখবে তাই ঠিকমতো ফলবে।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সেই বোবা-কালা ব্রাহ্মণেরাও দরিদ্র বালাকে নানা বাহানা দেখাতে থাকে, "দুদিন পরে, এখন পঞ্চমী তিথি চলছে" ইত্যাদি। আর সে পিছন ফিরলেই তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, "বালা প্যাটেলের বুদ্ধি থাকলে জিজ্ঞেস করার আর কী ছিল? ঘরে যার খাবার অন্ন জোটে না তার ছেলে কী—"

তার মধ্যেই একদিন বালার মনস্কামনা ভগবান পূর্ণ করে দিলেন। এক ব্রাহ্মণ যাত্রী একদিন দুপুরে মোড়লের বাড়ি এসে পৌঁছয়। কিন্তু অবস্থাপন্ন মোড়লের স্ত্রী তাকে কাঁধের থেকে ঝোলা-ঝুলি নামিয়ে বসবার তোড়জোড় করতে দেখে বলে, "মোড়লের বাড়ির খোঁজ করতে করতে এ-হতভাগারা যে কোথা থেকে এসে পৌঁছয় কে জানে।"

ব্রাহ্মণ নামিয়ে রাখা ঝোলা আবার কাঁধে তুলে নেয়, 'রাগ কোরো না, মা! আমি যাচ্ছি, আমাদের মতো পথিকদের জন্যে ভগবান গাছের তলা…'

কিন্তু বালা ততক্ষণে ব্রাহ্মণের সামনে হাতজোড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, 'তা কখনো কি হয় বামুনঠাকুর? মানুষ তো মানুষের

কাছেই থাকে ! আসুন, এই গরিবের কুঁড়েঘরকে একটু পবিত্র করে দেবেন।'

ব্রাহ্মণের যাবার একদমই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বুড়ো তার কাঁধ থেকে ঝোলাটা নিয়ে নেয় নিজের হাতে। অগত্যা ব্রাহ্মণকে যেতেই হয়।

ব্রাহ্মণের কৃশকায় একহারা চেহারা আর মুখের রেখা দেখেই বুঝতে পারা যায় তিনি কাশীর পণ্ডিত। গায়ে লম্বা আলখাল্লা। কোঁচানো ধুতি ফেরতা দিয়ে পরা। মাথায় মোরগের ঝুঁটির মতো লাল গোলাকার পাগড়ি।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, কাছাকাছি— দশ ক্রোশ দূরের গ্রামের লোক। বিদেশে যাবার জন্য বেরিয়েছেন। বুড়ো মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়, 'ভগবান নিজেই যেন কুষ্ঠি তৈরি করার জন্য এই জ্যোতিষীকে আমার ঘরে পাঠিয়েছেন।'

ব্রাহ্মণের কাছে দুধের তৈরি শুকনো রুটি ছিল কিন্তু বালার ইচ্ছে যে তিনি তার কাছে অন্নজল গ্রহণ করুন। তার কাছে তামা-পেতলের কোনো বাসনপত্র ছিল না। ভাইয়ের বা ফুলী-মার বাড়ি থেকে সে-সব আনা যেতে পারত। কিন্তু গরমের দিনে নতুন মাটির ঘড়াতে জল নিয়ে আসা উচিত মনে করে। জলভর্তি ঘড়া কাঁধের থেকে নামাতে নামাতে সে বলে, 'চলুন, খিচুড়িটা স্বপাক তৈরি করে নেবেন।' ব্রাহ্মণ এই গরমে রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট করতে মানা করে দেয়। এবং বুড়োকে নিবৃত্ত করার জন্যে ছেলের কোষ্ঠী গণনার কাজ আরম্ভ করে দেয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণের থেকেও বুড়োকে সেয়ানা দেখা গেল। 'না, আগে আপনি কিছু খেয়ে নেন, আমার বাড়ির অন্নজল পেটে পড়ুক, তারপর এই সব—'

শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে রাজী হতে হয়, 'বেশ তাই হোক। আপনি ততক্ষণ উনুন ধরাবার ব্যবস্থা করুন। আমি এদিকে কোষ্ঠী গণনার কাজ করি। খিচুড়ি তৈরি হতে হতেই আমার কাজও শেষ

হয়ে যাবে।'

বুড়োর আনন্দের সীমা থাকে না। পাথর সাজিয়ে উনুন তৈরি করে। থালা-বাসনও চেয়ে নিয়ে আসে। খিচুড়ির চাল-ডাল বেছে রাখে···জ্যোতিষীকে কাজে মশগুল দেখে তার গাঁয়ের লোক-জনদের ডেকে আনার কথা মনে পড়ে। রীতি অনুযায়ী সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসে—'আমার বাড়িতে তোমরা সকলে এসো একবার। একজন জ্যোতিষী এসেছেন, বাচ্চার নামকরণ করবেন তিনি।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুড়োর ছোটো উঠোন লোকে ভরে যায়। গাঁয়ের মোড়ল পরমাজী আর তার ছেলে রণছোড় সামনে এসে বসে।

যেমনি বলিষ্ঠ মজবুত চেহারা, তেমনিই মোটা তার জামা-কাপড়। হাতেবোনা ধুতি আর হলদে মোটা কাপড়ের ফতুয়া— ঝুল কম আর গয়লাদের ফতুয়ার মতো ঘের দেওয়া। চল্লিশের ওপর বয়স্কদের মাথায় টুপি আর অন্যরা সব পাগড়ি বেঁধে এসেছিল।

জনা-ত্রিশ এই লোকেদের কেউ কেউ হুঁকো খাচ্ছিল। নারকেলের তৈরি থেলো হুঁকোও ছিল, আবার দু-তিন সের ওজনের ভারী নকশা-কাটা সুন্দর বদরী হুঁকোও।

একধারে সেই ব্রাহ্মণ গণনায় ব্যস্ত। অন্যধারে গাঁয়ের লোকেরা গালগল্প জুড়ে দিল। গল্পের মধ্যে কোন্ গাঁয়ের কার গোরু-বলদ চুরি গিয়েছে, কে তা খুঁজে এনেছে এ-সব থেকে শুরু করে "বোম্বাই কলে" তৈরি সাহেবদের নতুন পয়সা চালু করার কথা পর্যন্ত ছিল। তখনকার কালের প্রচলিত মুদ্রা, বাদশাহী চিত্তোরী, সালমশাহী ইত্যাদির কী হবে তার ভাবনাও ছিল। অবশ্য এ-সব আলোচনা করার মতো লোক সেখানে মোটে দু-তিনজন ছিল; পরমাজী, ফুলী-মার ছেলে শংকর আর বুড়ো মাওজী।

এমনিতে তো ওদের কাছে যা টাকাপয়সা আছে, তা আঙুলের গাঁটে গোনা যায় কিন্তু তাদের মন তো···

সেইজন্যেই কুষ্ঠি তৈরির কাজে ব্যস্ত ব্রাহ্মণের একাগ্রতার কোনো

খেয়াল না করে পরমা মোড়ল প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মহারাজ, পুরোনো টাকা বদলাবার সময় সাহেবরা কতটা ছুট বাদ দেয় ?'

ব্রাহ্মণ তাঁর বিরক্তি হাসিতে প্রকট করে এ-ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা জানান আর বালাকে সামনে ডেকে এনে বসিয়ে কবি যেমন তার প্রিয় কবিতা উচ্ছ্বসিত আনন্দে শোনাতে থাকে, তেমনিভাবেই জ্যোতিষী তার ছেলের ভাগ্যলিপি পড়তে থাকেন, 'খোকার নাম মিথুন রাশিতে পড়ছে দেখছি কাকা।'

সকলেই ভাবনায় পড়ে যায়, পরমাজী বলে, 'মিথুন রাশি নাহয় হল কিন্তু নামটাই কী হবে বলে দিন-না মহারাজ।'

'ক, ছ আর ঘ— এরা হল মিথুন।' জ্যোতিষী বলেন, কিন্তু তক্ষুনি গাঁয়ের লোকেদের খেয়াল মাথায় আসতেই আদ্যাক্ষরের সঙ্গে উদাহরণও দিয়ে দেন: 'ক দিয়ে নাম রাখতে হলে কাঞ্চনলাল, কাশীনাথ, কনকচাঁদ।' তবুও সমবেত জনতার মধ্যে অস্বস্তি ভাব দেখা যায়। তা লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'আপনাদের সমাজ অনুসারে তা হলে বলতে হয়, কুবের, কচরো, কনকো, কালু—'

বুড়ো বালা বলে ওঠে, 'ব্যস ব্যস। আমাদের ঐ কালে-কুবরে নামই ভালো। কালিয়া নামই বেশ মনে হচ্ছে।'

অন্য লোকেরাও সম্মতি জানায়, 'কালিয়া রাখলেও ঠিক হবে, আর কচরো রাখলেও মন্দ হবে না।'

ব্রাহ্মণ তাঁর হাতের কাগজের ওপরে 'কালুর জন্মপত্রিকা' এই কথাটা লিখে দিয়ে কোষ্ঠী পড়ে শোনাতে থাকেন।

সমবেত লোকেদের চন্দ্র রাহু কেতু ইত্যাদি শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ফুলী-মার জোয়ান ছেলে শংকর বলে ওঠে 'ও-সব তো ঠিক আছে মহারাজ! ছেলে কী ধরনের হবে শেষ পর্যন্ত সেটা তো বলুন ?'

ব্রাহ্মণ আবার হাসেন, 'কেমন আবার'— আর জন্মপত্রিকার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে প্রথম কথা বলেন, 'আপনার ছেলে স্বাবলম্বী হবে কাকা।' গাঁয়ের লোকেদের দিকে কিছুটা গর্ব ও আত্মপ্রশংসার

চোখে তাকিয়ে থেকে আবার বলেন, 'বিশ্বাস না হয় তো এটা আপনারা লিখে রাখতে পারেন।' পুনরায় সেই কুণ্ডলীর দিকে নজর স্থির রেখে বলেন, 'গ্রামের মোড়ল না হয়েও মোড়লের কাজ করবে। উঠোনে ঘোড়া বাঁধা থাকবে, নিজের জাতের আর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। নিজের বাবার মতো বাহাদুর হবে'—

'বাবার মতো' এ-কথাটা শুনেই সকলে বিস্মিত হয়ে যায়। নিজের যুবক বয়সে সে যে রীতিমতো বীর যোদ্ধা ছিল, সেই মোঘলদের একসঙ্গে শেষ করে দিয়েছিল এ-কথাটা ব্রাহ্মণ জানতে পারল কী করে? বুড়োর মুখে যে দু-তিনটে কাটা দাগ আছে, তাই দেখে নাকি? তা সে যেভাবেই জানুক-না কেন লোকেদের ব্রাহ্মণের কথাতে বিশ্বাস আসে।

'ওর পরমায়ু কতদিন মহারাজ?' বুড়ো জিজ্ঞেস করে আর ব্রাহ্মণ যখন উত্তর দেন—'আপনার থেকেও অনেক বছর বেশি' তখন প্রবল খুশির আবেগে তার চোখে জল এসে যায়—'আপনার কথা সত্যি হোক শুধু এটুকুই চাই।'

'এর বিয়ে-থা হবে কিনা? কটা ছেলেপুলে হবে?' ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই করার ছিল কিন্তু আশঙ্কা হয় কালিয়ার ভাগ্যে যদি কোনো মেয়ে না থাকে, তা হলে।

কিন্তু ততক্ষণে মাওজী খুড়ো প্রশ্ন করে: 'আর বিয়ে-থা ইত্যাদি?'

'দুটো বউ দেখছি, কাকা।'

পরমার পঁচিশ বছর বয়সের ছেলে রণছোড় হো-হো করে হেসে ওঠে—'একজনকে নিয়েই মুশকিল আর আপনি···হি···হি···কী দেখে এ-কথা বলছেন মহারাজ?' বুঝতে পারুক বা না পারুক রণছোড়ের সঙ্গে অন্য সকলেও হাসিতে যোগ দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মুখ শংকর-মাওজীদের মতো বিবর্ণ হয়ে যায়।

বালা ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির হলেও মানুষ তো? সে চটে ওঠে: 'আরে ভাই! বিয়ে হল কি না হল তাতে কী এসে যায়? আমি

শুধু এটুকুই চাই যে ও বেঁচে থাকুক, সুখে থাকুক।' বিরক্ত হয়ে সে উঠে পড়ে।

সত্যি বলতে কি বুড়োর কাছে বউ একেবারে না জোটা যেমন দুর্ভাবনার বিষয় ছিল, তেমনি দুটো বউ (এবং একসাথে) অভিসম্পাতের মতন। কিন্তু সব কথা খুলে জিজ্ঞেস করার মতো তার মেজাজ অনুকূল ছিল না।

ব্রাহ্মণ তাকে আবার বসিয়ে শান্ত করে, 'আপনি তো সমঝদার লোক কাকা! লোকেরা যেমন দেখে তেমনিই বলে। কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ রাখবেন—আপনি বেঁচে থাকতে থাকতেই বিয়ের সম্বন্ধ হবে। না হলে আপনারা এই ব্রাহ্মণের নামে থুতু ফেলবেন, নিন্ এবার খুশি তো?' শেষ কথাকটি বলার সময় ব্রাহ্মণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন অন্তরের দীপ্তি ঝর্নার মতো প্রবাহিত হতে থাকে।

ব্রাহ্মণকে পুঁথিপত্র বন্ধ করে রাখতে দেখে বুড়োর মনে ভাবনা জাগে, দক্ষিণা দেবে না দেবে না তার জন্যে সে বলে ওঠে, 'এখন তো আমার কাছে কিছুই নেই মহারাজ। আমি আপনাকে একটা বক্‌না বাছুর দেব।'

ব্রাহ্মণ হাঁ-না কিছু বলার আগেই বুড়োর ছোটো ভাই পরমা বুড়োর ওপর চটে যায়, "ঘরেতে মোষ তো দূরের কথা মোষের গায়ের একটা চুল পর্যন্ত আছে যে এমন দানধ্যান করতে বসেছেন? নিজেকে তুমি যা খুশি ভাবতে চাও ভাবো, কিন্তু—

শংকর, মাওজী প্রভৃতি দু-তিনজন আগে অভিনন্দনের সময় ফুলীাম যেমন বলেছিল, প্রায় সেইমতো বলে 'ছেলে সুস্থ থাকলে কাল সকালেই অবস্থা ফিরে যাবে।'

'সে যখন ফিরবে তখনকার কথা তখন। এখন তো—' পরমা মোড়ল এই লোকেদের ওপরেও চটে যায়, 'আপনারা তো আর জানেন না কিছু! কথা দেবার পর এই বামুন জাতেরা দরজা আগলে পড়ে থেকে দক্ষিণা আদায় করে ছাড়বে, না দিলেই তোমার

সর্বনাশ—’

মোড়লের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাঁকে কাটলে যেন কোনো রক্ত পড়বে না। যেন কোনো মহাপাপ করে ফেলেছে এমনভাবে সে জিভ দিয়ে শব্দ করে ওঠে, ‘চ্চক! চ্চক! চ্চক! এ কী কথা বলছেন মোড়ল? না পেলেই বা, আমি আর কোথায় খোসামোদ করতে যাচ্ছি—’ কিন্তু ততক্ষণে তার সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে— যেন ব্রহ্মতেজ ঝলসে উঠছে, ‘কিন্তু মনে রাখবেন’ পরমা প্যাটেলকে বলে, ‘দেবার মালিক যদিও ভগবান কিন্তু বালাকাকার এই নিষ্ঠা যদি সত্যি হয়, তা হলে সামনের দু বছরের মধ্যে তার অবস্থার উন্নতি হবে, না হলে আমার নামেতে জুতো মারবেন এই বলে দিলাম, যান।’

সেই সঙ্গেই সে পাশে রাখা ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে পড়ে। খাটের ওপরে রাখা পুঁটলির মধ্যে পূজো-আর্চার জিনিসগুলো খুঁজতে থাকে। তার থেকে একটা মাতুলি বার করে বালাকে বলে, ‘কাকা এই নাও! এটা বাচ্ছার হাতে বেঁধে দেবেন।’ পুজোর জিনিসপত্র ঠিকমতো গোছগাছ না করেই ঝোলার মধ্যে রেখে কাঁধে ঝোলা নিয়ে রওনা হবার জন্য পা বাড়ায়।

গাঁয়ের লোকে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণকে শান্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করে। বালা কাতর মিনতি করতে থাকে, পরমা মোড়লও সকলের সঙ্গে অনুরোধ করে কিন্তু ব্রাহ্মণ থাকতে আর কিছুতেই রাজী হন না। চলে যাবার সময় বলে যান, ‘বালা কাকার যতদিন না অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এ-বাড়ির উঠোনে কিংবা এই গাঁয়ে আর পা দেব না।…আর অবস্থা ফিরবেই, এই গরিব ব্রাহ্মণ কথা দিয়ে যাচ্ছে মনে রাখবেন আপনারা।’…সকলে বিমূঢ় হয়ে ব্রাহ্মণের প্রস্থানের দিকে চেয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হওয়া মাত্রই বালা সজল চোখে ছোটো ভাইকে জিজ্ঞেস করে,—‘আমি তোর কাছে এমন কী অপরাধ করেছিলাম ভাই, যার জন্যে আজ এই ব্রাহ্মণকে আমার বাড়ির উঠোন থেকে

অভুক্ত তাড়িয়ে দিলি ?'

'এ-সব তো তোর জন্যেই হল, বুড়ো !' ভাইপো রণছোড় রেগে পাল্টা জবাব দেয়।

পরমা নিজের সাফাই গাইতে থাকে, 'ভাবনা-চিন্তা হয় বলেই কিছু না বলে থাকতে পারি না। তোমরা সব তার উল্টো মানে করেছ।'

সামনের দিক থেকে এক স্ত্রীলোকের গলার স্বর শোনা গেল, 'উল্টো বুঝবেই তো !' সকলেই তার দিকে ফিরে তাকায়। পরমা মোড়লের স্ত্রী রাগ করে নিজের স্বামীকেই ব্যঙ্গ করতে থাকে, 'তোমার তিনটে ছেলে আছে তাই ভাইয়ের বংশ লোপ করতে চাও, তা উল্টো বুঝবে না তো কী বুঝবে ? কিন্তু বোকচন্দ্র এটা ভাবতে পারলে না যে পেটে যখন ধরেছে তখন হাঁড়িতে না ধরার কি আছে।'

গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। এক এক করে সকলে চলে যেতে থাকে। বুড়ো বালা তাদের কেবল বোঝাতে থাকে, আরে ভাই, ঐ ব্রাহ্মণ অভুক্ত চলে গেছে আর তোমরাও গুড় না নিয়ে চলে যাচ্ছ ? আমার বাড়ির এক টুকরো গুড় তো নিয়ে যাও।'

দু-তিন জনে জবাব দেয়, 'গুড় খাবার এখন অনেক দিন আসবে। আফিম দিয়ে হুকো টেনেছি ওতেই সব-কিছু এসে গেছে···তোমার কালিয়া সুস্থ থাকলেই আমাদের ভালো লাগবে।'

শেষ কথাটা কানে যেতেই পরমার বউ যেন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'মুখপোড়া মরণ আর কি ! কালিয়া ! নাম দেখো-না একবার ! এক নম্বরের অপয়া জন্মেছে একটা'— বালার দিকে হাত নেড়ে বলে, 'মনে রাখিস, বুড়ো ! নাম দিতে না দিতেই ব্রাহ্মণ না খেয়ে উঠে গেছে, তোর চেষ্টা সত্ত্বেও এরা মুখমিষ্টি না করে চলে গেল, এবার দেখিস তুই···' তার মুখ থেকে যেন দাউ দাউ করে আগুন বেরোতে থাকে, 'ঘোড়ার ওপর চড়বে তো ঐ ওখানে···আকাশেতে, উঠোনে একটা গাধাও যদি বাঁধতে পারে তো মনে রাখিস আমার কথা ! বাবা রে······বাবা !'

রাগ চেপে রাখতে না পেরে বালার স্ত্রী ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, 'বলে যা, আরো বলে যা। কিন্তু জানিস তো সতী-সাধ্বীরা কখনো শাপ দেয় না আর খাণ্ডারণীরা...'

বুড়ো বালা ভয়ে কেঁপে ওঠে, 'কি মুশকিল, ওকে খাণ্ডারণী বলছিস' স্ত্রীর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে সে ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠে, 'চুপ কর, চুপ কর! ভগবান যদি খুশি হয়ে দিয়ে থাকো তো কেউ ওর কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না। যা তুই ঘরে চলে যা। ঝগড়া-বিবাদের চেয়ে বড়ো অভিসম্পাত তুনিয়াতে নেই।'

তার স্ত্রী রাগের দমক হজম করার চেষ্টায় ঠোঁট কামড়ে ধরে ঘরে ফিরে যায়।

আর পরমার স্ত্রী অভিধানে লেখা নেই এমন সব শব্দে গাল-গালাজ পাড়তে থাকে। শাস্ত্রে উল্লেখ নেই এমন-সব শাপ-শাপান্তে মেতে ওঠে।

ভয়ে বালার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। মনে মনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 'হে ঠাকুর, তোমার কাছে তো কিছুই লুকানো নেই। আমি ঝগড়া-বিবাদ করতে পারি না— আর ঝগড়া করবই বা কেন? আমাকে রক্ষা করার জন্যে সহস্রবাহু তুমিই তো রয়েছ!'

ঘরে গিয়ে প্রথমেই সে ধূপ জ্বেলে সেই মাতুলিটা কালুর হাতে বেঁধে দেয়।

পরমার স্ত্রী তখনো চীৎকার করতে থাকে কিন্তু বালার মনে আর কোনো ভয়-ভাবনা থাকে না, 'না চাইতেই ব্রাহ্মণ এই মাতুলি দিয়েছে— শাপ-শাপান্ত এখন নিশ্চয়ই সব বিফল হয়ে যাবে।'

॥ চার ॥

সুতো

সেদিন আষাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়ার রাত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ভোর রাতের দিকে ধুলোর ঝড় পৃথিবীর ওপর ভীষণভাবে মাতামাতি আরম্ভ করে। মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে গেল। সকালের দিকে মেঘ গর্জন করতে করতে উত্তর দিকের পাহাড়ের সারির ওপারে চলে যায়। সেই মেঘের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ সব মিলিয়ে গেল। সকলেই দেখল একরাতের মধ্যে— মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই পৃথিবী যেন দিক পরিবর্তন করেছে॥ কাল পর্যন্ত যে মাটিতে পা রাখা যাচ্ছিল না, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতো ভাঁপ বেরোচ্ছিল কিন্তু আজ তা এমন ঠাণ্ডা, মনোরম হয়ে গেছে যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। জায়গায় জায়গায় জল জমে ডোবা তৈরি হয়েছে। ব্যাঙের দল তাতে নানা সুরে ডাকছে। শুষ্ক শীর্ণ বনরাজী এই এক রাতের জলপ্লাবনে দৃষ্টিসুখকর সবুজ রঙ মেখে যেন মুখ মুচকে হাসছে। বর্ষার সাথে সাথেই পাখির দল আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে দল বেঁধে নেমে আসতে থাকে বর্ষাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।··· এমনি ভাবে এক রাতের মধ্যেই যেন সমস্ত পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়।

কেবল পৃথিবীই নয়। ভয়াবহ উগ্রতায় তপ্ত হাওয়ার যে ঝড় বইছিল এতদিন তা আজ শীতল হাওয়ায় প্রবাহিত। যেন দুহাত দিয়ে মাটির সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। চারাগাছের নতুন শীষের ডগা হাসছে, গাছের শাখা-প্রশাখাগুলি দোল দিচ্ছে। নদীতটের ঘন বনের মধ্যে ও দূর পাহাড়ে কানামাছি খেলছে।

আর ঐ সূর্য। কাল পর্যন্ত আকাশের উনুনে এক জ্বালাময়ী

আগুনের গোলার মতো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিল, কিন্তু আজ সে সারা আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে হাসছে। উপছে পড়া ডোবার জলে ছোটো বাচ্চাদের সঙ্গে সেও যে উঁকি দিয়ে নিজের মুখের ছায়া দেখছে। ছেলেরা পাথর ছুড়ে সেই প্রতিবিম্বটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তবুও তাকে উঁকি মারতে দেখা যেতে থাকে, যেন সেও ছেলেমানুষ সেজে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে।

গোরু-বলদগুলো সারারাত শূন্য খুঁটিতে বাঁধা ছিল। তারাও আজ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির এই লীলাখেলা দেখে সব পাওয়ার আনন্দে খুশি হয় যেন। তারা মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকাচ্ছে না; নদীনালায় গিয়ে ঘাসের গোছা উপরে তোলার জন্যেও ব্যস্ত হয় না। হেলতে দুলতে তারা মন্থরগতিতে এগোতে থাকে।

কিন্তু আজ এই গোরু-মোষেদের মধ্যে কোনো বলদ বা ষাঁড় ছিল না। কিসের জন্যে? তাদের আজ অন্যত্র বিশেষ দরকার। উঠোনের খুঁটিতে বেঁধে তাদের মুখের সামনে জাবের ডাবর রেখে দেওয়া হয়েছে। ডাবর খালি হতেই এমনি আষাঢ়ের দিনের জন্যে ঘরের মাচায় সযত্নে তুলে রাখা খড় নিয়ে এসে ভরে দেয়। কোথাও কোথাও শুকনো খড়ের গাদা এমন বড়ো যে বলদ পর্যন্ত চাপা পড়ে যাবে। মাঠে লাঙল হাঁকতে পাঠাবার জন্যে বাড়ির বউয়েরা রান্নায় ব্যস্ত ছিল। বালার মতো গরিব মানুষও কাজে বেরোবার জন্য পোয়া-টাক ঘি চেয়েচিন্তে জোগাড় করে এনেছে। যে-সব বাড়িতে কাজে বেরোবার লোক রয়েছে সেখানে উঠোনের পাতা উনুনে গরম জল বসানো ছিল। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যে-বাড়িতে অনবরত ঝগড়া হয় সেই পরমা মোড়লের বাড়িও নীরব শান্ত। শুধু তাই নয়, জন্ম অবধি যে কোনোদিন হাসে নি সেই মালীর চেহারাতেও একটা হাসিখুশির ভাব ফুটে উঠেছে। সদাসর্বদা তার মুখে শোনা যেত, 'মর মুখপোড়া, আগুন লাগুক, জ্বলেপুড়ে খাক্ হোক' ইত্যাদি শব্দগুলো আজ এই আষাঢ়ের সকালে তাদের স্থায়ী আবাস

তার ঠোঁট থেকে যেন নির্বাসিত হয়েছিল। খিটখিটে মেজাজের বউয়েরা পর্যন্ত আজ এমন আদরযত্ন করে খাবারদাবার পরিবেশন করছে যেন দূর বিদেশে রোজগারে যাবার আগে মা তার ছেলেকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছে। বালার প্রতিবেশী মালজী খুড়ো বলদের কাঁধে লাঙল জুতছিল, মঙ্গা খুড়ী তাকে উপদেশ দিতে থাকে, 'মনে রেখো, কোথাও কোনো কথাবার্তা বলতে যাবে না। গণেশঠাকুরের নাম করতে করতে সোজা সেই পিপুল গাছতলা ক্ষেতে চলে যাবে। বীজের ঝুড়ি, তামাক আর অন্য সব কিছু নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

বলদের গলায় পুরোনো ঘুঙুর পরাতে পরাতে বালা হেসে বলে, 'ঠিক, নইলে আজ আষাঢ়ের দিনে কোথাও গালগল্প করতে না বসে যায় যেন।'

'দূর! আমি কি পাগল নাকি বালা?' বুড়ো বলদ হাঁকতে হাঁকতে জবাব দেয়।

'না, পাগল নও বটে, তবে বড্ড অন্যমনস্ক, ভুলো মানুষ তুমি দাদা।'

'উঁহু ওটা তোমরা শুধু শুধু আমার··· কিন্তু মঙ্গা খুড়ী কান খাড়া করে দাঁড়িয়েছে। পাছে সে কিছু বেফাঁস বলে ফেলে, তাই কথা থামিয়ে দেয়, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভগবানের নাম করতে করতে এবার রওনা হও দেখি।'

'ভগবানের নাম তো রাতদিনই করছি' এই বলে বুড়ো পাড়া দিয়ে যেতে যেতে যে কথা মুখে আনা উচিত নয় তাই বলে ফেলে— এবং বেশ উঁচু গলাতেই, 'হ্যাঁ শুনছ, আগুন নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।'

'আগুন' কথাটা শুনেই পাড়ার সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। মঙ্গাখুড়ী নিজেও না হেসে থাকতে পারে না, 'আ, মরণ! এত করে শেখাই তবু—'

'ওতে কোনো দোষ নেই, বউদি! অগ্নি দেবতাদেরও দেবতা!' বালা বলে এবং নিজে 'জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ' স্মরণ করে বলদের কাঁধে লাঙল চড়িয়ে লাগাম বেঁধে যেন যুবকের সাবলীলতায় ধরিত্রী মায়ের কোল দলিত মথিত করতে রওনা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঁয়ের চৌরাস্তায় চারধারে ঘুমুর আর ঘন্টির মিষ্টি আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। কাল অবধি যে মাঠ খালি পড়েছিল, ক্বচিৎ কখনো পশু বা মানুষ দেখতে পাওয়া যেত, সেখানে আজ কিষাণদের কর্মব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। কেউ বীজের ঝুড়ি নিয়ে আসছে, কেউ ঝুড়ি নামিয়ে রেখে ফিরে যাচ্ছে। ছোটোদের কাছে এদিন আনন্দে মাতামাতি করার— তারা হুঁকো তামাক, জলের ঘটি অথবা আগুনের মালসা খুশি মনে দিয়ে বা নিয়ে যাচ্ছিল।

বয়স্কদের মনেও সেই একই অনুভাবনা। কালকেও যারা কৃমি-ফোঁড়ার যন্ত্রণায় খাটের ওপর চুপ করে বসে থাকত, জলখাবার জন্যেও নীচে পা নামতো না, তারা আজ মাঠে লাঙল চালাতে চলে এসেছে। বুড়ো বালাই তার বার্ধক্যের অক্ষমতাকে এক পাশে ঠেলে মাঠে নেমেছে। মোড়লের ছেলে রণছোড়ের গায়ে জ্বর ছিল। আজ গ্রীষ্মের রোদের মতোই তা কোথায় পালিয়ে গেছে। গাঁয়ের সমস্ত পুরুষেরা আজ তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছে। অন্ধ বুড়ো লালজী লাঠিতে ভর দিয়ে মাঠের ধারে এসে বসে— যেন ঘরের ছায়ার চেয়ে আকাশে ঐ মেঘেদের ছায়া অনেক বেশি শীতল, যেন ঘরের ছাদের থেকেও আকাশের এই ঘেরাটোপ অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক।…

প্রত্যেক চাষীর মনে এখন শুধু একমাত্র ভাবনা এই, জমিটা চষার পর অন্য মাঠে যেতে হবে। যদি এখন দু-তিন দিন বৃষ্টি না পড়ে তা হলে ভুট্টা চাষের জমিটা ভালো তৈরি হবে, পরে যদি ঐ বড়ো ক্ষেতটা জলে ভরে যায় তা হলে ধানও… ।

কিন্তু বালার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছিল। 'কালিয়ার যদি কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয় তবে গঙ্গায় চান করে আসি…ছোকরার এখন যদি পাকা দেখা না হয় তো বরাবরের জন্যেই বাদ পড়ে যাবে। এই বছর দুয়েকের মধ্যে পাকা দেখা হয়ে যায় তো ভালোই নইলে ওর দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না।' বুড়ো গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলে, 'হে ঠাকুর। সব-কিছু পারি শুধু ভাইয়ের বাড়ির বিদ্রূপ আর সহ্য

হয় না।'

বুড়োর দুঃখ মিথ্যে নয়। পাকা দেখার তো কোথাও কিছু ঠিক ছিল না। কিন্তু এ-ব্যাপারে সামান্য কোনো কথাবার্তাও যদি কোনোখানে ভেস্তে যেত তো অমনি ভায়ের বউ টিটকিরি দিত, এতবড়ো মাতব্বর লোক, তবু ছেলের পাকা দেখার কথা সব জায়গায় ভেঙে যায় কেন?'

'তোর নিজের তো হয়ে যায় তা হলেই হল, অন্যের কেন—'

কিন্তু বালা কথা শেষ করার আগেই মালী বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসে, 'একশোবারই তো। আমার ছেলেরা দোলনায় শুয়ে থাকার সময়েই অন্যের পছন্দ হয়ে যায়, বুঝলে? দোলনায় থাকতে থাকতেই। এমনি এমনিতে তো আর পছন্দ হয় না। আত্মীয়-কুটুম্বের যাওয়া-আসায় বছরে আমার দুটো করে খাটিয়া ভাঙে, আর—'

বুড়োর দুঃখ হয়, নিজের জন্যে নয়, ভাইয়ের বউয়ের এই গর্বের জন্যে; সে বলে, 'বড়াই করিস নি, আর বড়াই করিস নি! এত গর্ব কিসের তোর? আমার ভাগ্যই যে আমাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। ল্যাজ ঘুরিয়ে আসে আর ল্যাজ ঘুরিয়ে যায়। আমি নিজের চোখে তা দেখেছি, তাই—'

কিন্তু বুড়োর এ কথাতেও উল্টো ফল হয়। পরমা চটে গিয়ে বলে—'তুমি যদি এতেই খুশি থাকতে চাও তো বলার কিছুই আর নেই', আর তার বড়ো ছেলে রণছোড় তো মারতে এগিয়ে আসে। তার পেছনে পেছনে কুকুর-ছানার মতো ক্ষুদে সাত-আট বছরের ছেলে নানিয়াও তেড়ে আসে। বুড়োর ভয়ে অবশ্য রণছোড় দূরেই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'কী, দেখছিস কী, তোর দৃষ্টি আমার খারাপ লাগে। আমাদের গোরু বলদ কিংবা বাড়ির লোকের যদি একচুলও কিছু অনিষ্ট হয় তা হলে মজা দেখিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।'

এমনভাবে ঝগড়া অনেকবারই হয়েছে—কখনো যদি পুরো সাতদিন খালি যায় তো ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তার শোনা

সেই সংস্কৃত শ্লোকের মতো সে নিজে বহুবার ভেবেছে, জঙ্গলে যদি পড়ে থাকতে হয় সেও অনেক ভালো কিন্তু এমন ভায়েদের সঙ্গে—'

বয়স কম হলে বালা হয়তো পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে নিত। ভাইয়ের সমস্ত পরিবার যেন তাকে গ্রাস করতে বসেছে। ঝগড়াকে সে এত বেশি ভয় করত যে কখনো কখনো সে নিজেই উল্টো কামনা করে বসত···

'কালিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ না-হয় না হবে, আর তাতেই যদি পরমার বাড়ির লোকেরা খুশি হয় তো···' এই ধরনের ঝগড়া থেকে শেষ কোনো একটা অনিষ্ট হতে পারে এমন একটা ভয় বুড়োর সদাসর্বদা হত। বারবার সে বলত, 'কাস্তের ঘা থেকে বাঁচলেও বাঁচতে পারি কিন্তু এই দাঁতের কামড় থেকেই বাঁচা মুশকিল।'

গাঁয়ের লোকেরাও পরমা মোড়লের বাড়িকে ভয় করে চলত। ভালো পরামর্শ দিতে এলে যেখানে ঝগড়া বেঁধে যায় সেখানে পক্ষ নেবার কথাই ওঠে না। আর এই কারণেই কালুর পাকা দেখার ব্যাপারে এদের সঙ্গে সম্পর্কিত কারোর জন্যে সুপারিশ করতেও গাঁয়ের লোকেরা ও তাদের আত্মীয়স্বজন সকলেই ইতস্তত করত।

বুকের পাটা দেখালে শুধু ফুলী-মা। 'মোড়লের বাড়ির লোকেরা ভাবে যে কালিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করার ক্ষমতা কারোর নেই, কিন্তু··· ।'

কিন্তু ফুলী-মাই বা করবে কী? পাকা দেখা হয় নি এমন একটাও মেয়ে সেই তল্লাটে ছিল না। থাকবেই বা কি করে? আঁতুড়ে থাকতে থাকতেই সম্বন্ধ হয়ে যায়। ফুলী-মা সম্ভাব্য পোয়াতীদের ভরসায় শান্ত থাকে। সে বালার সঙ্গে এ-বিষয়ে কোনো কথা বলে না। নিজের ছেলে শংকরকেও মনের কথা খুলে প্রকাশ করে না।

মাস-দুই বাদে শ্রাবণের এক বর্ষণ-মুখর দিনে এ গাঁয়েরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় গলার স্ত্রী একটি মেয়ের জন্ম দেয়। ফুলী-মার হাতেই আঁতুড়ের ভার ছিল। শুভ কাজে যাতে কোনো ফাঁক না

থাকে সেই চিন্তায় ফুলী-মা ভাইপোর বউয়ের সাথে সেই মুহূর্তেই কথাটা পেড়ে দেখে। বলতে কি প্রায় আদেশই দেয়—'এই মেয়ের সঙ্গে বালার ছেলে কালুর সম্বন্ধ করে রাখলুম, এটা মনে থাকে যেন তোর।' কালুর স্বাস্থ্য এবং রূপের থেকে বালার স্বভাবের ধরন-ধারণ মেয়ের মায়ের বেশি পছন্দ ছিল। তার ওপরে কালুর মা তার বন্ধুর মতো।' দ্বিতীয়ত ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক ফুলী-মা যখন বলেছে তখন সম্বন্ধের ব্যাপারে আর কথা বলতে পারে না। তাই সে জবাব দেয়, 'আমার কোনো অমত নেই, কাকী! এখন তোমার ভাইপোর মত থাকলেই হয়।'

'ও আবার বলবে কী?' ফুলী-মার সাহস বেড়ে যায়। সুযোগ বুঝে এক সময় ভাইপোর সঙ্গে কথা বলে তাকেও রাজী করিয়ে নেয়। তবে সেও বলে যে, 'মেয়ের মা রাজী থাকলে আমার অমত নেই। তবে মেয়ের দাদু-দিদিমার কথাটা ভেবেছ তো?'

তা মেয়ের মামার বাড়ির মত তো নিতেই হবে। সেই রকমই রীতি, তাই ফুলী-মা না বলে আর কী করে। কিন্তু সে কিছুটা নিরাশ হয় কারণ মেয়ের মামার বাড়ি আবার পরমা মোড়লের ছেলে রণছোড়ের শ্বশুর বাড়ি।

'ভাবনার কিছু নেই। তারা পরমা মোড়লের কুটুম হলেও আমার সঙ্গেও তো কিছু আত্মীয়তা রয়েছে।'

ফুলী-মাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত কী ধরনের আত্মীয়তা তা হলে সে এক অদ্ভুত সম্পর্কের কথা তুলত যে আমার সৎমার মামার মাসীর মেয়ের মেয়েই আমার ভাইপোর বউয়ের মা। এইভাবেই সে লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের এমন উদাহরণ দেয় যেন শেকড় থেকে নিয়ে পাতা পর্যন্ত গাছের সব সম্বন্ধ একসাথে যোগ করে দেখাচ্ছে। তার স্মরণশক্তিও আশ্চর্য রকমের। শুধু নিজের গাঁয়ের নয় আশপাশের আট-দশটি গ্রামের লোকের সাত পুরুষের বংশাবলী ঘটকদের থেকেও ভালোভাবে শোনাতে পারে। কে কোথা থেকে এসে বসতি পেতেছে, কোন্ জমি ক'হাত ফিরেছে সে কথাও

সব তার জানা। ভাগ-বাঁটোয়ারা করার সময় ঝগড়াতে কিংবা পাকা দেখার ব্যাপারে এ-পক্ষের ও-পক্ষের মধ্যে সম্পর্কে কোনো গোলমাল দেখা দিলে ফুলী-মা যতক্ষণ-না নিজ মুখে রায় দিচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না।

এমনি অনেক ঝগড়ার মিটমাট সে করেছে। গত দশ বছর থেকে সমাজের সব ঝগড়া-বিবাদে ফুলী-মা মধ্যস্থতা করেছে এবং শেষ এক-দু বছর থেকে তার মতামত পরামর্শ ছাড়া ক্বচিৎ কখনো ছেলে-মেয়ের পাকা দেখার কাজ হয়েছে।

কালুর পাকা দেখার দায়িত্ব তো সে নিজের মাথায় নিয়েছিল। তার আশা ছিল মেয়ের মামার বাড়ির লোকেরাও কোনো আপত্তি করবে না। তাই সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'মালীকে আমি শুধু দেখাতে চাই যে বালা ভায়ের জন্যেও গাঁয়ে কেউ আছে। কালিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করব তবেই আমার নাম ফুলী।'

আর হলও ঠিক তাই। মেয়ের মামার বাড়ির লোকেরা কোনো অজুহাত না দেখিয়ে খুশি হয়ে বলে, 'আপনি যখন যেমন করতে বলবেন তাই হবে. তা সে পাত্র শূদ্র হলেও কিছু বলার নেই··· ।'

'ওভাবে কিন্তু হবে না। আপনাদের বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে গিয়ে জামাইয়ের বাড়ি আমাদের সকলের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করলে তবেই আমি মানব।' বৃদ্ধ জানত যে বিয়ের পাকা দেখার ব্যাপারে যতক্ষণ দুপক্ষই একবার সাক্ষাৎ না করে নিচ্ছে ততক্ষণ চার মাসের কথা-বার্তাতেই কোনো ফল হবে না। শেষ পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে এ-পক্ষের কারোর ওদিকে আসবার কথা আদায় করে নেবার পর তবেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে আতিথেয়তার জন্যে সামনে রাখা মিষ্টির থালায় হাত দেয়।

হপ্তা গড়িয়ে পনেরো দিন কেটে যায়। ফুলী-মার নিজের ভাইপো আজ নয় কাল করে ঘোরাতে থাকে। পরমা মোড়লের ছেলের বউ চার-ছ'দিন বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি করে বেড়ায়।

কিন্তু বুড়ী মনে মনে যা এঁটে রেখেছিল তাই করলে শেষ পর্যন্ত।

আশীর্বাদের দিন ঠিক করে সে বালাকে খবর পাঠায়, 'সামনের সোমবার গলার মেয়ের সঙ্গে কালুর পাকা দেখার তত্ত্ব নিয়ে আসছি আমি।'

বুড়ো বালা আনন্দে পাগলের মতো হয়ে যায়। যেন ভগবান আসছে তার ঘরে। তিলের বীজ বোনার কাজ ছেড়ে দেয়। আট-দশ বাড়ি ঘুরে ঘুরে এক সেরের জায়গায় দু সের ঘি জোগাড় করে নিয়ে আসে। গম নিয়ে এসে তা পিষবার জন্যে বউকে জাঁতা সাজিয়ে দেয়। সোওয়া গুণ বেশি দাম দিয়ে বেনের কাছ থেকে পাঁচ সের গুড় নিয়ে আসে। তা ছাড়া আশীর্বাদের তত্ত্ব নিয়ে যে-সব এয়ো-স্ত্রীরা আসবে তাদের রাত্রির থাকার জন্য দু-চারটে লেপ-তোষক পর্যন্ত চেয়ে আনে।

তার বউয়ের আনন্দও বলার নয়। আনন্দ হবে নাই-বা কেন? লোকেদের দোরে দোরে ঘুরে পায়ের চেটো ক্ষয়ে যাবার পর তবে ছেলেকে দেখতে আসার লোক পাওয়া যায় আর এ তো গাঁয়ের মান্যগণ্য ঘর থেকে তাদের নিজের ইচ্ছাতে আশীর্বাদের তত্ত্ব আসছে। পরমা প্যাটেলের নিজের তিন ছেলের কেবল এক জনেরই কাছাকাছি সম্বন্ধ হয়েছিল।

আর ঠিক সেইজন্য পরমা মোড়লের বাড়ির আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

সেই সোমবারে সকালের ঘটনাটা এমনি হল: বড়ো ছেলে রণছোড়ের স্ত্রী বছর খানেকের মেয়েটাকে ধরে পিটতে শুরু করে আর রণছোড় বউকে গালিগালাজ পাড়তে থাকে। আর মালী নিজের স্বামী পরমা মোড়লকে শুনিয়ে বলতে থাকে, 'মরে যা, মরে যা পুরুষের অধম। এখান থেকে বেরিয়ে কোনো সাধুর দলে গিয়ে ভিড়ে যা। গেল কোথায় হতভাগা রণছোড়টা? এমন অপদার্থ আমার পেটে কী করে জন্মাল? তাড়িয়ে দে অমন বউকে বাপের বাড়ি। ওর বাপের বাড়ির লোকেরাই এ-বাড়ির মান সম্মান সব ডোবালে। বাপরে বাপ! অমন হিতাকাঙ্ক্ষী কুটুম ছাড়া আর

কে নিজের ভাগ্নীকে আমার বুকে আছড়াতে আসবে।'

এর পরে তো শাশুড়ী-বউয়ের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। রণছোড় আর তার মধ্যেও আগুনের ফুলকি উড়তে দেখা যায়। মালীর পক্ষ নিয়ে কথা বলায় বাপ-বেটাতেও ঝগড়া লেগে যায়। মেজ ছেলে নাথার বয়স বছর পনেরো— মাঠে লাঙল দেবার জন্যে বলদ নিয়ে সে রওনা হয়, 'ঠোকাঠুকি করে ফাটাও মাথা এখন সব।' আর সাত-আট বছরের নানিয়া খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে— যেন ঢোল তাঁসার সঙ্গে সানাইয়ের সুর মেলাতে বসেছে।

পাকা দেখার তত্ত্ব নিয়ে যে চারজন স্ত্রীলোক আসে তাদের মধ্যে ফুলী-মা না থাকলে মালী ঠিক বালার সদর দরজার চৌকাঠে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে বলত, 'আমাকে না বলে না জিজ্ঞেস করে তোমরা সব তত্ত্ব নিয়ে এসেছ আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্যে, তাই না!' এমনি নানান হম্বিতম্বি আর ধমক লাগাত।

কিন্তু কী আর করবে? ফুলী-মা অমন সতেরোটা মালীকে আঁচলের খুঁটে গেরো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে তো তাই চাইছিল, 'আসুক দেখি আমার সামনে একবার।'

'সত্যিই যদি আসে তা হলে কী করবে ফুলী-মা?' ঘরে মশলা কুটতে যে পাঁচ-সাতজন স্ত্রীলোক ব্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে একজন যুবতী প্রশ্ন করে।

তার উত্তরে ফুলী-মা যে কথা বলে তেমন কথা কোনো পুরুষ নিজেদের মধ্যে বলতেও ইতস্তত করত।

অবশ্য ফুলী-মার যে গায়ের জোর ছাড়াও অন্য কিছু একটা ক্ষমতা আছে সে কথা এরা সকলেই মানত। তাদের মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘুরছিল, 'মালী যদি সত্যিই এসে পেঁছিয় তা হলে বালার উঠোনে কাঠের খুঁটির মতো আটকে যাবে, নাকি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

কেবল এই স্ত্রীলোকেরাই নয় আশপাশের এলাকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ফুলী-মাকে ডাইনী বলে মানে। ফুলী-মার কানেও পৌঁছে-

ছিল কথাটা একবার, যে চার-পাঁচজন কথাটা রটাতে শুরু করেছিল সে তাদের রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেয়, 'আমি যে ডাইনী তার প্রমাণ কর নয়তো আমার নামে মিথ্যে কেন বদনাম দিচ্ছিস তার জবাব দে, হারামজাদারা।'

ডাইনী কি আর কাগজে কলমে লিখে কাজ করে যে, খাতাপত্র নিয়ে গিয়ে কিংবা ডাইনীর মধ্যেকার আসল 'দানোটা'কে নিয়ে এসে কিছু কেউ প্রমাণ করতে পারবে?···

রায় দেবার জন্য পঞ্চায়েত ডাকা হয়— সেই লোকেরা উপযুক্ত খেসারত দিয়ে তবে ছাড়া পায়। সেইসঙ্গে ফুলী-মাকেও প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। জরিমানার যে পয়সা পেয়েছিল তা নিজে না নিয়ে সে বড়ো বড়ো কড়াই বাসন ইত্যাদি কিনে পঞ্চায়েতকেই দান করে দেয়।

ফুলী-মাকে হাসিখুশি দেখে যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'ও ফুলী-মা! লোকেরা সকলেই যে আপনাকে ডাইনী বলে ডাকে?' তা হলে ফুলী-মা হেসে উত্তর দেয়, 'কেন যে বলে বোন, তা কে না জানে? সে যাই হোক, 'ডাইনী ডাইনী' বলে বটে আবার খারাপ ভালো সব ক্ষেত্রের সব উপলক্ষেই আমাকে নেমন্তন্ন করে। কীই-বা আর করতে পারি, ঘড়ার মুখে নাহয় কাপড় বাঁধা যায় কিন্তু পাতকুয়োর মুখ কী করে বাঁধা যাবে?··· আমার অভাবও তো কিছুর নেই। শংকরের মতো বাধ্য ছেলে রয়েছে' এবং ছেলের ঘরে তার মেয়েও আছে। আমি ডাইনী হলে আমার ছেলেমেয়েদেরই আগে খেতুম না নাকি? যারা বলে তাদের বলতে দাও। মহামান্য সম্রাটের ছেলেও যদি এসে উপস্থিত হয় আমাদের সমাজে তবুও তার ভয়ে আমি চুপ করে থাকব না। হতভাগাদের মনই পেঁচালো। তাই আমাকে ডাইনী বলে বেটারা। কিন্তু মুখপোড়ারা এটা জানে না যে মেয়েরা এখন রাজ্য চালাচ্ছে। এই যে সাহেবরা এসেছে, বলে নাকি ওদের কে যেন রানী,' মনে করার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'আছে নিশ্চয়ই কেউ, বলে তো তাই— হ্যাঁ, রানী ভিক্টোরিয়াই তো

রাজত্ব করছে। তার বুদ্ধি আছে বলে তবেই না? কিন্তু এ-সব কথা আমাদের লোকেরা বুঝতে পারবে না—' কথার ছেদ টেনে বলে, 'বাদ দাও ওদের কথা, বললে ওদের নিজেদের মুখই ব্যথা করবে। যে নিজে ঠিক থাকে তার কেউ কিছু করতে পারে না।'

ফুলী-মার কথাই ঠিক। লোকেরা তো অনেকে অনেক কথাই বলে। কেউ বলে যে লোকে নাকি বুড়ীকে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাতে নদীর দিকে যেতে দেখেছে; অন্য কেউ হয়তো বলে, বুড়ীকে সে কুমীরের পিঠে বসে জপ করতে দেখেছে। কিন্তু কে যে সঠিক দেখেছিল সে কথা আর কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া কোনো বাড়ির লোকেরা যদি কোনো বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করে দেয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের বাড়ির কোনো ছেলেমেয়ের অসুখবিসুখ হয়, অমনি লোকেরা বলবে, 'দেখলে তো; রাজী হয় নি তাই মেয়ে অসুখে পড়ে গেল।' ভূতপ্রেতের গালগল্প ফুলী-মার নামে এত বেশি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে যারা অবিশ্বাস করত তাদেরও শেষ পর্যন্ত মানতে হয় সব-কিছু। একবার এক ওঝার চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছিল, 'না-ভাই, এ-সব আমি মিথ্যে গল্প করছিলুম'···আর বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'কি করব ভাই, এই পোড়া পেটটাকে পালার জন্যেই এ-সব ঢং করে বেড়াতে হয়।'

আসলে এই ব্যাপারটার পরই লোকেরা ফুলী-মাকে পুরোপুরি ডাইনী বলে মেনে নিয়েছিল, 'ওঝা যেমনি ভূতপ্রেতকে মন্ত্র পড়ে স্মরণ করত ওমনি দেখা যেত ফুলী-মা যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে।' কেউ কেউ আবার বলত যে আপনার থেকে ছিটকিনি খুলে গিয়ে দরজা পথ করে দেয় যেন।

কিন্তু ডাইনী হিসেবে বদনাম হওয়া সত্ত্বেও ফুলী-মা সকলের কাছেই প্রিয়পাত্র ছিল। বউয়েরা দুঃখেকষ্টে তার কাছেই চোখের জল ফেলত, শাশুড়ীরা বউদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলার জন্যেই তাকেই অনুরোধ করত। আর পুরুষেরাও সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে মুদির দোকানের ধারদেনার মিটমাটের

ক্ষেত্রেও ফুলী-মাকে, ডেকে নিয়ে যেত।

প্রসূতির কাজেকর্মে লোকে তাকে প্রায় ডাক্তার বলে মানত। পঁচিশ ক্রোশ দূর থেকে পর্যন্ত বেশ কয়েকবার তাকে লোকে ডাকতে আসত। এ ছাড়াও কারোর হাড় সরে যাওয়া, ফিক-বেদনার মালিশ করা, বিভিন্ন স্ত্রী-রোগ ও বাচ্ছাদের অসুখবিসুখের অনেক চিকিৎসাই সে জানত। কিন্তু আশ্চর্য এই ছুনিয়া! সাক্ষাৎ অসুখবিসুখের উপসর্গ থাকলেও লোকেরা নিজেদের যুক্তি তৈরি করে নিত, 'কেবল লোক-দেখানোর জন্যে ও তো শরীর মালিশ করছে, হাত-পা টেনে দিচ্ছে, আসলে রোগ ঐ মন্ত্রের জোরে সেরে যায়।'

যুগপৎ এই ভয় ও শ্রদ্ধার জন্যে মালী শেষ পর্যন্ত বালার উঠোনে এসে দাঁড়াতেই পারছে না। আসা দূরের কথা অন্য যে-সব স্ত্রীলোক আসছিল তাদের নামেও কিছু বলতে সাহস করে না। বালাকে যে গালাগাল পাড়ছিল তাও এইভাবে, 'সারা গাঁয়ের লোকে আমাদের কাছে খোঁজখবর নিতে আসে আর তুই আপন ভাই হয়েও একবার জিজ্ঞেস করতে এলি না?' অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করার আগে তবু বালার স্ত্রী ভাজকে ডাকতে গিয়েছিল, কিন্তু মালী, 'ওরা তোর সব আপনজন ওদেরকেই খাওয়া', এই বলে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের দিকে চলে যায়। বালা আর তার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ পায় এতে।

পরমার বাড়ির সকলের এই জ্বলুনি দেখে ফুলী-মা কিন্তু উল্টে খুশিই হয়। এটাই বলতে গেলে তার কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দের বিষয়, তার এই-সমস্ত পরিশ্রমের একমাত্র পুরস্কার।

রাত্রে অনেক দেরিতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে সকলে বালার বাড়ির ছোটো কিন্তু পরিচ্ছন্ন উঠোনে বসে গল্পগুজব করতে থাকে। ফুলী-মা সে-সময়ে বলেই ফেলে, 'পরমা মোড়ল আর মালীকে জব্দ করার জন্যেই আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সম্বন্ধ পাকা করেছিলাম।'

উঠোনের বেড়ার ওপাশে খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে মালী এ কথা শুনে দাঁতে দাঁত পেষে। বিড়বিড় করে বলে, 'হ্যাঁরে বিধবা মাগী

হ্যাঁ, আমার জন্মের আগে থেকেই তুই যে আমার পেছনে লাগবার জন্যে বসে আছিস তা আমি জানি। জ্বলুক আমার মরা ভাই, কিন্তু তোর যেখানে যে আছে সব জ্বলে-পুড়ে শেষ হোক—'

'কিন্তু এ কথা কী করে বলা যাবে, ফুলী বউদি। সেই শ্বশুর-বাড়ির ভিটেতে ঢুকে পর্যন্ত তুমি আমার জন্যে ভাবনাচিন্তা করছ। সে তো আর মিথ্যে বলতে পারব না।' বালা বলে ওঠে।

'তা ঠিকই বালা ভাই! কিন্তু তুমি কি আমার স্বভাবের কিছু জানো?' বুড়োর দিকে আঙুল তুলে বলে, 'সত্যি করে বলো দেখি, তোমার কালিয়ার প্রায় বছর দেড়েক বয়স হয়েছে, কিন্তু ওর বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে একবারও কি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'না, মিথ্যে বলব কেন? কোনো কথা বলি নি।'

'তা হলে তো হয়েই গেল। এবার তুমিই বলো, আমার কি কোনো আইবুড়ো ছেলে আছে নাকি—'

একটি স্ত্রী ঠাট্টাচ্ছলে বলে, 'তা তো রয়েছেই ফুলী-মা! শংকর ভাইয়ের ছেলে ভগা তো আইবুড়ো রয়েছে এখনো।'

ফুলী-মা কিছুটা যেন গম্ভীর হয়ে যায়, 'না না, মেয়ের বাবা-মা নিজে না বললে আমি এর মধ্যে মাথা গলাতে যাব কেন।'

'আমাদের এত ভালোবাসো তুমি!' কালুর মা বলে।

'না, রূপী, ভাব-ভালোবাসা ও-সব কিছুই নয়। আমি মালীর ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর সহ্য করতে পারছিলাম না। পরমা হয়তো মনে ভাবছিল যে বালাভাই অনুরোধ উপরোধ করতে গেলে তবে—'

'আমি মাথা কেটে ফেলতে রাজী আছি, কিন্তু ওর কাছে গিয়ে কখনো বলতুম না যে আমার কালিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করে দে।' বুড়ো বলে।

'আমি তা জানতাম, আর সেইজন্যেই— বালা ভাইয়ের ভালোর জন্যেও যে কেউ আছে তা দেখাতেই এই সম্বন্ধের ব্যবস্থা করি।'

'যে জন্যেই হোক, ব্যবস্থা তো করেছই!' সেই আগের মহিলাটি সায় দেয়।

কিন্তু বালা অন্য কথা ভাবছিল। ভগবানের লীলাখেলার রহস্যের সমাধান খুঁজছিল সে, 'হে ঠাকুর! হে ভগবান! এ তোমার কেমন লীলাখেলা! মানুষ অনিষ্ট করার চেষ্টা করলেও তুমি তার মধ্যে ইষ্ট করে দাও,' বুড়োর সমস্ত অন্তর আনন্দে ভরে যায়, 'হে প্রভু, হে ঠাকুর! কোথাকার সুতো কোথায় গিয়ে যে মেলে কে জানে।

বুড়ো বালা ঈশ্বরের মহিমা আর ফেলে-আসা অভাব-অভিযোগের সুতো মেলায়— জীবনের গতিপ্রকৃতির অনুধাবনে ডুবে যায়…ফুলী-মার কথার সমর্থনে সে বিজ্ঞের মতো সায় দেয়, 'ঠিক কথা! …হ্যাঁ ঠিক…'

॥ পাঁচ ॥

মালীর প্রেতাত্মা

শ্রাবণের চাঁদনীরাতে মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছিল, একবার জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠলে পরক্ষণে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকার শব্দ শুনে মনে হয় রাতই যেন সুর করে গান ধরেছে।

বাচ্চাদের কান্নাকাটি থেমে গেছে। গোয়ালে খুঁটিতে বাঁধা গোরু-বলদদের ঘাস দেওয়া হয়েছে। পুরুষেরা পাহারা দেবার জন্যে ভুট্টার ক্ষেতের মাচায় শুতে চলে গেছে। সারাদিন ধরে মাঠে আগাছা পরিষ্কার আর খড়কুটোর বোঝা বাড়িতে বয়ে আনতে আনতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বউয়েরাও ঘরের কাজ মিটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

কোথাও কোথাও অবশ্য জাঁতা চালানোর আর দুধ থেকে মাখন তৈরি করার মাথনী ঘোরানোর ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তা ছাড়া সমস্ত গ্রামে এখন নিস্তব্ধ নিশুতি। শুধু মাঝে মাঝে শিয়ালের কান্নার শব্দে গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠে হৈ-চৈ ফেলে দেয় কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

শহরের চৌকিদারদের মতো মাঝে মাঝে মাঠ থেকে পাহারাদারদের আওয়াজ ভেসে আসছে, 'হো…ও…ও।'

অবশ্য রাত একটু গভীর হতেই জাঁতা, মাখন তোলার মাথনী, শিয়াল আর মাঠে পাহারাদারদের ওপরে রাতের মোহময় আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের উঠোনে শুয়েছিল পরমা মোড়ল। তার হাতের হুঁকোটাও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোতে থাকে।

শুধু ফুলী-মা আর চার-পাঁচজন স্ত্রী তখনো শোয় নি। মালীও সেই থেকে উঠোনে খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনে সে কখনো দাঁড়িয়ে থাকে নি এর আগে।

কিন্তু সে কথা তখন তার খেয়াল ছিল না। তার সমস্ত অন্তরাত্মা ফুলী-মার কথা শুনে অবধি ছটফট করছিল, খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এতক্ষণ চুপ করে রয়েছে।

কালুর মা ইতিমধ্যে বলে ফেলে, 'এই তো আজই আপনারা আমার কালিয়ার পাকা দেখার তত্ত্ব এনেছেন, কাল সকালেই দেখবেন ওর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে—'

মালী লুকিয়ে থাকার কথা ভুলে যায়। থামের আড়াল থেকে যেন ভূত বেরিয়ে আসে, 'কেন রে হতভাগী আমার মুণ্ডপাত করতে বসেছিস ? কোথা থেকে অন্য কার পেটের ছেলে নিয়ে এসে খুব তো বড়াই—'

বুড়ো বালার স্ত্রী নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। 'কোথাকার অন্য কার পেটের ছেলে' কথাটা শুনে রাগে ফেটে পড়ে সে। কোলেব সামনে বাচ্চাটা খেলছিল তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়, 'আজ তোকে যদি জ্যান্ত ছেড়ে দিই তো তুই আমার মা ছিলিস বুঝব!' বলতে বলতে রণচণ্ডীর মূর্তিতে মালীর দিকে তেড়ে যায়।

মালীর মনে অনেক দিন থেকে রাগ জমা ছিল। বুড়ীকে আজ পেটবার সুযোগ পেয়ে সেও, 'চলে আয় তুই', বলে দু-পা এগিয়ে আসে।

বুড়ীর রাগকে কিন্তু সে আজ চিনতে পারে নি। বুড়ীর দিকে এগিয়ে আসতেই বুড়ী তাকে ক্ষ্যাপা পাগলীর মতো ঝাপটে ধরে। দু-হাত দিয়ে মালীর কান আর চুল চেপে ধরে তার মুখে মোষের মতো নিজের কপাল আর মাথা প্রবল বেগে ঠুকতে থাকে।

'ও মা গো···মরে গেলাম গো··· !' মালী চীৎকার করে ওঠে।

উঠোন থেকে পরমা প্যাটেল আর ভেতরের ঘর থেকে রণছোড় দৌড়ে আসে। বালা, ফুলী-মা ও অন্য সকলে তো কালুর মার সাথেসাথেই উঠে পড়েছিল।

ফুলী-মা সামনে ছিল তাই ভালো, না হলে পরমা এবং তার চেয়ে

একবারি-সরেস রণছোড় খুড়ীকে একহাত নিয়ে নিত। আর তা হলেই বাপ-বেটাকে রাগের চোটে শেষ করে দিত বালা। গাঁয়ে চলতি যে, বালা ক্ষেপে গেলে কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ফুলী-মা সিংহীর মতো গর্জন করে ওঠে, 'খবরদার, মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দেবে না।' আর প্রাণপণ চেষ্টায় গায়ের জোরে দুজনকে ছাড়িয়ে দেয়।

মালীর নাক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে থাকে, কেঁদে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে নিজের বাড়ির দিকে এগোয়। কালুর মা তখনো রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাবধান করতে থাকে, 'আর সব-কিছু বললে সহ্য করতে পারি কিন্তু আমার জাত তুলে বদনাম দিলে তার ঘাড়ে চেপে রক্ত চুষে খাব, এই বললাম কিন্তু…'

ভয়ের জন্যে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মালী রোয়াকের ধারে বসে মুখের রক্ত জল দিয়ে ধুতে ধুতে নিজের বাড়ির লোকেদের গালাগাল পাড়তে থাকে, 'আমি বলি কি তোরা তিন ছেলে শুধু চীৎকার করতে শিখিস আর মুখপোড়া মিনসে, তুই খাট থেকে উঠিস নি কখনো। বাপ রে বাপ, বাড়িতে দু-দুটো বেটাছেলে ছিল কিন্তু তারা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেই থাকল।' সে হাতের ঘটি ফেলে দিয়ে আঙুল মটকে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'তোদের সর্বনাশ হোক, ঝাড়ে বংশে উৎখাত হোক তোদের।'

পেছনের দিকের ঘরে শুয়ে রণছোড়ের স্ত্রী মনে মনে খুশি হতে থাকে। নাথার বউও উঠে কাছে যাবার কথা চিন্তা করতে করতে বিছানার মধ্যেই ডুবে থাকে। রণছোড় ফুলী-মা সাক্ষাৎ লম্বা জিভওলা মা কালী ভেবে ভয়েতে শুয়ে পড়ে। পরমা মোড়লও দুপক্ষের নাকেই গোটা দুয়েক করে গালাগাল দিয়ে শান্ত হয়ে যায়। আর বালাদের বাড়ি দেখে মনে হয় সেখানে যেন কিছুই হয় নি। ফুলী-মা খাটে শুয়ে কালুর মাকে বলে, 'বেশ, বেশ হয়েছে, আমার তো আনন্দ হচ্ছে। বুনো ওল তো ভাই বাঘা তেঁতুলের কাছেই বশ মানবে। বাঁকার সঙ্গে বাঁকা পথ না ধরলে হয় না। আজ থেকে ও যদি

তোর নামে কিছু বলে তো আমার নামে জুতো মারিস তুই।'

'কিচ্ছু হবে না খুড়ী। দুদিন বাদেই আবার যে কে সেই হয়ে যাবে। বেহায়ার কী আর লজ্জাশরম থাকে? আর আমারও পোড়া কপাল, কী যে হল আজকে যে আমিও…'

বাইরের উঠোনে শুয়ে বুড়োবালাও আপসোস করতে থাকে, 'কালিয়ার মায়ের আজকে হলটা কি? একে মুর্খোমি বলবে না তো কী বলবে? কথায় বলে যে রানীকে চটিয়ে থানায় গেলে কিংবা বন্দুকের ভয়ে ঘরের কোণে মাথা গুঁজলেও রেহাই নেই। মালীর থেকে দূরে দূরে থাকাই মঙ্গলের।' বারবার সে কেবল একই কথা ভাবতে থাকে যে, 'কখনো কিছু হয়টয় না, কিন্তু আজ ওর হঠাৎ হল কি? শুধু শুধু ঝগড়া করলে খানিকটা। ঝগড়া করা ভালো কথা নয়। গালাগাল দিলে তার মুখই নোংরা হবে। বলে বলে তো আমি হায়রান হয়ে গেছি, কে জানত যে আজ এমন ব্যাপার…'

অল্প কিছুক্ষণ বাদে তারও দুচোখ বুজে আসে। সারা মহল্লা শান্ত হয়ে যায়। মালী কেবল গালাগালি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে ফোঁপাচ্ছিল তখনো, 'তোর মা-বাপের বংশ লোপ হোক— বাপের বাড়ির ভাই মরুক…বাড়ির সবাই শত্রু হোক তোর, ওরে বাপ রে মা রে, আমি এখন কার সাহায্য খুঁজতে যাব? কার কাছে আমার দুঃখের কথা জানাব?…'

রাত ক্রমশ গভীর হয়ে আসে কিন্তু কালুর মার চোখে ঘুম আসছিল না! একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে পাশের খাটে শুয়ে থাকা ফুলী-মাকে ডাকে, 'ফুলী-মা! জেগে আছ নাকি এখনো ফুলী-মা?' তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে ফুলী-মাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে না। ভাবল, আর জেগে থাকলেই বা আমার সুবিধেটা কি, কে এখন ঐ হতভাগা মাগীকে চুপ করাতে যাবে।' ফুলী-মা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন না থাকলে হয়তো এ কথাই বলত। সে নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়, 'যতদিন বাঁচবে ততদিন নিজেও সুখী থাকবে না, অন্যকেও থাকতে দেবে না।'

ঠিক সেই সময়েই মঞ্গা খুড়ীকে বলতে শোনা যায়, 'এবার তো চুপ কর মালী। তোর তো আজ বোধ হয় ঘুম আসবে না কিন্তু অন্যদের চোখের পাতা তুটো এক করতে দিবি তো।'

মালী যেন কিছুই শুনতে পায় না, 'বাবাগো মাগো, আমাকে একলা সহায়-সম্বলহীন ছেড়ে—'

'কিসের অভাব তোর যে সহায়-সম্বলহীন বলছিস? বাঘের মতো তিনটে ছেলে রয়েছে—'

'স্বামী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন সুখের মুখ দেখলাম না…'

'তা আর পাবি কোত্থেকে? তুধের মতো সব সময় ফোঁস করে উথলে উঠছিস। একদিক থেকে দেখতে গেলে তোর মতো সুখ গাঁয়ের কারোর নেই, তেমনি আবার সারা গাঁয়ে সব থেকে বেশি তুঃখ তোর। কথায় কথায় অশান্তি আর ঝগড়া। প্রভাত হল কী না হল ওমনি তোর বাড়িতে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। কোনোদিন আর বিরাম নেই। এর থেকে বেশি তুঃখ তুনিয়ার আর কোথাও আছে নাকি?'

'খুড়ী, আমার বাড়িতে সাত-সতেরো গোত্রের লোক রয়েছে, সেখানে আমি আর কী করব।'

'কেন, কী করবি আবার? বুড়ো হতে চললি, নিজের জিভটাকে এবার একটু বশে আন।'

মঞ্গা খুড়ী এর পরে তাকে অনেক উপদেশ দেয়, 'তোর থেকে বালা শতগুণে বেশি সুখী। বুড়ো যে কথায় কথায় বলে— টাকা-পয়সা দিয়ে শরীর ভালো রাখা যায়, পেট ভরানো চলে কিন্তু মনের জন্যে শান্তি দরকার— এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কিছু নেই। তুই-ই বল-না, তোরাও যেমন পেট ভরাচ্ছিস, সেও তেমনি খেয়ে-পরে রয়েছে। না-হয় তার জামাকাপড়ে ছেঁড়াতালি তু-একটা বেশি, কিন্তু সারাদিন বুড়ো-বুড়ী কেমন মনের আনন্দে মিলেমিশে আছে। ঝগড়া গালা-গালির কথা তো ছেড়েই দে, কখনো ওদের 'তুই-তোকারি' করতে শুনেছিস?…তা হলেই দেখ; মিথ্যে মেজাজ দেখানো বন্ধ করে একটু

মানসম্ভ্রমের সঙ্গে থাক্ তো দেখি। নে চল, এখন ঘরে গিয়ে শুবি চল।'—আর মালীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে মঙ্গা খুড়ী নিজের ঘরে চলে যায়।

কিন্তু খাটে শোবার পর দেখা গেল মঙ্গা খুড়ীর অত শেখানো-পড়ানো মালীকে শান্তি দেবার বদলে যেন বেশি দুঃখিত করে তোলে, 'এই হতচ্ছাড়া লোকেরাও— ঐ বুড়োর ঘরে খাবার জোটে না, তবু ওকে আমার থেকে বেশি সুখী বলে…তা হলে ওই বুড়ো-বুড়ী এক সঙ্গে চিতেয় জ্বলে মরছে না কেন? সুখী…হুঃ, সুখী কী করে হয়? কাল বাড়িতে পাঁচজন অতিথি আসতে পাঁচ বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঘি জোগাড় করতে হয়েছে, সে আবার—'

তার অন্তরের মধ্যে কেউ যেন বলে ওঠে, 'তবুও সে তোর থেকে অনেক বেশি সুখী!'

মালী আবার বিড়বিড় করতে থাকে, 'সুখী? ওর মাথা! ফুলড়ী ডাইনী সাত-সতেরো খোশামোদ করেছে, তাই ছেলের পাকা দেখার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, আর—'

আবার ভেতরে যেন বিরোধ জেগে ওঠে, 'মিথ্যে কথা বলছিস কেন। রাত্তিরে তুই নিজেই তো ফুলী-মার মুখ থেকে শুনেছিস যে, সে তোর ওপরেই চটে আছে। তুই ফুলীকে কোনোদিন খুশি করার চেষ্টা করিস নি আর সকলকে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাস। এমন শ্বশুর বাড়ি তোর তিন ছেলের কারোর বরাতে জোটে নি, তার ওপরে এমন কাছাকাছি থেকে সম্পর্ক রেখেছে। তোর এক ছেলের কাছে-পিঠে থেকে সম্বন্ধ এসেছিল— দুনিয়ার লোকেরা অবশ্য সে-কথাই জানে। কিন্তু তোর কাছে তো কিছু লুকাছাপা নেই। তোর স্বামী আড়ালে-আবডালে তিনবার খোশামোদ করে আসার পর তবেই হয়েছে। আর এখানে বুড়ো কাউকে কোনো খোশামোদ করতে যায় নি…মানইজ্জত একেই বলে।…'

মালীর রাগ আরো বেড়ে যায়, 'তবে তো হতভাগারা নিশ্চয় মরবে। সুখী হোক আর নাই হোক আমি তো ওদের বাড়ি দুঃখ প্রকাশ

করতে যাচ্ছি না।' রাগে ফুলতে ফুলতে সে পাশ ফিরে শোয়।

কিন্তু কেউ তখনো তাকে ক্ষেপাতে থাকে, 'জানিস তো কুয়ো খুঁড়লে তাতে পড়ে মরবার ভয়ও থাকে। ভালো করে ভেবে দেখ দেখি। তোর মনে কি একটুও শান্তি আছে ? এমনি তো, গাধাও দেখলে মনে হবে, তার নিজের গানের সুরে নিজেই আনন্দে মত্ত থাকে— ওদের বাড়িতে দেশলাই জ্বেলে বেরিয়ে যাব বলছি কিন্তু, হ্যাঁ।'— সে কান্নার স্বরে বলে ওঠে।

পাশের খাটে নাথার বউ জেগে শুয়েছিল, সে আর না বলে থাকতে পারে না, 'এবার তো একটু শুতে দিন আমাদের। আপনাকে ভূতে পেল নাকি ?'

'তোর মায়ের নিকুচি—' মালী তার জিভকে সামলে নিয়ে বলে, 'চুপ করে শুয়ে থাক্ তুই। তোর আরামের দরকার থাকলে তুই কর ; আমার কোনো দরকার নেই। আমি এই বাইরে চললাম।'

কিন্তু বাইরে এসে পরমাকে গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তার ছটফটানি আরো বেড়ে যায়। রাগে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে পরমার বুকে চেপে বসে তাকে দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে, 'তা শোবে না কেন ? দুঃখ যত কিছু কেবল আমার। দুনিয়াতে একমাত্র খারাপ লোক বলতে কেবল শুধু আমি।'

রাগ আর সহ্য করতে না পেরে মালী রোয়াকের ধারের খুঁটির সামনে বসে···ভেবে কিছু উপায় বের করতে না পেরে ঠকাস ঠকাস করে মাথা ঠুকতে থাকে, 'হায় হায় আমার কি হবে রে। বউ আমাকে বলে কিনা বেরিয়ে যা, মাগী···'

পরমা মোড়ল আর রণছোড় জেগে ওঠে আর নাথার বউ একেবারে বোবা হয়ে যায়···বাইরে বেরিয়ে এসেই বলে, 'ছিঃ ছিঃ, লোকে কী বলবে।'

'লোকে বলবে যে, ও নিজে সুখে-শান্তিতে থাকার পাত্রী নয়।' বলতে বলতে পরমা প্যাটেল বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তোর কী হয়েছে সেটা তো আমাকে বল ? এই মাঝরাত্তিরে কিসের জন্যে

জেগে বসে আছিস? শালার ভূতে পেলেও তো কেউ এমনি করে না।'....

সেখানে আলো থাকলে মালীর সেই পাগলের মতো চোখের দৃষ্টি দেখে সকলকেই স্বীকার করতে হত যে সত্যিই তাকে ভূতে পেয়েছে। কেউ হয়তো চিকিৎসার জন্য দৌড়ত। একে তো অন্ধকার, তার ওপরে মালী আজ সেই সন্ধে থেকেই ঝগড়া শুরু করেছে। তাই বাড়ির লোকেরা ভাবে যে, 'হিংসেতে ও অন্ধ হয়ে গেছে,' তাই সেদিকে আর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

রণছোড় তাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। 'শুয়ে পড় মা তুই, মাথা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড় তুই।' আর মালীকে সে জোর করে লেপ-তোষক চাপা দিয়ে শুইয়ে দেয়।

বাইরেতে মালী শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু ভেতরে ঘুমের লেপে সর্বাঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করলেও সব যুক্তি-তর্কের শেষে ভূতটা যেন থেকে যায় সব-কিছুর আড়ালে; 'বাপরে বাপ। পাকা দেখা না হয় হল কিন্তু ঐ অপয়াটার বিয়ে হতে দিলে আমাকে কুকুর বলে ডাকিস যা, বুঝলি।'

॥ ছয় ॥

সাধুর কৌপীন

ছেলের পাকা দেখার ব্যাপার মিটে যাবার পর বুড়ো বালার শরীরে যেন শক্তি বেড়ে যায়। তার বলদগুলো ক্ষীণজীবী দুর্বল কিন্তু পরমা মোড়লের জোয়ান বলদ কাছে থাকলে মজাটা বুঝতে। একটা লাঙল দিয়েই সে দুটো লাঙলের মতো চাষ করে নেয়।

সত্যি বলতে গেলে ছেলের সম্বন্ধের সাথে সাথেই অন্য অনেক চিন্তা মাথায় এসে জড়ো হয়। বাড়িতে মোটে দুটো খাটিয়া। আত্মীয়স্বজন এলে বার বার কোথায় চাইতে যাবে? লেপ-তোষকও সেলাই করাতে হবে, কিন্তু হবেটা কি করে? সারা বছরে ধুতি আর শাড়ী দিয়ে চারটে ওয়ার তৈরি হতে পারে কিন্তু সে তো কাপড়গুলো অর্ধেক খসে যাবার পর বাতিল করে একধারে রেখে দিলে তবে। পরার জন্য আধ-খসা কেন, ছিঁড়ে ফালিফালি হয়ে যাওয়া কাপড়ও বালার কাছে রাখা ছিল। তা ছাড়া ঘরের চালাটাও পড়ো-পড়ো হয়ে এসেছে। দুধেল গাইগোরু না থাকলেই বা চলে কী করে? ছেলের শ্বশুরবাড়ি বেশ অবস্থাপন্ন; তাদের ওখান থেকে আসা-যাওয়া তো কেউ-না-কেউ করবেই। দু-চারটে গাই-গোরু থাকলে তবু কোনোরকমে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অবস্থাটা এমনই যে ছেলের শ্বশুরবাড়িতে খানবিশেক গোরু-মোষ চড়ে বেড়ায় কিন্তু তার এখানে একটাও নেই। গোরু-মোষ ছাড়া চাষার বাড়ির উঠোন ভালো দেখায় কখনো?···এ-সব ভাবনা-চিন্তার থেকেও বড়ো চিন্তা ছিল বলদদুটোকে নিয়ে। তারা একেবারেই বুড়ো হয়ে এসেছে···। এমনিভাবে গুনতে বসলে তো দেখা যাবে ভাবনার কোনো শেষ নেই।

একবার শীতের সময় বুড়োর ক্ষেতে কাঁচা ছোলা সেঁকে খাবার

জন্যে তারা সাত-আটজন লোক জমা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কলুর শ্বশুর গলা, ফুলী-মার ছেলে শংকর আর বেচাত ছিল।

নানা কথাবার্তার মধ্যে বুড়োর ভাবনার কথাও উঠে পড়ে, বুড়ো না বলে আর থাকতে পারে না 'আমার তো মনে হয় ভগবান আমাদের হাতে মায়ামমতার এক আশ্চর্য লেজ ধরিয়ে দিয়েছেন··· এই দেখো-না কেন, কালিয়ের জন্মের আগে পর্যন্ত আমাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। ওর বোনেরা যারা ছিল তারা যে-যার শ্বশুর-বাড়ি চলে গেল। তখন শুধু আমাদের এই দুটো পেট ভরানোরই চিন্তা ছিল। ইতিমধ্যে ভগবান আমাদের এই বুড়ো বয়সে করুণা করে ছেলের মায়ায় জড়ালেন। এখন হিসেব লাগিয়ে দেখো, একের পর এক কত ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেছে।' আর হাসতে হাসতে তার মুখের সুন্দর দাড়ি হাত দিয়ে কানের দুধারে পাকাতে পাকাতে বলে, 'এ একেবারে ঠিক সেই সাধুর কৌপীনের গল্পের মতো ব্যাপার কী।—'

'তা সেই সাধুর কৌপীনের গল্পটা আমাদের বলে শোনাও, কাকা।' বুড়োকে খোশমেজাজে দেখে শংকর বলে।

অন্য সকলেও কাসমের সঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করে, 'হ্যাঁ বালা কাকা বলো, কৌপীনের গল্পটা আজ না শুনে ছাড়ছি না।'

শীতের দিনের সকালবেলা। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো তৈরি করা মাচায় একধারে একটা খাটিয়া পাতা। খাটিয়ার নীচে তলোয়ার পড়ে রয়েছে। অন্য ধারে জমানো খড়ের গাদা। খড়ের গাদার ওপরে ধনুক ও গোটা-দশেক তীরের একটা তূণ পড়ে ছিল। মাঝখানে একটা বড়ো মালসায় গনগন করে আগুন জ্বলছিল। আগুনে ঝলসানো ছোলার শুটিগুলো আলাদা করে খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ ছোলা এক করার কাজের জন্য খাটিয়ার অর্ধেক খালি রেখে কালুর শ্বশুর গলা খাটিয়ার পায়ের দিকে বসেছিল। তিন বছর বয়সের কালু ও তার সমবয়িসী শালা গলার ছেলে কোদর মাচার সামনে খেলা করছিল। শংকর আর অন্য আর-একজন যুবক ছোলার গাছ-গুলো বেছে ঠিক করে রাখছিল। বেচাত সেঁকছিল আর বালার

হাতে সকলের হুঁকো সাজবার দায়িত্ব ছিল।

'বলুন বালাজী, লেঙ্গটের গল্পটা আমাকেও শুনতে হবে দেখছি।' গলা তার বেয়াইয়ের কাছে আগ্রহ দেখায়।

'সকলেই হয়তো আগে শুনে থাকবেন, তবু যখন শোনবার ইচ্ছে হয়েছে আপনাদের তখন বলছি ; নিন হুঁকো খান ততক্ষণ।'

'বেশ ভালো করে রসিয়ে বোলো কিন্তু বালাকাকা'— বেচাত, যার ভালো করে এখনো গোঁফের রেখা দেখা যায় নি, মাথার পাগড়ী খুলতে খুলতে বলে। সে ঘাড়ে হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নেয়, যেন কোনো কাজের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

বুড়ো বালা কেশে গলা পরিষ্কার করে শংকরের ওপর হুঁকো সাজানোর ভার দিয়ে গল্প বলতে শুরু করে :

'নীলকণ্ঠ মহাদেবেরই মন্দির হবে বোধহয়, সেখানে'···বুড়ো একটু হেসে বলে—'ঠিক আমার মতোই এক সাধু ছিল। সাধুর কথামতো তার শুধু দুটো লেঙ্গট ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা পরত আর অন্যটা কেচে শুকোতে দিত। এই ওর যা-কিছু সম্বল।

'এক পালা-পার্বণের দিন ভোরবেলা চান করতে যাবার সময় দেখে, রোজ যেখানে লেঙ্গট থাকে, সেখানে সেটা নেই। সাধু বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। মহাদেবের অবস্থাও ঠিক তারই মতো। রাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো বিগ্রহের কাপড় থেকেই এক ফালি ছিঁড়ে নিত। কিন্তু সাধুও যেমন, ঠিক তেমনিই মহাদেবের অবস্থা···সে যাই হোক, সাধু বস্তি থেকে ভিক্ষে চাইবার সময় একটা লেঙ্গটও চেয়ে নিয়ে আসে আর অন্য জায়গায় শুকোতে দেবার ব্যবস্থা করে।

'কিন্তু পরের দিন সকালে আবার লেঙ্গট খুঁজে পাওয়া গেল না। সাধু বেশ ভাবনায় পড়ে যায় ; কোন্ সম্বন্ধি বেটা এই চুরি করছে !

'তা ভাই সাধু আবার একটা লেঙ্গট চেয়ে নিয়ে আসে। এবারে সে রাত জেগে বসে থাকে : দেখা যাক কোন্ শালা চুরি করে বার-

বার। সে লাঠি হাতে ধুনির পাশে বসে জেগে থাকে। নজর তার সামনের দড়িতে শুকোতে দেওয়া লেঙ্গটের ওপরে।

'জেগে থাকতে থাকতে অর্ধেক রাত কেটে যায়। সাধুর কাছে দু-তিন ছিলিম যা তামাক গাঁজা ছিল খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু চোরের কোনো হদিশ নেই: দড়িতে লেঙ্গট তখনো ঝুলছে···। কিন্তু রাত তো ভাই কেবল ঘুমিয়েই কাটানো সম্ভব—সাধুর চোখ থেকে গাঁজার নেশা ক্রমশ কেটে যায়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে থাকে। কিন্তু হঠযোগী সাধুপুরুষ, নিজের চোখকে শাসিয়ে দেয়, শালা বন্ধ হয়েছিস কি পোড়া কাঠ গুঁজে দেব।

'ঠিক সেই সময় বাইরে রাখা কাঠগুলো নড়ানোর শব্দ হয়। চকিতে সাধু খাটিয়ার নীচে থেকে লাঠিটা টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। দরজার পাশে আড়ালে লাঠি বাগিয়ে থাকে, চোর ঢুকলেই মারবে এক ঘা। এমন জোরে লাগাব যে শালা চোরের মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব। মনে মনে ভেবে সাধুজী প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কিন্তু ভাই, চোর এই আসে···এই আসে, করে অপেক্ষা করলে কী হবে, চোর আদৌ এলে তো? সাধু ভাবে: চোর বেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, শালা আবার আসবে। আজ বেটাকে এক হাত দেখে নেব।

'এই ভেবে সাধুজী আবার ধুনির সামনে এসে বসে। তামাক ভরে নিয়ে ছিলিমে বেশ জোরে একটা টান লাগাতে যাবে কি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে যায়। দেখে যে দড়িতে লেঙ্গট নেই। হঠাৎ সাধুর ভাবনা হয়— খোদ নীলকণ্ঠ মহাদেব চুরি করছে না তো?'

শ্রোতাদের মধ্যেও দু-চারজন ছোলা সেঁকার কাজ ফেলে চোখ বড়ো বড়ো করে বালার দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে: 'মহাদেব সাধুকে পরীক্ষা করছিল হয়তো।'

শংকর আর কাসমের সঙ্গে বুড়ো হেসে ওঠে: 'না মহাদেব নয়···। তিনদিন রাত জাগার পর সাধু বুঝতে পারে যে লম্বা কানওলা মহা-

দেবের কাজ এটা।'

তবুও দু-তিনজনে কথাটা ধরতে পারে না।

'ইঁদুর মামার কাজ ভাই।' গলা অর্থ পরিষ্কার করে দেয়। সকলেই হেসে ওঠে : 'যাচ্চলে, ইঁদুরের নিকুচি করেছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, সাধুকে পরীক্ষা করার জন্য সত্যি সত্যিই মহাদেব···। আর গল্প শেষ হয়ে গেছে ভেবে বলে— 'তা হলে বালা কাকা এই হল গিয়ে তোমার লেঙ্গটের গল্প।'

'আরে এখন অনেক বাকী আছে! শেষের দিকটাই তো আসল মজা।'

'হ্যাঁ, তারপর কী হল বালা কাকা?' শংকর কথার সমর্থন করে বলে, 'সাধু তো দেখতে পেলে যে ইঁদুর মামার কাজ এটা।'

'আর ভাই সে একটা-দুটো নয়, পাঁচ-সাতটা ইঁদুরের একটা দল। সাধু ইঁদুর মারতে শুরু করে কিন্তু কত আর মারবে! লেঙ্গটিই বা কোথায় রোজ লুকিয়ে রাখে?··· সাধু বেশ ভাবনায় পড়ে যায়। লেঙ্গট বার বার কেই বা দেবে, আর চাইতেও আজকাল লজ্জা করে···

'শেষে গলাজীর মতো কোনো ভালো মানুষ উপায় বাতলে দেয় : এক কাজ করুন মহারাজ, আমার বাড়িতে বেড়ালের বাচ্চা হয়েছে মাসখানেক হল, আপনি তার একটি নিয়ে আসুন। সাধু মহারাজ খুব খুশি হয়—। আর সেই বাচ্চাটা যখন ঠিকমতো পাহারা দিতে লাগল সাধু তার ওপরে তো গদগদ হয়ে ওঠে! তাকে আদর করতে করতে বলে : তুই আমার খুব উপকার করছিস মানিক, আমার জেগে রাত কাটানো বন্ধ করেছিস তুই!

'এইভাবে সাধু মহারাজের মস্ত বড়ো একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়। কেবল বেড়াল ছানাটার জন্য এখন তাকে একঘর বেশি ভিক্ষে চাইতে যেতে হত।'

গলা ছোলার বাটি দেখিয়ে বলে : 'নিন সেদ্ধ ছোলা খেতে খেতে বলুন।'

শংকর বলে ওঠে, 'ছোলা খেতে থাকলে গল্প হবে কী করে ?' আর হেসে বলে, 'দু-এক মুঠো বেশি পাওয়া যেতে পারে ভেবেই আমি এই গল্প শুরু করিয়েছি—'

কিন্তু বুড়ো বালা শংকরের মতন দশটাকে পকেটে পুরে রাখতে পারে ! বলে, 'তুই কিছুই জানিস না তা হলে। তোর থেকে আমি চল্লিশ বছর বেশি ঘটির জল খেয়েছি বুঝলি। তুই ভেবেছিস যে একমুঠো বেশি পাবি কিন্তু আমি অন্য কারণে গল্প শুরু করেছি। আমার একটাও দাঁত নেই। তোরা সকলে আমার সামনে ছোলা সেদ্ধ খাবি আর তা দেখে আমার মুখে জল এসে যাবে ভেবে মনে করলাম ঠিক আছে গল্পই হোক—'

'হুঁ— !' শংকরকে জব্দ হতে দেখে বেচাত ও অন্য দু-চার জন খুশি হয়। কেউ মাথা নেড়ে বলে, 'ও ! তা হলে এই ব্যাপার', কেউ আবার বলে দেয় : 'আর আমরা ভাবতুম বালা কাকা হাবাগোবা মানুষ।'

'তা হাঁ, সাধু তো বেড়াল ছানার ওপর খুব খুশি হল, তারপর— ?' শংকর গল্পের খেই ধরাতে বলে।

'ক্রমশ তার ওপরে মায়া পড়ে যায় বলেই বেশি খুশি হতে থাকে, কিন্তু বেড়ালটার— তখনো নিতান্ত বাচ্চা সেটা— মা দরকার ছিল। সাধু তো সে ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। সারাদিন সে বেচারা মহাদেবের ঐ ছোটো মন্দিরের পেছনে 'ম্যাঁও' 'ম্যাঁও' করে ঘুরে বেড়ায়।

'সাধু আবার ভাবনায় পড়ে যায় : ম্যাঁও ম্যাঁও করতে করতেই শালা দেখছি মরে যাবে। আর ইঁদুরগুলো আবার আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে— তা হলে কী করা যায় এখন ? বেটা দেখছি বেশ রোগাও হয়ে গেছে।

'সাধু যেখানেই যেত ঐ বেড়ালের গল্প করত আর প্রত্যেককেই একবার জিজ্ঞেস করত, 'বেটার জন্যে কী করা যায় বল তো ?'

'তোমার আমার মতোই কেউ হয়তো সাধুকে উপদেশ দেয় : মহারাজ একটা গোরু রাখার ব্যবস্থা করুন। দুধ না খেলে বাচ্চাটা

মরে যাবে।

'তারপর ভাই, গোরু দান করার মতো একজন ভগবৎ-প্রেমী লোক পাওয়া গেল। এক ব্রাহ্মণকে গোরুটা দক্ষিণা দেওয়া হয় কিন্তু পরে দেখা যায় গোরুটা খুবই বজ্জাত। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ আর সাধু তো প্রায় একই হল, এই চিন্তা করে সে সাধুকে গোরুটা দিয়ে দেয়: নিয়ে যান মহারাজ! আজ দিনটাও ভালো, আজই নিয়ে যান।'

'যাঃ বাবা, সাধু তো ঝামেলা বেশ বাড়িয়ে চলেছে ভাই।' বেচাত না বলে থাকতে পারে না।

'এখনই বাড়ল কোথায়? এবার তো—' কিন্তু খেয়াল হতেই চুপ করে গিয়ে সায় দিয়ে বলে: 'হ্যাঁ, গোরু নিয়ে সাধু মহারাজ মন্দিরের রাস্তা ধরল, তারপর…'

বুড়ো তার মাথার প্রায় উঠে যাওয়া চুলে হাত বোলাতে থাকে। তার মাথার সামনের দিকটাতে চুল খুবই কম, তবে ঘাড়ের কাছে লম্বা চুলের কিছু গোছা ছিল। টিকিটা প্রায় হাত খানেক লম্বা একটা বিনুনীর মতো। টিকির গোছটা কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের সামনে এনে বলে, 'তারপর তো ভাই সাধুর কাজকর্ম খুব বেড়ে গেল। চার-ধারের মাঠে-ঘাটে ঘাস থাকলেও রাত্তিরে খুঁটিতে বাঁধার পরেও ঘাস দিতে হত! সাধু কামারের ঘর থেকে একটা বাঁকাচোরা কাস্তে চেয়ে নিয়ে আসে। অন্যদের কারোর কাছে দড়ি কারোর কাছে ডাবর ইত্যাদির জন্যে খোশামোদ করে আসে। গোরুর জাবের জন্যে মাঠের থেকে খড়কুটো কেটে জড়ো করে রাখে…

'এইভাবে মাস দুয়েকের মধ্যেই বাবাজীর নাকের দম বেরিয়ে যায়। বেড়াল রানী তো দুধ খেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে ওঠে। সাধুজীর সঙ্গে বেশ ভাব ভালোবাসা হয় কিন্তু বাবাজীর হাড় পাঁজর দেখা যেতে থাকে। সে ভাবনায় পড়ে যায়: শালার এ ঝঞ্ঝাটের এখন কী হবে? গোরুটাকে তাড়ালে দুধ না পেয়ে বেড়ালটা মরে যাবে আর বেড়াল মরলে আবার সেই রাত্রি জাগার ঝামেলা মাথায় এসে পড়ে!

'বাবাজী তো রীতিমতো ফেঁসে গেছে দেখছি, ভাই !'— কাসম বলে।

বুড়ো গভীর নিশ্বাস টেনে বলে, 'ভাবতে ভাবতেই সাধু কয়েকদিন কাটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে আমাদের মতোই কেউ ধারেকাছে লাঙলের জন্যে কাঠ কেটে আনতে গিয়ে হয়তো তামাক খেতে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে থাকবে। বাবাজী গোবর পরিষ্কার করতে করতে তার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে থাকে—সারাদিন তো এই-সব ঝুট-ঝামেলাতেই কেটে যায় আমার। মহাদেবের সেবা-যত্নই এখন ঠিকমতো করে উঠতে পারি না আজকাল, তো ধ্যান-ভজনের কথা আর বলি কী করে !—

'সে বলে ওঠে, এক কাজ করুন-না কেন মহারাজ, ওই টিলার ওপরে ভীলেদের বস্তি রয়েছে, ওখান থেকে কাউকে কাজ করার জন্যে ডেকে নিন-না ! সে এক বোঝা ঘাস সকালে নিয়ে আসবে আর গোয়াল-গোরু পরিষ্কার করে দেবে। একটা করে রুটি দিয়ে দেবেন, খুশি হয়ে রাজী হবে।

'আনন্দের চোটে বাবাজীর দাড়ি গোঁফ এক ইঞ্চি যেন বেড়ে যায়, আরে একটা কেন দুটো রুটি দিতে রাজী আছি কিন্তু এমন কাউকে কাজ করতে পাওয়া সম্ভব হবে কী ? গোরু আর বেড়ালের জন্যে দুটো রুটি তো করতেই হয় তার সঙ্গে নাহয় আর দু-একটা করে নেব।

'বাবাজী চলতি রীতি মতো তাকে আশীর্বাদ করে, 'জয় মহারাজ সীতারাম তা হলে—'

'বেটা, তোর ঘরেতেই বরাবর রাত্তির কাটাবে !' বেচাতের সঙ্গে দু-চারজন বলে ওঠে।

'বাবাজী তার পেছনেই লেগে পড়ে, তুই যখন এসেইছিস বেটা আজ এদিকে আমার জন্যে এটুকু কাজ করে যা তুই। একটা কাউকে এখানে কাজে লাগিয়ে দিয়ে যা। দে তোর কুড়ুল আমাকে দে, আমি তোর কাঠ কেটে আনছি, তুই আমার দিকটা দেখতে যা।'

'কিন্তু ভাই ! সে হয়তো আমাদের এই গলাজীর মতোই নেহাত ভালোমানুষ হবে তাই বলে ওঠে, আমি আমার আর আপনার দুটো কাজই একসঙ্গে করে আসছি। ঐ দিকেই যাচ্ছি আমি।— এই বলে সে উঠে পড়ে।

'বেটা, আজ তুই এখানেই রুটি খেয়ে যাস।' মহারাজ তাকে নেমন্তন্ন করে।

'কিন্তু আমাদের গলাজী যেখানে-সেখানে খেয়ে তো আর জাত হারাতে পারে না। কে জানে সাধু কোন্ জাতের লোক। তা ছাড়া তার কাছে খাবার রাখা ছিল। 'আমার জলখাবার এই বাঁধা রয়েছে' বলে সেই ভালোমানুষ লোকটি কাঁধে কুড়ুল্ তুলে বস্তির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

'কিন্তু সাধুর আর তর সইছিল না, সে বলতে থাকে, বেটা, মহাদেব তোর মঙ্গল করবেন। দুটো কেন তিনটে রুটিই দেব— কিন্তু অবশ্যই কাউকে—'

'কোনো একটা শিষ্যা জোগাড় করে আনিস !' শংকর কথাটা শেষ করে দেয়।

'আরে ভাই সাধু তো বেশ গণ্ডগোল বাধালে দেখছি।' বেচাত বলে ওঠে।

'তা গণ্ডগোলের ব্যাপারই বটে', হাসতে হাসতে বালা বলে, 'সেই লোকটা এক বউকে ধরে নিয়ে আসে। তার কোলে একটা বাচ্চা আর হাতের আঙুল ধরে দুটো।

'মাথার থেকে দু'মন কাঠের বোঝা নীচে ফেলে সে বলে, এই নিন মহারাজ, এই গরিব বউটাকে নিয়ে এলাম। এই তিনটে বাচ্চা রেখে এর স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছে। বেচারা বড়োই গরিব। দুটো করে রুটি দিয়ে দেবেন, এ আপনার গোয়ালের গোবর তোলা, জল আনা, ঘাস কেটে নিয়ে আসা— সব কাজ করে দিয়ে যাবে।'

'এরপরে সে মেয়েছেলেটিকে বলে, দেখিস মহারাজের যেন কোনো কষ্ট না হয়, মহারাজ তোর ছেলেদের খাওয়াপরার ভাবনা রাখবে

না।...সে উঠে পড়ে, নিন এবার আপনারা আপনাদের কাজকর্ম বুঝে নিন আমি চললাম, এই বলে সে ছিলিম খালি করে কাঠের বোঝা মাথায় উঠিয়ে বাবাজী আর মেয়েছেলেটাকে রেখে রওনা হয়ে যায়।

'আ-হা-হা!' বেচাত হাততালি দিয়ে উঠে বসে। 'সাধু তো পুরোপুরি ফেঁসে গেল ভাই' অন্য আর একজন বলে।

তারা কয়েকজন পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলে, 'বেটা আমার ব্যাপার বেশ জমিয়ে তুলেছে দেখছি।'

'তা আর বলতে ভাই!' বালা গল্প আবার শুরু করে, সেই নির্জনে আগুন আর মদ একসাথে হলে আর বাকী রইল কী?'

'তার ওপরে সময়টা আবার বর্ষাকাল। শুকনো গাছেও নতুন পাতা আসে আর এ তো'— বুড়ো বালা কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, 'বেচারী শিষ্যা রোজ খানা-ডোবা পেরিয়ে কি করেই বা বস্তি থেকে মন্দিরে আসা-যাওয়া করে!'

'শিষ্যাটি মন্দিরেতেই আস্তানা পাতল আর কী।' শংকর ব্যাপারটা খোলসা করে বলে।

আর বালা গল্পের শেষ টানতে বলে, 'মাস দশেক বাদে একদিন বাবাজীর চোখ খুলে যায় আর মাসখানেক বাদে'— মন্দিরের পিছনের দিকের চাতালে তৈরি করা ছোটো ঘর থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনে বাবাজীর কানের পর্দাও খুলে যায়, হায়রে হায়, এ আমি কী ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে গেলুম রে বাবা? কে আর এখন আমাকে এখানে ভিক্ষে দেবে? এবার তো নিজেকেই রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি! আর তার জন্যে বলদ চাই, বলদের জন্যে ডাবর, জাব হাল লাঙল চাষের জমি সার, বীজ—

'এই-সব চিন্তা করতে করতে সাধুর মাথা একেবারে ঘুরে যায়, এ-সমস্ত গণ্ডগোলের গোড়া শালার এই—

'সাধু হঠাৎ সেই আট ইঞ্চি কাপড়ের টুকরো টেনে খুলে ফেলে। সামনের ধুনির আগুনে ফেলে চিমটে লোটা নিয়ে ঐ ঘন জঙ্গলের দিকে পা বাড়ায়।'

'চলো দেখি সবাই ঐ পাহাড়ের ওপরে।' সকলেই একসাথে বলে ওঠে।

হাতে হুঁকো নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বুড়ো বলে, 'কিন্তু আমরা তো আর সাধু নই ; এইজন্যেই শাস্ত্রে সাধুর চেয়ে সংসারীকে বড়ো বলে স্বীকার করেছে !'

গলাজী বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে তো সবাই হাত পাততে আসে, কিন্তু আমরা শুধু বরুণদেব ছাড়া—'

বেচাত প্রভৃতি অন্য সকলের মন তখনো সেই গল্পের রসেতে ডুবে ছিল। তাদের কানে তখনো মন্দিরের পেছনের ছোটো ঘরে নবজাত শিশুর কান্নার শব্দ বাজছিল। তাই বেচাত প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা বালা কাকা, সেই বউ আর বাচ্চাটার কী হল—'

শংকর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলে, 'যা হবার তাই হয়েছে, এখন খাবে তো চলো তা হলে।'

মাচার ওপরে সাত-আটটি বলিষ্ঠ চেহারা উঠে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের হাতিয়ার আর পরণের কাপড় ঠিক করে নেয়। গলা বাইরে এসে বটগাছের নীচে ছেলেরা খেলছিল তাদের ডাক দেয় আর বালা মাথায় পাগড়ি আঁটতে আঁটতে বলে, 'তোরা জানিস কি ? সাধু নিশ্চয়ই জাতে বণ্ডি বামুন ছিল— তা ছাড়া অন্য কোনো জাতের হলে পালাতই না। কেননা চাষারা দুঃখের দিন ভালো ভাবেই কাটাতে পারে। সাধুর মতো যদি ভাই তারাও পালাত তা হলে তো এই পৃথিবী শেষ হয়ে যেত !··· আর পালাতে যাবেই-বা কে ? সাধু চলে যেতেই সে বুঝতে পেরে যায় যে এভাবে খাটে পড়ে থাকলে দিন কাটবে না, তাই সে উঠে পড়ে। শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে সে গট্‌গট্‌ করে ঐ পাহাড়ে গিয়ে ওঠে—'

বুড়ো মাচার থেকে নেমে এসে নদীর ওপারে পাহাড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নিজের মনে সে বলে ওঠে, 'তোমরা সকলে দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ; কে থালি নিয়ে বসে গঁদ বাছছে।'

তিন বছরের কালু এসে তার স্বপ্নের ঘোর ভেঙে দেয়। ছেলেকে সে ফুলের মতো সযত্নে নিজের মজবুত বলিষ্ঠ শরীরে তুলে নেয়—কাঁধে বসিয়ে শংকর প্রভৃতি সকলের দিকে চেয়ে বলে, 'এই হল সংসারের কাহিনী।' পা বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'দুঃখের দিন যে পরিশ্রম করে কাটাবে বেচারা সাধুর সে ক্ষমতা কোথায়? সে তো কেবল ভগবান এই চাষাদেরই দিয়েছেন···এই যে আমার এত···আরে, আমাদের সকলেরই দুঃখ-কষ্ট রয়েছে কিন্তু দেখে নিয়ো একটার পর একটাকে আনন্দের সঙ্গেই জয় করে নেব। কী বল মানিক আমার?' বুড়ো কালুর দিকে তাকিয়ে বলে।

আর কালুও, 'হুঁ, জয় করে নেব, হুঁ···'বলতে থাকে। তার গলার স্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

॥ সাত ॥

কাকার কোলেতে

এর পরের দিনগুলো কালুর স্বপ্নের মতো স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। তারা-ভরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে, যেন স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে কোনো বিরাট পাথর সরিয়ে অতীতকে স্মরণ করছে। তার সরল সাদাসিধে অল্প-বয়িসী শ্বশুর গলা বুনো নীলগাইয়ের চেয়ে ছোটো নতুন ছুটো বলদ এনেছে! গাড়িতে বোঝাই করে রাখা কিছু যেন নামাতে থাকে। বছর চারেকের সে নিজে কোদর আর ছোট্ট রাজু পাথরের টুকরো দিয়ে ঘর তৈরি করার খেলা খেলত···

ছুটো অবাধ্য ষাঁড়কে তার বুড়ো বাবা ছোটো গাড়িটায় জুতে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে বশে আনার চেষ্টা করছে। সে নিজে আর রাজুও তার পেছনে পেছনে যেত···ষাঁড় ছুটো কখনো ঘাবরে যেত; তার বাবা বিরক্ত হয়ে কালু আর রাজুকে চীৎকার করে গাল পাড়ত, 'আরে ছোকড়া, বাড়ির বাগানে চলে যা, এ এখুনি মেরে ফেলবে; হতভাগারা রাস্তা ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়া।' আর সেই ছোটো গাড়িটার চলার ঘড়ঘড় আওয়াজ, ছুটন্ত ষাঁড়ের পায়ের খুরের শব্দ, তার বাবার সেই চীৎকার আজও সব-কিছুই যেন তার কানে ধ্বনিত হতে থাকে।···'কি সুন্দর সেই দিনগুলো—এই গাঁয়ের চতুর্দিকে কেমন সবুজের সমারোহ ছিল—

মুখে তেল ভরে নিয়ে কোনো সাঁতারু কুয়োর জলের তলায় গিয়ে তেলটা ফু করে ছেড়ে দিলে যেমন সমস্ত জলটাই চকচক করে ওঠে, তলায় পড়ে থাকা তামা-পেতলের ঘড়া কিংবা মাটির কলসী ইত্যাদির সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে বালি পাথরের টুকরো ঝিকমিকিয়ে ওঠে, কালুর চোখে গত চার দশক— ছাপান্নর দুর্ভিক্ষের আগের বিশ বছর থেকে নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত সব ঘটনা জেগে ওঠে।

নিজে সে আজ যে ক্ষেতে বসে রয়েছে— এই মাচা আজ যেখানে, কিছুকাল আগেও সেখানে একটা বিরাট মাকড়সার জাল ছিল। ওখানে ওদিকে জীর্ণ বটগাছের এক-চতুর্থাংশ শুকিয়ে ঘুণ ধরে গেছে। যেখানে কুয়ো খুঁড়েছে ওখানে গভীর খাদ ছিল আরন দীর তীর —এখন তো সব সমান হয়ে গেছে। কিন্তু সে সময়ে ভর-দুপুরেও সেখানে যায় এমন সাহস কারো ছিল না।···

একটা গভীর শ্বাস নিয়ে কালু তামাক বার করার জন্যে পাশে রাখা পাঁচ-বোতাম-ওয়ালা গলাবন্ধ কোটটা হাতে তুলে নেয়। কে জানে কেন আবার তার মন অতীতের অলিগলিতে ঘুরপাক খেতে থাকে—'এই জামা-কাপড়েরই কত পরিবর্তন হয়ে গেল, সে সময়ে প্রায় সকলেই গয়লাদের মতো কোমড়ের কাছে কুঁচি দেওয়া ছোটো-ছোটো মাপের জামা, ছোটো বহরের ধুতি পরত আর বয়স্করা মাথায় পাগড়ি বাঁধত! আর আজ আমার চেয়ে বুড়োদের কাছেও পাঁচ-বোতামওলা গলাবন্ধ কোট আর মাথায় শামলা আছে।'···হুঁকোটা হাতে নিয়ে সেটার দিকেই চেয়ে থাকে, 'আরে এই হুঁকোটাকেই দেখো-না, যত নতুন দিন আসছে এর চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, ক্রমশ দেখতে সুন্দর হচ্ছে।···কিন্তু এই সুন্দর চেহারা কোনো কাজেরই নয়। বছর পাঁচেকের মধ্যেই ফেটে যায়, বদরী হুঁকোতে পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। আর সে সময়ের বদরী হুঁকো এমন ভারী হত যে আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কব্জীতে ব্যথা ধরে যাবে।···

'এখন লোকেদের কাজের শক্তি কমে গেছে আর ছল-চাতুরী বেড়ে গেছে। এই তো আমার বাবা-কাকার মধ্যে কত প্রচণ্ড রেষারেষি শত্রুতা ছিল তবুও—'

হুঁকো খেতে খেতে কালু সেদিনকার অবস্থার কথা ভাবতে থাকে: ঘরের মাঝখানে খাটিয়ায় বালা মৃত্যু-শয্যায় পড়ে রয়েছে। এ গাঁয়ের সব আত্মীয়-স্বজনে সেই ছোটো ঘর উঠোন দালান সব ভরে গেছে। সাত বছরের কালু ছুটোছুটি দুষ্টুমি ছেড়ে দিয়ে খাটের পাশে খুঁটির ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।···

কিছুক্ষণ আগে অবধি, বুড়ো বালার বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ সে কলকলিয়ে ওঠে। চোখ মেলে ইশারায় জল খেতে চায়। যেন সবে ঘুম থেকে উঠেছে এইভাবে চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে চোখের দৃষ্টি কালুর ওপর পড়ে। কিছুক্ষণ যেন সে দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে। আবার ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে কথা বলে ওঠে, মনে হয় যেন দূর পাতাল থেকে শব্দ আসছে, 'ভাই আমার, আমার ছোটো ভাই পরমা!'

পরমা খাটিয়ার বাজুতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এই যে দাদা', সামনে এসে খাটিয়ার ওপর হাতের ভর দিয়ে চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে বলে, 'এই যে এখানে দাদা'—

'ভাই!' বুড়োর চোখ থেকে জলের ধারা বইতে থাকে। সে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে বলে, 'ভাই আমার, এই ছেলেটাকে কার হাতে দিয়ে যাই? এর শ্বশুর গলাজী তো আমার আগেই চলে গেছে। তুই ছাড়া তো এর এখন আর কে রইল?'

বাবার এমন ধরা ধরা গলার কথা শুনে কালু কিছু না বুঝেই কেঁদে ফেলে। মা তাকে খাটের পাশে ডেকে নিয়ে কোলে নেয়।

পরমাকে দেখে মনে হয় সেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ভাইকে কী জবাব দেবে? ভরসা দেবার আন্তরিক ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু লজ্জা ও সংকোচ তাকে পেয়ে বসে, 'কী ভাববে সবাই?'…যতই সে বড়ো ভাইয়ের দিকে তাকাতে থাকে ততই তার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। কান্নাধরা গলায় সে বলে, 'দাদা, তুই বলতিস যে, একটা কোলেতে ঝুলিয়ে যেতে পারে কিন্তু এতবড়ো পৃথিবীতে জায়গা হয় না। কথাটা একেবারে ঠিক।' পরমার চোখে অথৈ জল এসে জমা হয়; চোয়াল ছাপিয়ে সে জল অঝোরে ঝরতে থাকে।

বাবা কালুকে নিজের কাছে ডাকে। ছেলের কান্না থামানোর, তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু তখন নিজের চোখের জল মোছার মতো ক্ষমতাই ছিল না, তাই…

গলা পরিষ্কার করতে করতে সে বলে, 'খোকা! তোর কাকাকে

তুই "কাকা" বলে ডাকলে তবেই আমার আত্মা শান্তি পেতে পারে।'

কালু এর আগে পরমাকে কখনো 'কাকা' বলে ডাকে নি। কখনো তার দরকারও পড়ে নি। দরকার পড়বেই বা কী করে? সে ক্বচিৎ কখনো পরমার বাড়িতে গেছে। যাবেই বা কী করে? মালীর গোমরা মুখ আর হিংসেতে জ্বলে যাওয়া চোখের দৃষ্টির জন্যে সে কখনো ওদের উঠোনে পা দিতে সাহস করে নি। রণছোড় আর নানাও ওর ওপর বিরক্ত হয়ে কথা বলত। কেবল ও-বাড়ির মেজ ছেলে নাথা ওকে ডেকে আদর করে কথা বলত কিন্তু তার মতামতের কোনো মুল্য ছিল না বাড়িতে। এই কারণেই কালুর সঙ্গে কাকার বাড়ির কোনো আন্তরিক টান গড়ে ওঠে নি। কখনো কোনো প্রয়োজনে পরমাকে ডাকবার দরকার হলে 'আপনি' বলে সেরে নিয়েছে।

'বল খোকা!···এ তোর কাকা হয়।·· আমরা দুজনে এক মায়ের পেটের ভাই। বল, 'কাকা' বল খোকা, তবেই··· ।'

এরপরে তার মাও তাকে বোঝাতে থাকে···

কেবল পরমা বলে, 'ও না বললেই বা কী, আমার কাকা হতে তাতে আটকাচ্ছে কোথায়।' কালুকে সে কোলে নেবার চেষ্টা করে। সে ভাইকে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

কিন্তু ততক্ষণে কালুর আপত্তি দূর হয়ে যায়। নিজের আড়ষ্ট জিবকে যেন জোর করে উঠিয়ে 'কাকা' বলে ডেকে পরমার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পরমা খুশির আবেগে তাকে কোলে তুলে নেয়।

এই আনন্দমধুর দৃশ্য দেখতে দেখতে বালা বলে ওঠে: 'ও 'কাকা' বলতে না বলতেই তুই ওকে কোলে তুলে···'

কথা শেষ করার আগেই বুড়ো বালার দুর্বল ঘাড় একপাশে হেলে পড়ে, কিন্তু তার সুন্দর সেই গোঁফ-দাড়িতে একটা পরম তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে।

নাথা এবং অন্য আত্মীয়স্বজনেরা যারা বৃদ্ধের মৃতদেহ নীচে

নামানোর জন্যে এগিয়ে আসে তাদের মনেও আজকের এই কাকা-ভাইপোর মিলন-আনন্দের মধুর রেশ।—

এই দৃশ্য যদি কারো পছন্দ না হয়ে থাকে, যদি বিষের মতো লেগে থাকে তা হলে তা ঐ নিজের বাড়ির রোয়াকে বসে থাকা মালীর; আর এখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে রণছোড়ের থেকেও পনেরো বছর বয়িসী নানার মুখ ভার হয়ে ওঠে।

চারদিন বাদে বালক কালু তার কাকা, পিসেমশাই ও শংকরের সঙ্গে বেনের দোকান থেকে বাবার শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কিনে আনে আর সমাজের সকলকে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে আসে। যেদিন সমাজের প্রায় শ'-পাঁচেক লোক খেতে ব্যস্ত, মালী সেদিন পরমাকে খুব একচোট নিতে থাকে : 'খুব তো ভাইপোর জামিনদার হিসেবে দাঁড়িয়ে তুই তোর ভাইয়ের শ্রাদ্ধ ঘটা করে করছিস কিন্তু ঐ অপয়াটাকে পাশে পাশে রাখলে আমার তিনটে ছেলের ভাগে কম পড়ে যাবে কিনা বল!'—

পরমা অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করে। 'আমি জামিনের কোনো দায়-দায়িত্ব নিই নি, বেনের হিসেবের খাতায় আমার নাম বেরোলে তবে তুই বলিস—'

কিন্তু মালী একেবারে ফেটে পড়ে: 'তা হলে তোকে ওর সঙ্গে যেতে হয়েছিল কেন? ভাইয়ের জন্য দরদ একেবারে উথলে উঠছিল যে! মুখোমুখি একসারিতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে সমাজের সকলে মুখে হালুয়ার গরস তুলতে তুলতে বলাবলি করে, 'কী সাংঘাতিক বউ রে বাবা।' কেউ কেউ টিপ্পনী কাটে, 'বউয়ের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে এলে বউয়ের দুটো গালিগালাজও খেতে হয় ভাই!'

অবশ্য পরমা মোড়লকে করুণা করার মতো লোকও সেখানে ছিল। তারা বলাবলি করতে থাকে, 'ঘরেতে এমন কালনাগিনী থাকা সত্ত্বেও ভাই শ্রাদ্ধের আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখে নি মোড়ল। ঐ যে কথায় বলে না, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে চুলকে দুভাগে আলাদা করা সম্ভব নয়, সেটা মিথ্যে নয়—'

আর বালার বয়িসী বুড়োরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মনে মনে কামনা করতে থাকে—'ভাই হলে যেন এমনি ভাইই হয়, যাতে পরকালেরও সদ্গতি হয়।'

॥ আট ॥

ধরিত্রীর বীজ

সাত-আট বছরের কালু তখনো ভালো করে ধুতি পরতে শেখে নি কিন্তু তাকে বলদ চড়ানো শিখতে হল। মায়ের কষ্ট এবং চোখের জলের মানে সে অনুভব করতে পারে!

কাকা তাকে কোলেতে আশ্রয় দিয়েছিল বটে কিন্তু কীই-বা করতে পারে সে? প্রায় বছর দশেক সে নিজে লাঙ্গলে হাত দেয় নি—দেবার দরকারও ছিল না! ছেলেরা সব বড়ো হয়ে গিয়েছে তা ছাড়া কাজের চাপ বেশি থাকলে দু-একটা লাঙ্গল চালাবার জন্য ঠিকে-মজুর লাগিয়ে নিত। তাই এই বয়সে ক্ষেতেতে বৃষ্টির আনন্দ উপভোগ কিংবা ভাদ্রের কাঠফাটা রোদ সহ্য করা অসুবিধে হত। তবুও কিছুটা অসুবিধে সহ্য করার চেষ্টা করত কিন্তু তাতে আবার বাড়িতে রাগারাগি ঝগড়া লেগে যেত।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থাও হয়েছে কখনো কখনো।

তবুও পরমা বড়ো ছেলে রণছোড়কে বোঝাবার চেষ্টা করত, যাই হোক-না কেন তোর ভাই হয়, আপন জ্যাঠার ছেলে! তুই এর কষ্ট না দেখলে আর কে দেখবে! আর দুনিয়ার লোক বলবেই বা কী? বিপদে-আপদে একে অন্যকে দেখবে শুনবে বলেই না মানুষে বড়ো পরিবারের মধ্যে থাকতে চায়।

এমনিতে রণছোড়ের কালুর ওপর কিছুটা দয়া-মায়া হয় বটে কিন্তু বাড়িতে তার মতামতই বা চলে কোথায়? ডাকসাইটে মায়ের ইচ্ছে না হলে কেউ বাড়িতে জল পর্যন্ত খেতে সাহস করে না। সে ক্ষেত্রে কালুকে সাহায্য করার হিম্মত করবে কে?

আর মালী তো পরিষ্কার ভাবে শুনিয়ে দিয়েছিল সকলকে, 'কেউ

যদি কখনো ঐ অপয়াটাকে সাহায্য করে, তা সে যদি কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরতে যায় তাতেও যদি কেউ বাধা দেয় তো সে আমার ছেলে নয়, আমিও তার মা হতে চাই না। আর বাড়িতে এই যে সকলের নবাবী চলছে তা কার জন্যে জানো তো? তোমাদের এই ভিখিরী বাপের দু-ফালি জমি জিরেৎ। এই বাড়ি পর্যন্ত আমি আমার বাপের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারের টাকা থেকে তৈরি করেছি', আরো সে শুনিয়ে দেয়, 'বেশি গোলমাল করলে পরণের কাপড় পর্যন্ত খুলে নেব, মনে থাকে যেন হ্যাঁ।...'

আসলে ভেতরে ভেতরে মালীর মনোবাঞ্ছা ছিল যে নিরুপায় হয়ে হাতে পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করতে এলে সাহায্য করার। সেই ইচ্ছেটা সে নিজের গায়ে পড়ে উপকার করতে যাওয়া স্বামীকে শুনিয়ে দেয়, 'যদি ওই অপয়াটার মা আমার বাড়িতে এসে তার ছেলেকে সাহায্য করার বদলে কাজ করে যায়, ঘর ঝাড়পোঁছ করতে রাজী থাকে তবেই'...

আর মালী সেই দিনের পথ চেয়ে বসে থাকে, নিজের মনেই সেই কথা ভাবতে ভাবতে তোবড়ানো গাল হাসিতে ভরে যায়।

'করবে না তো যাবে কোথায়? বুড়ী মানুষ— অথর্ব হলে নিজের ঘরের কাজকর্ম করে কী করে... ছেলের ঠিকুজিকুষ্টি বানানো হয়েছিল— উঠোনে ঘোড়া বাঁধা থাকবে আর গাঁয়ের মোড়ল না হয়েও মোড়লেরই কাজ করবে— ঠিক আছে! তা ওর ছেলে যেদিন মোড়লী করে করুক এখন যদি-না ওর ছেলেকে দিয়ে বলদ না হাঁকাই তো দুনিয়া আমাকে চিনলো কী!'

কিন্তু মালী জানত না যে জগতে কখনো কারো জন্যে কারো কিছু আটকে থাকে না আর থাকবেও না।

এক সময় দেখে যে কালুদের জমির সার মাঠে পৌঁছে গেছে। জ্বালানী কাঠ উঠোনে জমা করা হয়ে গেছে। ঘর-দোরের ব্যাপারে তো বছর দশেক ভাবনা করার কিছু ছিল না। কালুর শ্বশুর বেঁচে থাকতে থাকতেই নিজে দেখাশোনা করে তা সারিয়ে দিয়েছিল।

কেবল ঘরের চালাটা ফেরানোর দরকার ছিল তা সেটা শংকর, মাওজী আর কাসম ঘাঁচি (তেলী) প্রভৃতি সকলে মিলে ঠিক করে দেয়।

'কিন্তু মিছিমিছি এত সব জোগাড়-যন্ত্র করা হচ্ছে,' কাকা পরমার তো তাই মনে হয়। সে ভাবে যে বউদিকে, কালুর মাকে বলবে সে যেন নিজে এসে একবার তার জায়ের কাছে সাহায্য চায়—কিন্তু পরমা সাহস করে উঠতে পারে না। নিজের বউয়ের মেজাজ দেখে সে ঠিক করে, 'এর থেকে যে গাঁয়ের লোকেরা দেখাশোনা করছে, সেই ভালো' আর তার বউদির মতো ধরতে গেলে, 'ও মাগী একেবারে হাড়-বজ্জাত।'

তবুও বুড়ো শংকরকে দিয়ে কথাটা একবার পাড়িয়েছিল। তবে নিজে যা ভেবেছিল ঠিক তাই শুনতে পায়, 'আমার ছেলের যদি অমঙ্গল চাস তো তবে আমাকে জায়ের কাছে সাহায্য চাইতে পাঠাস তোরা। তোর মনে নেই শংকর তোর কাকা কী বলত? পোড়া কাঠের ছ্যাঁকা অনেক ভালো কারণ তার ঘা একদিন শুকোবেই কিন্তু বাক্যি-বাণের ঘা মরলে তবে সারে। ও-সব কথার নাম উচ্চারণ করিস না আর—'

ছেলের মুখে রূপার এই কথা শুনে ফুলী-মা পর্যন্ত তার মৃত্যু-শয্যাতে শুয়ে থাকতে থাকতেও খুশি হয়, 'ও এই কথা তা হলে! বালার শিক্ষাই কাজ দিয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে, 'কালিয়ার শ্বশুর আজ বেঁচে থাকলে ওর কোনো দুঃখই থাকত না।'

কিন্তু ভবিতব্যের ওপরে কারোর কোনো হাত নেই। কালুর শ্বশুরবাড়ির তখন সকলের বয়স কম। কোদরের বয়স তো কালুর মতোই বছর সাতেক হবে। তবে তিন ক্রোশ দূরে তার মামারা বেশ সম্পন্ন ঘর। আর কোদরদের বাড়ির অবস্থা অনেক ভালো ছিল। তাই চাষের জন্য ক্ষেত মজুর পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কালুর মাথার ওপরে আকাশ আর পায়ের নীচে মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আষাঢ়ের বর্ষা নামতেই চাষারা সকলে বলদের পিঠে লাঙল চড়াল। গলার ঘন্টির শব্দ তুলে তারা সবাই ক্ষেতের দিকে চলল।

ছেলেমানুষ কালু বলদদের খড়কুটো দিয়ে, একবার লাঙলটা ঠিক করে তো আবার হালের ফলাটা নেড়ে-চেড়ে দেখে, লাগামের দড়ি, হাঁকবার ছড়ি দেখে আর কেবল ব্যস্ত হতে থাকে। গ্রামেতে কোনো ছেলেকে দেখতে পেলে তবেই-না খেলায় মন দেবে ?

বারবার কেবল মাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'মা, লাঙল বাঁধবো ?—সেদিন তো আমিই চালালাম ! বাবা থাকলে আমার কথার সত্যি মিথ্যে প্রমাণ দিয়ে দিতাম ! আমি একলাই তো গত বছরে পাট চাষ করেছিলাম, মনে নেই ?'

কেবল চোখের জল ফেলা ছাড়া মা আর কীই-বা জবাব দেবে ? আর দিলেও কোনো জবাব কালু মানতে চাইত না। তার মুখে কেবল একই কথা, 'তুমি মাঠে বীজ নিয়ে চলো, আমি ঠিক জমি চষে নিতে পারব। তুমি লাঙলটা বেঁধে দাও মা, দেখবে এমন চালাব যে তাক লেগে যাবে !—'

সেই ক্ষুদে কৃষক ছটফট করতে থাকে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে— মার উপর রাগ হয়।

কিন্তু মা জানত যে তার ছেলে এখনো লাঙলটা যত উঁচু মাথায় ততটা বাড়ে নি, তখন লাঙল সিধে ধরে থাকা, বলদদের সোজা চালানো এবং বীজ বোনা ইত্যাদি সব কাজ তার ওই কোমল হাতে কী করে করবে !

কালুর মার এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে এমন দুঃখ কখনো আসে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর অশৌচ কাটাতে যত বেদনা পেয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি বেদনা আজ এই আষাঢ়ের দিনে বাড়ির উঠোনে বলদ বাঁধা থাকতে দেখে অনুভব করে।

দুঃখ হবে নাই-বা কেন ? প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি কাজের হৈ-চৈ, উল্লাস-উৎসাহের ফোয়ারা বইছিল যেন। কেউ বীজ নিয়ে যাচ্ছিল তো কেউ হুঁকো নিয়ে। কোনো ছেলের হাতে জলন্ত ঘুঁটে তো

অন্য কারোর পকেটে তামাক।

সামনের বাড়িতে গায়েগতরে আগাপাস্তলা গোলগাল মালী উঠোনের চাতালে বসে নস্যির জন্য তামাকের পাতা কুটছিল আর একের পর এক খবরদারি করছিল, 'কই নাথিয়ার বউ কোথায় গেলে? যা মাঠে আর-এক ঘড়া জল নিয়ে যা দেখি। একঘড়া জলে চারজন লোকের চলবে কী করে?' আবার হয়তো রণছোড়ের বউকে হাঁক পেড়ে বলে, 'আর জীবলী তুই কী করছিস? দেখ তো ওই ডেকচিতে কতটা হালুয়া রয়েছে? দুপুরের জলখাবারের সময় ওই বাড়তি হালুয়াটুকু নিয়ে যাস তখন, আর এবার একটু হাত চালিয়ে রুটি কটা করে নে। নানিয়ার তো আবার গমের আটার রুটি চাই।'

এই-সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে কালুর মা ঘরের বাইরে মুখ বার করার পর্যন্ত সাহস পায় না। মনে তো খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল, 'বলদের পিঠে দিই লাঙল লাগিয়ে, আমি নিজেই চালাব।' কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। শাস্ত্রে ব্যাপারটা মানা করা হয়েছে কিনা সে তো পণ্ডিতই বলতে পারে কিন্তু অন্য লোকেরা এটাকে ঠিকমতো নিতে পারবে না সেটা কালুর মা বুঝতে পারে। ধরিত্রীর বুকের উপর কোনো মেয়েছেলে লাঙলের হাতলে হাত রেখেছে— লাঙল চালিয়েছে এ কথা এখনো পর্যন্ত কেউ শোনেইনি যখন, তখন তা দেখা সম্ভব হয় কী করে?

স্বামীর কথা প্রতি মুহূর্তে মনে আসতে থাকে: 'দশ ক্রোশ দূরের রাস্তা পৌঁছে যাওয়া যায় কিন্তু আষাঢ়ের সকালে এক কোচড় বীজ বপন করতে না পারলে পরে আর কখনো সেদিনটা ফিরে পাওয়া যাবে না, সারা জীবন ধরেই আপসোস করতে হবে—'

অবশ্য শংকর, কাসম ধাঁচী প্রভৃতিরা বলেছিল, 'কিছু ভেব না রূপা কাকী, আমাদের জমিতে বীজ লাগিয়ে তোমার জমিও চষে দেব।' কিন্তু সেইমতো হিসেব ধরলে তো প্রায় দু-তিন মন— পনেরো-ষোল কোঁচড় বীজ বপন করার দিন দেরি হয়ে যাবে। উঠোনে বাঁধা

বলদের ওপরে নজর পড়তে বুড়োর কথা আবার মনে আসে : 'আষাঢ় মাসের সকালে চাষার উঠোনে যদি বলদ বাঁধা দেখতে পাও তবে নিশ্চিত জানবে তার ভাগ্য অন্য কোথাও চরতে গেছে— ঘরেতে নেই।'

রূপার চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়তে থাকে।

সে ঘরের কাজে মন লাগাবার চেষ্টা করে কিন্তু আজ ঘরেতেও কোনো কাজ ছিল না। প্রায় দেড় দিনের আটা পেষা রয়েছে, আর পুরো বর্ষাকালটা চলে যাবার মতো চাল ঢেঁকিতে কোটার জন্যে ঝেড়ে-বেছে রেখেছে। সকাল বেলাতেই জল ভরে নিয়ে এসেছিল, কালুকেও খাওয়াদাওয়া করিয়ে দিয়েছে আর তার নিজের তো খিদেই ছিল না। ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে বৃদ্ধা ঘরে ঝাড়ু দিতে শুরু করে। ঝাঁট দিতে দিতে উঠোনে আসতেই—

দেখার ইচ্ছে ছিল না তবু মালীর ঘরের দিকে অবাধ্য চোখ দুটো ঘুরে তাকায়। চার-পাঁচজন মেয়েছেলে ঝুড়ি নিয়ে মালীর পায়ের সামনে বসে ছিল। পরমা মোড়লের বীজ মাপার জন্য তাদের কাজে লাগানো হয়েছিল।...

আর শোনবার ইচ্ছে ছিল না তবুও মালীর বাক্যবাণ কানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে হৃদয় ভেদ করে চলে যায়।

মালী সেই বউদের সম্বোধন করে বললেও উদ্দেশ্য নিজের বড়জাকে শোনানো, 'ঠিক আছে নিয়ে যাও, যা বীজ লাগবে নিয়ে যাও। করো চাষ যত খুশি তোমাদের। আবাদ করলে তবেই না কিছু ফলবে জমিতে, নইলে, ঘরে বসে থাকলে ধুলো ছাড়া আর কী জন্মাবে?' আর কালুদের বলদদের দিকে তাকিয়ে, 'উঠোনে বলদ বাঁধা থাকলে তবেই না একদিন ঘোড়া বাঁধা যাবে।' বলে হি হি করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। সেই বউয়েরাও তার সাথে হাসিতে যোগ দেয়।

তবুও এ টিপ্পনী কম হল ভেবে এবার সোজাসুজি রূপাকেই বলে বসে, 'আমি না-হয় আমার বাপের রোজগার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনি নিজেই তো খুব করিৎকর্মা। তবু এই আষাঢ়ী সকালে

হাতের ওপর হাত তুলে ঘরে বসে আছেন যে ?'

ঘরের চৌকাট পেরোবার জন্য রূপার উঁচু করা পা উঁচুতেই থেমে যায়, ভেতরের দিকে পা দিতে গিয়ে সে ফিরে আসে। ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার বার্ধক্যে শীর্ণ চেহারায় যেন যৌবনের তেজ ফুটে ওঠে। কোঠরাগত চোখেতে আত্মগরিমার দীপ্তি ঝলসে ওঠে। কালু বলদদের ঘাস জড়ো করে দিচ্ছিল, তাকে সে বলে, 'খোকা, লাঙল লাগা। আমি লাঙল বাইরে বার করে দিচ্ছি।'

কালু অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়েই থাকে, তার যেন বিশ্বাসই হতে চায় না কথাটা।

কিন্তু ততক্ষণে সে মাকে দালান থেকে লাঙল বার করতে দেখে।

সেই ছোটো কিসানের মন খুশিতে ভরে ওঠে। তক্ষুনি সে বলদের দিকে ফিরে বলে, 'ওঠ্ ওঠ্ আমাদের লাঙল লাগাব চল্ দেখি—'

মা বলদদুটোকে জোতবার পর লাগামের দড়িটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দেয়। অন্য হাতে লাঙলের ফলাটাকে ধরে বলে, 'যা আমাদের সেই বটগাছওলা ক্ষেতে চলে যা, আমি বীজ নিয়ে যাচ্ছি।'

মালী তো বলদজোড়ার পেছনে কালুকে যেতে দেখে ট্যারা চোখে তাকিয়ে থাকে। সেই বিশালকায় বলদের পিঠে বাঁধা লাঙলের পেছনে ছোটো ছোটো কদমে হাঁটতে থাকে কালু। দেখে মনে হয় বলীরাজের পেছনে পেছনে বামন অবতার যাচ্ছে।

কিন্তু রূপাকে বীজের ঝুড়ি নিয়ে মাঠের দিকে যেতে দেখে মালী হাসতে শুরু করে দেয়। বিদ্রূপ করে বলে, 'হাভাতে মাগীটা কেন যে এমন করছে ? এই বীজের দানাগুলো খেতে পারত, মিছিমিছি নষ্ট করছে কেন ? এক বিঘৎ-এর ছোকরা আবার চাষ করবেটা কি … !'

তারপরে সে ওই বউদের সঙ্গে কপালদোষের আলোচনা শুরু করে দেয়, 'বরাৎ মন্দ হলে মানুষে উল্টো বোঝে। এই দেখলে না ? এ-সব অন্য কিছুর জন্যে নয় ওই পোড়া কপালদোষেই হচ্ছে !'

ইতিমধ্যে নাথার বউ মাঠেতে জলের ঘড়া পৌঁছে দিয়ে ফিরছিল,

তাকে গজগজ করতে শোনা যায়, 'যা হোক, খুব দেখালেন আপনাদের আত্মীয়-কুটুমেরা—'

বউয়ের গলার স্বরে বেশ ঝাঁঝ আর বিরক্তি ফুটে ওঠে। মালী তাতে ঘাবড়ে যায়, 'কী হয়েছে রে বউ?' তার ভাবনা হয় তার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আপসে ঝগড়া মারামারি কিছু করে নি তো?

হবে আবার কী, আপনার বড়ো জা কোমরে কাছা লাগিয়ে ভুট্টার বীজ বুনছে মাঠেতে। খুব দেখালেন যা হোক আপনারা সকলে—

'হায় হায় কী সর্বনাশ! এ মাগী বলছে কী? ঐ অপয়াটার মা জমিতে লাঙল চালাচ্ছে?'

'লাঙল চালানোর আর বাকীটা রেখেছে কি? কালুভাই তো একরত্তি ছেলে, সে নিজেই তো হাতলে ভর দিয়ে মাটি ঢিপি ঢেলার মধ্যে লাঙলের সাহায্যে যাচ্ছে।'

পরমা প্যাটেলকে ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই হয়তো মালী হাসতে হাসতে বলে, 'ভাইয়ের জমিতে ভাঁড় কেমন নাচছে দেখে এসো একবার···হি—হি—হি—'

পরমা মোড়লের আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে, 'তোর মতো পরম ভাগ্যবতী জা পেয়েছে কিনা—' বলেই মাঠের দিকে দ্রুত পা চালায়। ভাবনা-চিন্তার কথা তো বটেই, 'মেয়েদের হাতের ওপরে ভগবানও নারাজ। কখন কী যে করে বসে বলা যায় না।— না হলে কালিয়ার মা যেমন বুদ্ধিমতী মেয়েছেলে সেও কিনা সাত পুরুষের মান-মর্যাদায় এক মুহূর্তেই একেবারে জল ঢেলে দিলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভীলেদের মেয়েদের মতো— আমাদের প্যাটেল (মোড়ল) বংশের কেউ যদি ভুলেও লাঙলে হাত লাগায় তো কেলেঙ্কারি হয়ে যায়! কী সর্বনাশের ব্যাপার।—'

কিন্তু এধারে মালীর আনন্দের আর সীমা থাকে না। এমনি বাইরের ভাবখানা তো ক্রুদ্ধ রণচণ্ডী। কালুর মা সাতপুরুষের বংশ-মর্যাদা, জাত-জন্ম, কুল মানেতে চুনকালি দিয়েছে এমনি ভাবে আপসোস করতে থাকে— কালুর মাকে উদ্দেশ করে বলে, 'সমস্ত

জ্ঞাতি-কুটুমদের সর্বনাশ করে ছাড়লে বিধবা মাগীটা, ছেলের মাথাটা উঁচু রাখার পর্যন্ত অবস্থা রাখলে না—।'

শুধু মালী আর পরমারাই নয়। প্রায় সারা গাঁয়ের লোকেরাই হাত পিষছে হাতে, 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কেমনতর মেয়েছেলে রে বাবা।'

গাঁয়ের বাইরের ক্ষেতে যারা লাঙল দিচ্ছিল তারা ততক্ষণে লাঙল ফেলে সব কালুদের মাঠের দিকে পৌঁছে যায়, 'এ যে গাঁয়ের আমাদের সমাজের সকলের নাক কাটলে। দাও বুড়িকে মাটিতে ফেলে তার ওপর দিয়ে লাঙল চালিয়ে— মই দেওয়ার তক্তার নীচে দিয়ে টেনে বার করে দাও— লাঙলের হাতলে যখন হাত দিয়েছে এককণাও যদি শস্য হয়েছে তো দেখো কী বলেছি! এবার দুর্ভিক্ষ লাগবে দুর্ভিক্ষ।'

তবু খানিকটা ভালো বলতে হবে যে শংকর, কাসম ধাঁচী প্রভৃতিরা, 'লাঙলে হাত দেবার কথা মিথ্যে, ওই তো কালিয়াই লাঙল চালাচ্ছে, ছোকরা একরত্তি হলেও ওকে কম ভেব না যেন,' বলে রূপার লাঙল চালানোর কথাটা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভীলেদের মেয়ের মতো কাছা বেঁধে মাঠে নামাটাই বা কম কিসে—

এই-সব আলোচনা ও হৈ-চৈ দেখে কালু কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। তবে মা নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল। সকলের কথা শেষ হবার পর সে অল্প কথায় পরিষ্কার ভাবে শুনিয়ে দেয়:

'আপনাদের মনের ইচ্ছে তো দেখছি না খেতে পেয়ে মরে গেলেও ঘরেতে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকো। খেটে খাওয়াতে খারাপটা কোথায়? অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যে হাত তোলা হয়ে থাকা তো অন্যায়। এ-সব সত্ত্বেও যদি আপনাদের এতে অন্যায় কিছু আছে বলে মনে হয় তা হলে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেদের বউদের বলবেন যে, পরের বাড়িঘর ঝাঁড়পোঁছ করে খেয়ো তবু কোনো—'

জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকা কালুকে মা আদেশ দেয়, 'ওঠ খোকা চালা বলদদের।'

লোকেরা অবাক হয়ে এই মেয়েছেলেটির দিকে তাকিয়েই থাকে।

দু-চার জনে বলেও ফেলে, 'এখন না-হয় ঠিক আছে কিন্তু যদি প্রবাদমতো এবছরে বৃষ্টি না হয় বা ফসলের ব্যাপারে কোনো গোলমাল হয় তা হলে দেখে নিয়ো বুড়ী তোমার কী দশা হয়—'

কেবল শংকর, কাসম আর পরমা প্যাটেল প্রভৃতিদের কালুর মার উত্তর মনে ধরেছিল, 'তা কথাটা তো ঠিকই মেয়ে। খেটে খাওয়াতে তো অন্যায় কিছু নেই! অন্যের দয়ায় থাকাই তো অসম্মানের'—আর কাসম তো ফেরার পথে অন্য লোকেদের নিজের মনে বকবক করে শোনাতে থাকে, 'কাঙাল-ভিখিরী হয়ে থেকো কিন্তু অন্যের খোশামোদ করতে যেয়ো না, কথাটা যে বলে তা ঠিকই!…

এই প্রবচন আর, 'খেটে খাওয়ায় অসম্মান কোথায়?' এই উত্তর দুপুরের পরে গাঁয়ের বেশ-কিছু বউদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

আর ফিরবে না-ই-বা কেন? দুপুরে জলখাবার দিতে গেলে অনেক স্বামীরাই কালুর মার উদাহরণ দিয়ে বলেছিল, 'তোরা যে-ধরনের মেয়ে, তোদের কাছে ছোটো বাচ্চাকে মানুষ করার দায় পড়লে হয় বাচ্চাটাকে ফেলে অন্য স্বামীর ঘর করতে ছুটবি না হলে লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করে দিন কাটাবি। কিন্তু দেখ গিয়ে কালুর মাকে!…বাহবা দিতে হয় অমন মেয়েছেলের সাহসকে।—কেমন করে বাঁচার মতো বাঁচতে হয়— যা একবার শিখে আয় ওর কাছে গিয়ে।'

কেমন করে বাঁচতে হবে তাই শিখতেই যেন বিকেলবেলা রূপা মার বাড়িতে আট-দশটি বউয়ের সংখ্যা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পনেরোতে গিয়ে দাঁড়ায়। রূপার কাছে বারবার একই প্রশ্নের জবাব চাইতে থাকে, 'আমাদের তো ভীষণ আশ্চর্য লাগছে রূপা-মা, আপনি সাহস করলেন কী করে?' রূপার মনে তখন কিন্তু কোনো ক্ষোভ অভিমান গর্ব কিছুই ছিল না; গলার স্বরটা তার নিজের, ঠোঁটও তারই কাঁপছিল বটে কিন্তু কথা বলছিল যেন বৃদ্ধ বালার আত্মা, 'কী আর করব বলো, ঘাড়ে এসে পড়ে যখন' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে উত্তর দেয়, 'যাক্ ওই কুঁদলেটার ভালো হোক; ও যদি টিটকিরি না দিত তা হলে

হয়তো কাছা বাঁধতে নামতাম না আমি, আরো দু-চার বছর আমাকে অন্যের আশা-ভরসার ওপর নির্ভর করে সব সময় ছোটো হয়ে থাকতে হত।'

আর এই-সব কথা জেনে-শুনে মালীর অন্তরাত্মা জল থেকে তুলে শুকনো ডাঙায় ফেলা মাছের মতো ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বৃষ্টির বেগ কমে আসতে থাকে আর তাইতে মালী সুযোগ পেয়ে যায়, চলতে ফিরতে বলতে থাকে, 'মেয়েমানুষ লাঙলে হাত দিয়েছে এখন আর একফোঁটাও বৃষ্টি যদি হয় তো কি বলেছি দেখো!'

অবশ্য মালী আর কী বলবে এ ব্যাপারে? এ গাঁয়ের সকলে আশপাশের গাঁয়ের লোকেদের স্থির ধারণা হয় যে রূপা যেহেতু লাঙল চালিয়েছে অতএব বৃষ্টি এবারে আর হবে না।

আশপাশের গাঁ থেকে খবর আসতে লাগল— 'মোড়লের মনে আছে কি যে ওই লাঙল-চালানো মেয়েছেলেকে জমিতে মই দেবার তক্তার নীচে দিয়ে বার না করলে মাঠের ভুট্টা আর ধান শুকিয়ে যাবে।'

কেবল পরমা মোড়ল নয়, গাঁয়ের সবাই ভাবনায় পড়ে যায়। আবহাওয়ার ব্যাপারে ওয়াকিবহালদের জিজ্ঞেস করতে করতে বিরক্ত হয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে ক্লান্তি আসে আর এই হয়তো পঞ্চমীতে হবে, নইলে সপ্তমীতে, একাদশীতে হবে বৃষ্টি। এমনি করে ভেবে ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে। ওদিকে মাঠের সবুজ ঢেউখেলানো ফসলও ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। ফসলের অবস্থা দেখে সব কিষাণের মুখে একটাই শব্দ ফুটে ওঠে, 'সর্বনাশ হয়ে গেল।'

ইচ্ছে থাক বা না থাক একদিন সন্ধের সময় গাঁয়ের সকলেই পরমা মোড়লের বাড়িতে জমা হয়। শংকর, বেচাত পর্যন্ত সকলের সঙ্গে একমত হয় যে রূপাকে ক্ষেতে শুইয়ে রেখে একটা হাল্কা কাঠের তক্তা বলদদের দিয়ে টানিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া বাঁচবার— বিধাতার এই রুদ্ধ রোষ শান্ত করার আর-কোনো উপায় নেই। এখন

আর সময় নষ্ট করলে, আরো দুটো দিন দেরি করলে, বৃষ্টির পথ চেয়ে অপেক্ষা করলে মাঠের ভুট্টা আর ধান শেকড়সুদ্ধ শুকিয়ে যাবে— কিন্তু রূপাকে সে কথা বলতে যায় কে ?

এই প্রসঙ্গটা নিয়েই পরমা মোড়লের উঠোনে কথা-কাটাকাটি হতে থাকে। একজন যদি বলে তুই যা, তো অন্য জনে বলে তুই যা-না।

সামনের দরজার আড়ালে রূপাও জানত আজ গাঁয়ের লোকেরা এখানে কেন জমা হয়েছে। তাই অন্তর্যামী বিধাতার কাছে সে বার বার মিনতি জানাতে থাকে : 'কিসের জন্য আমার মতো অভাগীকে তুমি আরো দুঃখ দিতে চাও ভগবান। আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ কোনো খবর নেয় না। সে না-হয় না নিক কিন্তু তাই বলে তুমিও ? আর আমি কী এমন অন্যায় কাজ করেছি ঠাকুর ! কত কষ্ট করে যে আমি আমার দিনপাত করছিলাম তাও তোমার সহ্য হল না ঠাকুর !' আর মৃত বালাকেও নালিশ জানায় : 'তুমিও সেখানে গিয়ে সেখানের লোক হয়ে গেছ ? তুমি তো আমাকে ছেড়ে রওনা হয়ে গেলে কিন্তু এখানে আমার দেখাশুনা কে করবে ?··· দেখতে পাচ্ছ না গাঁয়ের সব লোক আজ— কিছু তো করো ! কালা ভগবানকে অন্তত দুটো কথা—'

বৃদ্ধার দুঃখী আত্মা যেন চীৎকার করে বলতে থাকে, 'মিথ্যে কথা ! আমি লাঙলের হাতলে হাত দিই নি, আর হাত রেখেছি কি রাখতে বাধ্য হয়েছি বলে সেই কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না এটা নির্জলা মিথ্যে কথা— আমি মই দেবার পাটার নীচে দিয়ে মোটেই যাব না, সমস্ত গাঁ আমার ওপর ভেঙে পড়লেও না !··· দেখি কোন্ মায়ের বেটা আমাকে বলতে আসে সে কথা ! হতভাগার মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব বলে দিলাম···'

এইভাবে স্থির প্রতিজ্ঞায় অটল রূপা বসে বসে পরমার বাড়ির রোয়াকে ক্রমবর্ধমান তর্কাতর্কি শুনতে থাকে, আর কে এগিয়ে এসে বলতে আসে তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

'দেখুন মোড়ল, ও আপনার বউদি, আপনিই ওকে মাঠে নিয়ে

চলুন …'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ শংকর, বুড়ীর সঙ্গে তোর সম্পর্কটা ভালো, তুইই যা…'

'তা হলে কাসম ঘাঁচীকে পাঠান, ও গিয়ে দু-কথা গুছিয়ে বলতে পারবে।'

কিন্তু কাসম পরিষ্কার অস্বীকার করে বসে, 'শুধু আমাদের গাঁয়ে কেন সারা দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না যে রূপা কাকী আপনি চলুন। আর সত্যি কথা বলতে কি ভাই আমি এ-সব মানি না।'

অতঃপর কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত বারান্দাই যেন নিঃঝুম হয়ে যায়, 'আরে ভাই, আপনারা সকলেই যদি অস্বীকার করেন তা হলে কে ডাকতে যাবে? লজ্জা আর মানমর্যাদা বাঁচাবার জন্যে সারা তল্লাটের লোকে কি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মরবে?'

ঘরের চৌকাঠে বসে মালী একগাল হেসে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, 'হতভাগারা চারজনে গিয়ে ওকে টেনে নিয়ে আসতে পারে না?' এই পরামর্শটাই উঁচু গলায় দিতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই রূপাকে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে, বলতে শোনে, 'আপনাদের বলবার আর দরকার হবে না। আমিই যাচ্ছি, চলুন। আমার একার পাপের জন্যে আপনাদের সকলকে মরতে হবে কেন? উঠুন আপনারা। চলুন।' রূপার চোখের তারায় তখন এক আশ্চর্য দীপ্তি, মুখে এমন একটা গৌরবোজ্জ্বল আভা যেন সহমরণে 'সতী' হতে চলেছে। তার চলার মধ্যেও সেই দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। নিম-গাছের কাছে পৌঁছে সে কাসমকে কাছে ডাকে। একটা উদ্গত কান্নার বেগকে হাসি দিয়ে নিরর্থক গোপন করার চেষ্টা করে বলে, 'কাসম!—ভাই! আর কিছুই তো বলার নেই, শুধু আমার কালিয়াকে তোর কোলে দিয়ে গেলাম— বলদের পায়ের নীচে শুতে চলেছি কে জানে হয়তো'— কথাটা শেষ না করেই রূপা পাড়া ছেড়ে ক্ষেতের দিকে সোজা চলতে শুরু করে দেয়।

কাসম হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে— বারান্দায় আরো পাঁচ-ছটা

খাটিয়া ছিল কিন্তু সকলেই যেন কাগজের পুতুলের মতো তাতে বসে আছে! কাসমকে বলা কথাগুলো অর্ধেকটাই মোটে শোনা গিয়েছিল তবু কয়েকজনের অন্তর আতঙ্কে ছেয়ে যায়, 'যদি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ কিছু হয়ে যায়।'

আর সেইরকমই হ'ত হয়তো। রূপা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, 'গাঁয়ের আর আশপাশ এলাকার খাতিরে লাঙলে জোতা বলদের পায়ের নীচে দিয়ে একবার বেরিয়ে আসবে ঠিকই কিন্তু তার পরে বৃষ্টি হোক বা নাই হোক—বাত্রক নদীর গভীর জলে আত্মবিসর্জন—'

এ-সব কথা মুখে না বললেও লোকে রূপার চেহারা, তার টান টান করা পিঠ দেখেই যেন বুঝতে পেরে গিয়েছিল; 'ওর ক্রুদ্ধ আত্মা অভিশাপ দেয় যদি'— অন্য দিকে আবার অভিশাপের হাত এড়াতে গেলে বৃষ্টি না হবার জন্যে সবাই যে মরতে বসেছে তার কী হবে?

কাসম ঘাঁচী বারান্দার তন্দ্রা ভাঙায়, 'কী হল ভাই, তোমাদের মধ্যে কেউ উঠছ না কেন?'

'হ্যাঁ— হ্যাঁ ঠিক তো!' পরমা মোড়ল সায় দেয়।

'ওঠো তা হলে!' বেচাতের কাকা উঠে দাঁড়াতেই সারা বারান্দা উঠে পড়ে তার পেছনে।

মালী গাঁয়ের লোকেদের বুদ্ধি দেয়, 'এমনিতে ওকে মইয়ের পাটা-তলা দিয়ে বার করবেই তোমরা, তবু দেখানোর জন্যেও অন্তত তক্তাটা সঙ্গে নিয়ে যাও। তাতেও যদি ওর একটু শিক্ষা হয় তবে হয়তো এর পর থেকে ভগবানকে মানবে।'

এ-সব কথায় কেউই কান দেয় না। তাদের সমস্ত খেয়াল তখন অন্য এক ধারণাতীত ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে নিবিষ্ট ছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রূপা পথের অন্য সব জমি ছেড়ে দিয়ে সোজা তাদের সেই বটগাছতলা জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। পৌঁছেই জমির কাজেতে লেগে যায়। গাঁয়ের অন্য যারা সেখানে এসে পৌঁচেছিল তাদের বলে, 'আমাকে দরকার পড়লে ডেকে নিয়ো।'

বেচাতের কাকাই আবার স্তব্ধতা ভাঙে, 'বলদ আনাও ভাই। কে

মই দেবার তক্তাটা আনবে নিয়ে এসো। সবাই এধার-ওধার করতে থাকলে দিন শেষ হয়ে যাবে।'

একজনের পক্ষেই যথেষ্ট তবু নানার সঙ্গে আরো তিনটি ছেলে বলদ আনতে গেল। অন্য আট-দশজন এদিক-ওদিকের মাঠে পড়ে থাকা তক্তাগুলো দেখে কোন্‌টা আনবে তা ঠিক করতে গেল।

এ-সব সত্ত্বেও বটগাছের তলায় লোকের সংখ্যা কিছু কম হল বলে মনে হয় না, বরঞ্চ ক্রমশ তা বাড়তেই থাকে। গাঁয়ে যত লোক আছে সবাই ব্যস্ত হয়ে মাঠের দিকে আসতে থাকে। সূর্যও যেন 'তামাশা' দেখার জন্য পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপরে থেমে গিয়েছিল।

বেশির ভাগেরই দৃষ্টি রূপার দিকে থাকলেও দু-এক জনে বলদ আর কাঠের পাটাতন নিয়ে আসার পথ চেয়ে ছিল। শুধু কেবল কাসম ঈশান কোণের দিক থেকে ছেয়ে আসা মেঘের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মনে মনে সে আল্লার কাছে প্রার্থনা করছিল, 'তোমার স্মরণার্থীর লাজ-লজ্জা আজ তোমার হাতে ঠাকুর!'—

শংকর, বেচাত, বামা প্রভৃতির দৃষ্টিও অবশ্য ওই ছেয়ে-আসা মেঘের দিকে পড়েছিল কিন্তু তারা ভাবছিল, 'অমন মেঘ তো রোজই উঠছে।'

কিন্তু কাসমের অন্তরে কে যেন নিশ্চিত ভাবে আশ্বাস দেয়, 'বলদের পিঠে মই জুততে জুততেই বৃষ্টি প্রলয় নাচন শুরু হয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যে পরমা মোড়লের ছেলে নানা তাদের চারটে বলদ নিয়ে হাজির হয়। বলদগুলোকে দেখেই কাসম একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, 'শালা বাঁদর, তোর লজ্জাশরম থাকলে তুই এমন বুনো ষাঁড় আনতে দৌড়তিস না। মানুষ খুন না করে এ ছাড়বে?'

পরমা মোড়ল তো নানাকে মারতে তেড়ে আসে, 'হতভাগা তোকে এমন বুদ্ধি জাহির করতে কে বললে কে…'

'কে আবার, মা-ই তো বললে যে…'

রণছোড় ওকে ইশারা করতে কথাটা আর শেষ করে না সে।

ওধার থেকে রূপা এসে পড়ে, 'কই, চলো ভাই !'— ওর বলার হয়তো প্রয়োজন ছিল না তবুও বলে, 'মানুষের বুকের ওপরে পা রাখার অভ্যেস তো একমাত্র মানুষেরই রয়েছে, অন্য জানোয়ারদের তো নিরূপায় হয়ে মাড়াতে হয়। বলদ জুতে দিয়ে নাও চলো। নইলে এক্ষুনি হয়তো বৃষ্টি নেমে গেলে মনের বাসনা মনেই থেকে যাবে।'

লোকেদের ছুটো কথাই এই সময় একসঙ্গে খেয়াল হয়— একদিকে তো ওই মেঘ ক্রমশ ছেয়ে আসছে সারা আকাশ, আর ওদিকে তখনো কেউ বলদের পিঠে জোতবার লাঙল নিয়ে আসে নি। প্রত্যেকেই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে থাকে কিন্তু কারোর আর বলার সাহস হয় না যে 'লাঙলটা নিয়ে এসো।'

এখন আর তার দরকারও ছিল না কোনো। ঈশান কোণ থেকে হাওয়া তীব্র বেগে ধেয়ে আসছিল আর সেই মেঘের দল উন্মত্ত উত্তাল ক্রোধে ভেতরে ভেতরে যেন গর্জন করে উঠছিল। শিবের বিশাল জটাজালের গোলক ধাঁধা থেকে মুক্তি পেয়ে বৃষ্টি তখন অঝোড়ে পড়তে শুরু করেছে।

আর লোকেদের মনে হতে থাকে এ যেন বৃষ্টির ফোঁটা নয়, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ; এ যেন রূপার অভিসম্পাত ঝরে পড়ছে।

তারা সকলেই যেন মাটিতে শিকড় গজিয়ে নিশ্চল অবস্থায় পৌঁচেছে। কাসম সুযোগ ছাড়ে না, 'কী হল ? এখন সবাই এমন পুতুল হয়ে গেলে কেন ? রূপা খুড়ী তো সকলের সর্বনাশ করেছিল, তা এখন কী হল ?'— তার মুখচোখের চেহারার সাথে গলার স্বরও পাল্টে যায়, 'এখন সকলে মনে মনে স্বীকার করো যে ভগবান আমাদের সকলের মুখ রক্ষা করলেন, নইলে রূপা খুড়ীকে লাঙলের নীচে দিয়ে বার করলে সারা গাঁয়ের যদি সর্বনাশ না হত তো আমি আমার গোঁফ কেটে ফেলে দিতাম। নেহাত'— সে রূপার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে গদগদ স্বরে বলে, 'বালা কাকার মুখে শুনেছিলাম যে মানুষের চেয়ে বড়ো দেবতা 'পৃথিবীতে নেই,

আজ আমিও তা নিজের চোখে দেখলাম। রূপা-মা, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে স্বয়ং বরুণদেবকে আসতে হল।'

রূপার দুচোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছিল আর মুখের উদ্ভাসিত মৃদু হাসিতে সত্যিই তাকে দেবী দীপ্তিময়ী লাগছিল।

শংকরও হাত জোড় করে ক্ষমা চায়, 'আমাদের সকলের এই পাপ'— রূপার যেন বিরক্তি আসে। কথার মধ্যেই বলে ওঠে—

'নে চল্ দেখি পাগলা। এতে আবার পাপের কথা উঠছে কোথা থেকে, নাও চলো সব। ভগবান তোমাদের এবং আমার দুজনেরই মুখ রেখেছেন, ব্যস ফুরিয়ে গেল।'

তবুও বয়স্ক লোকেরা মনে মনে রূপা-মার বন্দনা করতে থাকে, আর কাসম তার নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে প্রণাম করায়, তার পরেই ওই বৃষ্টির মধ্যেই অন্য ছেলেমেয়েদের রূপা-মার পায়ে প্রণাম করার ধূম পড়ে যায়…।

মজা দেখতে মালীও মাঠে এসেছিল, তার মুখের ভাব এমন হয়ে যায় যে কাটলে এক ফোঁটাও রক্ত পড়বে না আর। পেছন ফিরতে ফিরতে নিজের মনে বকবক করে—'হতভাগারা কুঁড়েমি করে দেরি করে ফেললে, না হলে তো— যা যাঃ আর একটু তড়িঘড়ি কাজ করলেই হতভাগীর নাক আজ কাটা যেত। লোকেরা কথা বলতে বলতেই—'

ঘরে ফেরার পথে লোকেদের আনন্দের থেকেও অনুশোচনাই বেশি হতে থাকে, 'যাক্‌গে যাক্ বাবা, কেলেঙ্কারি হয়ে যেত, রূপা-মা যে সতীলক্ষ্মী এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—'

সেদিন রাত্রে গাঁয়ের প্রায় সব বউয়েরাই রূপার বাড়িতে এসে বসে, 'বলুন-না সত্যি করে রূপা-মা, আপনি কোন্ দেবীকে স্মরণ করেছিলেন—'

উত্তরে সজল চোখে নিজেকেই যেন বলে রূপা, 'সত্যি যদি শুনতে চাও তো বোন, তা হলে বলি নিজের স্বামীকেই স্মরণ করেছিলাম।' আর— হেসে ফেলে বলে, 'কিছু গালাগাল দিয়েছিলাম ভগবানকে.

বাদবাকী—'

লোকেদের মধ্যে রটে যায়, 'রূপা-মা বালা কাকাকে মিনতি করেছিল, বালা কাকা সোজা ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছয় আর ভগবান হুকুম দিয়েছিলেন বলেই বরুণদেবকে এমন মুষল ধারে বৃষ্টি দিতে হল। তা না হলে কোথাও কিছু মেঘের চিহ্ন ছিল না আর আজ ঠিক ওই সময়েই বৃষ্টি এসে গেল।'

পরের দিন আশপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে গেল কথাটা, 'রূপা-মা আশ্চর্য কাণ্ড করেছে···বিনা মেঘে বৃষ্টিকে এনেছে···একবার সেই বৃষ্টি এনেছিল নরসিং মেহতা আর এই বৃষ্টি পড়ালে রূপা-মা···ঘোর কলিকালেও রূপা-মার মতো এমন খাঁটি মানুষ রয়েছে! সত্য কখনো চাপা থাকে না, মাটি কখনো বীজ নষ্ট করে না! এ তো একেবারে চোখে দেখা ঘটনা!'

॥ নয় ॥

গোলযোগ

এর পরে তিল বোনার সময় কালুকে একলাই লাঙল চালাতে হল। মা অবশ্য সঙ্গে থাকত, আর এবারে বলদদুটো বদলে শংকরদেরগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল।

মা লাঙল জুতে দিয়ে বলে,—'নাও চালাও খোকা আস্তে আস্তে।' লাঙল চালাতে ও মাটি থেকে লাঙল বার করতে শেখায় তাকে। একটা পাক পুরো লাঙল চালানো অবধি সে সঙ্গে সঙ্গে যায়। পরের পাক চষার জন্যে লাঙল তুলে ফের মাটিতে বসিয়ে দিয়ে সে ঘরে চলে আসে— 'বলদ যদি গোলমাল করে কিংবা লাঙলের কিছু হয় তা হলে ওদিকে তোর সম্বন্ধীদের মজুরেরা লাঙল চালাচ্ছে তাদের ডেকে নিস্, ততক্ষণে আমি ঘর ঝাঁট দিয়ে জল ভরে রেখে ফের এসে যাব। লাঙল সোজাসুজি চালাস তা হলে সুবিধে হবে। বলদদের বেশি খোঁচাখুঁচি করিস না, ওরা নিজেরাই সিধে চলবে।'

আস্তে আস্তে কালুর হাত ঠিকমত তৈরি হয়ে যায়। পাশাপাশি ঠিক সার দিয়ে চষতে শিখে যায় আর ক্রমশ ভারসাম্যবোধও জন্মায়। কিন্তু ক্লান্তিও সেইমত বেড়ে যায়, কথায় বলে, 'এ হচ্ছে শুকনো কাঠের পেছনে পেছনে ঘোরা।'

তবু তার উৎসাহ কিছু কমে না, বরঞ্চ একলা নিজে লাঙল চালাতে পারছে বলে আগের মতোই উৎসাহ বোধ করে। তাই সে মাকে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও-সব আমি জানি। তুমি নিশ্চিন্তে যাও। ওই সঙ্গে গোরু-বাছুরগুলোকে বার করে খুঁটিতে বেঁধে এসো।'

মা অদৃশ্য হতে সত্যি সত্যিই তার উৎসাহ বেড়ে যায়। আর কেনই-বা যাবে না? চাষের লাইন বেঁকে গেলে বা আঁল ভেঙে

ফেললেও কেউ দেখার বলার নেই। কখনো মাটির ঢেলার সাথে লাঙলের ফলা বেরিয়ে এলে কালু লাফিয়ে উঠে হলের সঙ্গে ঝুলে পড়ে, দেখার লোক বা হাসিঠাট্টা করার লোক ধারে কাছে কেউ থাকে না! একটা ক্ষেত দূরে রণছোড়— নানা হাসল কি কাঁদল তাতে কালুর কিছু আসে যায় না। ঠাট্টাইয়ার্কি করছে, নিজে শুনলে-দেখলে তবে তো রাগ আসবে?

সে মনে মনে ভাবছিল, 'মা ফিরে আসতে আসতে এই একবিঘে জমিটা পুরো লাঙল দিয়ে নেব।' মাঝে মাঝে সে তাই গ্রামের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল একবার, আবার দেখছিল কতটা জমি তখনো বাকী আছে। চষে ফেলা জমিটাও এক নজরে দেখে নিয়ে বলদের ল্যাজে মোচড় দেয়, 'চল্ বাবা আর-একটু তাড়াতাড়ি। মা ফিরে আসতে আসতে এইটুকু শেষ করে ফেলি। হ্যাঁ···রে! এমন কিছু বেশি চাপ তো পড়ে নি?'

কিন্তু সেই সময়েই গ্রামের রাস্তা দিয়ে দুটি ছেলে-মেয়েকে দেখতে পেয়ে, তাদের চিনতে পেরেই কালুর অন্তরে কিসের যেন একটা ভার চেপে বসে।

তারা কোদর আর রাজু— দুই ভাই বোন। রাজু শুধু লজ্জা ঢাকার জন্যেই নয় সুখী সম্পন্ন ঘরের অবস্থা প্রকাশ করতে যেন ফুল তোলা ঘাঘরার সাথে গায়ে ওড়না দিয়েছিল। মাথায় পুঁতির কাজ করা বিঁড়ের ওপরে জলের ঘটি বসানো। ঘটিতে সকালের শিশুরবি নাচছিল যেন।

কালুকে দেখে রাজু বারবার পেছন ফিরে কোদরকে কিছু জিজ্ঞেস করছিল। কখনো সেই লাল উঁচু গলাওলা সারস দুটোর কথা বলছিল তো কখনো লাফিয়ে পালানো ব্যাঙগুলোকে দেখাচ্ছিল।

কিন্তু কালু মনে মনে ভাবে, 'ও আমার কথাই বলছে। আমার দিকেই হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।'— আর তাতেই ওই ছোট্ট প্রিয়তম— স্বামী উত্তেজনা অনুভব করে। লজ্জা করতে থাকে। খুদে পুরুষ-মানুষটি তাই বুক ফুলিয়ে টানটান করে লাঙল চালাতে থাকে, কে

জানে কখন আবার ঢেলা পড়লে লাঙলের সঙ্গে তাকে লাফিয়ে ঝুলে পড়তে হবে সে কথা চিন্তা করে যথেষ্ট সাবধান হবার চেষ্টা করে··· ।

রাজু কিন্তু বটগাছের নীচে এসে তবেই কালুকে দেখতে পায়। সাথে সাথেই তার ছোটো ছোটো চোখ দুটি হাসিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। হাসির জন্যে তার গোলগাল সোনালি মুখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো চকচক করতে থাকে। কোনো কথা না বলে সে একপলক কোদরকে ও অন্য পলকে কালুকে দেখতে থাকে।

কোদর রাজুর থেকেও বেশি খুশি হয়ে ওঠে। সে একদৃষ্টে কালুকে দেখতে থাকে। উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'এই কালু, আমাকে একটু লাঙল চালাতে দিবি রে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ !···কিন্তু তুই তো চালাতে পারবি না ভাই !' কালু চিন্তিত ভাবে জবাব দেয়। কোদর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কালু বলে, 'আয় আয়, তোকে আমি শিখিয়ে দেব খন !'

কোদর গেছে অতএব রাজুকেও যেতে হবে। আর সেই খুদে কিষানের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে কিংবা জল খাওয়ালে লাঙল চালানোর খেলা খেলতে সেই লোভে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, 'তুই জল খাবি নাকি ?' কালুর চোখেতে নিমরাজি ভাব দেখে রাজু এগিয়ে আসে, 'কীরে, খাবি ?' তার কোমল ঘাড়টা একটু হেলাতেই ঘটি থেকে জল ছলকে পড়ে যায়।

ওদিকে কোদর লাঙলের ওপরে একেবারে এসে পড়ে, 'তুই জল খা, ততক্ষণে আমি—দে ছড়িটা দে আমাকে।'

'আরে আরে আল ভেঙে যাচ্ছে !'—কালু লাঙলের মুখটা ঠিক করতে করতে বলে ওঠে।

রাজুর ওইটুকু ছোট্ট মাথায় কী ফন্দি ছিল তা ভগবান জানে। হয়তো কালুর ওপর দয়া এসে থাকবে অথবা সে জল খেতে গেলে তার নিজের লাঙল চালাবার সুযোগ আসতে পারে। হয়তো এই ভেবে সে তৃতীয়বার বলে, 'খাবি না ?' ও একেবারে বলদের পায়ের

কাছে এসে পৌঁছয়, 'কিরে খাবি না জল ?'

জলের ঘটি দেখা অবধি কালুর জলতেষ্টা লেগেছিল কিন্তু রাজুর অনুরোধ না রাখার ইচ্ছেও প্রবল ছিল। শেষ অবধি কিছু ঠিক করতে না পেরে কোদরকে সে ছড়িটা দিয়ে দেয় আর রাজুর মাথা থেকে ঘটি নিয়ে তাতে মুখ লাগায়।

রাজু লাঙলের কথা ভুলে গিয়ে কালুর 'ঘট্ ঘট্' করে জল খাওয়ার দিকেই চেয়ে থাকে। কালু তার পেটে যতটা জায়গা তার দ্বিগুণ জল খায়—দেড় সেরী ঘটির জল প্রায় অর্ধেক করে দেয় তবু রাজু তাকে জোর করে, 'সবটাই খেয়ে নে তুই, আমি আবার জল নিয়ে আসব।'

কালু তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বলে, 'আর খাব না ভাই! নিতে হয় তো নে!' রাজুর মাথায় ঘটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে লাঙলের দিকে এগোয়। দেখে যে কোদর সিধে ভাবে না চালিয়ে বেঁকিয়ে লাঙল চালাচ্ছে।

'আরে আরে লাঙলের ফলা পায়ে লেগে যাবে যে। বলদ দুটোকে থামা। ওদের দাঁড় করা কোদর।' বলতে বলতে সে দৌড়ে যায়।

ঘটি ফেলে পেছনে পেছনে রাজুও দৌড়ে লাঙলের কাছে আসে। 'আমাকে একটু চালাতে দে না ?' সে কালুর হাত চেপে ধরে।

কালু কিছুতেই সাহস করে বলে উঠতে পারে না যে, 'গোলমাল করিস না ভাই, আমার মা এলে এক্ষুনি বকাবকি করবে।'

কোদর বলতে থাকে, 'আমি চালাব' আর রাজু বলে 'আমি চালাব।' আর কালু এই টানাপোড়েনের মধ্যে হালটাকে সোজা করার চেষ্টা করতে থাকে। 'আরে তোরা আমাকে একবার লাঙল সোজা করতে তো দে···কোদর, বলদদের তাড়া দিস না!—মেয়েদের দিয়ে লাঙল চালানো যায় না; নে ভাই ঠিক আছে!'

কোদর ছড়ি দিয়ে বলদদের তাড়া লাগায় আর কালু লাগামের দড়ি টানতে থাকে। বোঝদার বলদ দুটোও এই হট্টগোলে ক্ষেপে যায়, তারা ভয় পেয়ে দৌড়তে থাকে। দড়ি ধরে কালুকেও টানতে

টানতে নিয়ে চলে। কোদরের মুখ একেবারে শুকিয়ে যায় কিন্তু রাজু ব্যাপারটাতে মজা পায়, সে ছোটো ছোটো হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে হাসতে শুরু করে।

ওদিকের মাঠে পরমা মোড়লের তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে নানা খুশিতে মেতে ওঠে। নাথা লাঙল চালানো বন্ধ করে, 'লাঙলের ফাল লেগে যায় যদি, অন্যলোকের বলদ, তা হলে তো—'

'তোর গায়ে ফোস্কা পড়ছে কেন?' নাথার সামনে দিয়ে লাঙল চালাতে চালাতে নানা বলে, কেবল রণছোড় কোনো কথা বলে না।

নাথার দৃষ্টি কিন্তু কালুর দিকে ছিল, 'আরে দড়িতে ঢিল দে বেটা, বলদদের দৌড়তে দে, ওরা আপনিই থেমে যাবে—' সেই দিকে সে দৌড়তে যাবে এমন সময় নানা খবর দেয়, 'ওই ওর মা ছুটতে ছুটতে আসছে। তোকে আর বুদ্ধি ফলাতে হবে না, তুই ফিরে আয়।'

মন্দের ভালো যে লাঙল বলদদের কাঁধ থেকে আলগা হয়ে যায়। তা নাহলে একটা বলদ নির্ঘাত খোঁড়া হত আজ। তখনো কালুর হাত থেকে দড়ি ছেড়ে যায় নি— দড়ি ছেড়ে দেবার কথাও মনে আসে নি তার, ও ভয়ে মড়ার মতো কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

কোদরের খেয়াল হয় সেটা, ছড়ি হাতে সে দৌড়য় বলদের সামনে গিয়ে তাদের থামাবার জন্যে। পেছনে পেছনে রাজুও ছোটে— আর ততক্ষণে হাঁফাতে হাঁফাতে মাও এসে পৌঁছয়।

তিনজনেই একে অন্যের ওপর দোষ দেবার চেষ্টা করতে থাকে। কালু যদি কোদরের নামে দোষ লাগায় তো কোদর আবার তা রাজুর ওপরে চাপায়, 'রাজুড়ীর এই রঙিন ওড়না দেখে ঘাবড়ে গেছে ওরা। সব গণ্ডগোল ওর জন্যে।' রাজু ওদিকে তখনো বেজায় খুশি, কালুকে বুড়ো আঙুলে কলা দেখাতে দেখাতে বলে, 'নে চালা এবার। আমাকে চালাতে দিলি না যেমন সেইজন্যেই তো, নে, এবার!'

মা এই ছেলেমানুষদের কাকে দোষ দেবে? সে নিজেই ওই ক্ষেপে যাওয়া বলদদের শান্ত করতে পারে না।

নাথাকে শেষ পর্যন্ত আসতেই হল।

ওধারে ঘোড়ায় চড়ে রাজুর মামা আসছিল এদিকে, রণছোড়ের লাঙলের পাশে এসে ঘোড়া থামায় সে। হাত বাড়িয়ে ভাইঝি-জামাইকে সম্ভাষণ জানায়। কালুদের ক্ষেতের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে, 'ওখানে ও কিসের গোলমাল রণছোড়জী ?'

গোলমালেরই ব্যাপার বটে। কালুর মা লাঙল উঠিয়ে নিয়ে আসছিল, কোদর আর রাজু তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে, আর নাথা বলদদের শান্ত করে জুয়াটা ঠিক করে বাঁধতে চেষ্টা করছিল। কালুর হাতে দড়িটা কেটে বসেছিল, সে সেই ব্যথায় হাত বোলাচ্ছিল।

রণছোড় বলে, 'জানেন না বুঝি ? আপনার বেয়ান ভীলেদের বউয়ের মতো কোমরে কাছা বেঁধে এবছরে ভুট্টা চাষ করছে না ? জামাই লাঙল চালাচ্ছিল তাই বলদ ঘাবড়ে গেছে। আমাদের নাথা শেষ অবধি পৌঁচেছিল তাই রক্ষে, না হলে তো—'

নাথা বলে ওঠে, 'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।'

'চুপ করে বসে থাক, বাজে বকিস নি।' রণছোড় চোখ গরম করে।

ঘোড়ার ওপর বসে মামা ওই হট্টগোলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চিৎকার করে হাঁক পাড়ে, 'এই কোদর এদিকে এসো, রাজুড়ী এদিকে।'

মামাকে দেখতে পেয়েই দুজনে দৌড়ে যায়, 'মামা এসেছে···মামা এসেছে।' রাজু কাছে গিয়েই বলতে থাকে, 'আমাকে ঘোড়ার ওপর বসাতে হবে মামা···মামা আমি বসব···মামা আমি !···'

মামার মুখ তখন রাগে ফুলছিল। আদর করার বদলে ধমক লাগায় তাদের, 'ওখানে করছিলে কী হতভাগা, নিজেদের মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে অ্যাঁ···'

রাজুকে কোলে তুলে নিতে নিতে বলে, 'আর যদি কখনো ওখানে গেছ তো দেখবে কি করি !' আর কোদরকে নিজেদের মাঠের দিকে যাবার জন্যে বলে, 'যাও, গিয়ে সকলকে জল খাইয়ে এসো, মজুর বেচারারা জলতেষ্টায়—'

কোদর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'জল তো রাজু কালুকে সব খাইয়ে দিয়েছে, এখন কী নিয়ে আমি—'

মামা এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আপন মনে বলেন, 'রাজুড়ীকে তো—কী করতে পারি আর। দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। এখন সকলকেই মা.। .হঁট করতে হবে। ভোজ রাজার মেয়েকে আমাদের গঙ্গা তেলীর ঘরে পাঠাতে হল।' তারপর কোদরের দিকে ফিরে আবার বলে, 'যাও ওই ঘটি নিয়ে রণছোড়জীদের ওই ঘড়া থেকে জল ভরে নিয়ে যাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই যা! আয় ঘটি নিয়ে আয় ভরে দিই', রণছোড় বলে। খুড়শ্বশুরের কথাপ্রসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমারও ভাবনা হয় খুবই; মেয়েটাকে দেখে দুঃখ হয় যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা দেওয়া হয়েছে! আপনার ভাইঝি তো রোজই গজগজ করে! আর গজগজ করবে নাই-বা কেন? আত্মীয়-কুটুম্বিতা সমান সমান ঘরে হলেই ভালো লাগে; না হলে তাদের বাড়িতে পা দিতে মন—'

'মনের কথা ছেড়ে দাও, ও কথা তুলে আর কী হবে রণছোড়জী। আপনি দেখেছেন কখনো ওদিকে আমাকে? রাজুড়ীর পাকা দেখা আজ চার-পাঁচ বছর হল হয়েছে কিন্তু কুটুমদের বাড়ির দরজা কোন্ দিকে সেটার পর্যন্ত আমি খবর রাখি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা ঘোড়া ছোটায়।

কালুর মার সঙ্গে দেখা হলে, 'মনোর জী আসুন, কী খবর বলুন' বলে কালুর মা স্বাগত করতে এলে তাকে শুনিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, 'তা বেয়ান ঠিকই করেছেন। লাঙল চষে আমাদের সকলের মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট বাড়িয়েছেন।' কিন্তু সে কোনোই সাড়া দেয় না যেন কিছু শুনতেই পায় নি।

আর বেয়ানের ওপর মনের রাগটা সারা রাস্তা রাজুকে শোনাতে থাকে, 'খবরদার বলছি, যদি আর কখনো ওই মাঠেতে গেছ কি ওদের বাড়িতে খেলতে যাও তাহলে…তাহলে আর কখনো ঘোড়ার পিঠে

চড়াব না, বুঝলে !— দেখো দেখি একবার কাণ্ড ! এইটুকু ক্ষুদে মেয়ে—আর এখন থেকেই জল খাওয়ানোর জন্যে— যাক্ ঠিক আছে।' মনোর মামা শেষের শব্দগুলো নিজের মনেই বলে। আর এর পরে তো মনে মনেই গজরাতে থাকে কেবল।

॥ দশ ॥

কালবৈশাখীতে বসন্ত

কালুর হাত পয়মন্ত কিম্বা মা-ছেলের আপ্রাণ পরিশ্রমের ফল ইত্যাদি লোকে যে যাই বলুক-না কেন সে বছর কালুদের ফসল খুব ভালো হয়েছিল।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে তাদের ধারদেনা সব মিটে গিয়েছে। কিন্তু লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, 'চামচে এখন মাখন উঠেছে ভাই। ঘাসের দানা খাচ্ছিল এখন ভুট্টা খেতে শুরু করেছে।'

আর পরের বছরের ফসল থেকে পাওনাদারদের আসলের ওপর জমে ওঠা সুদ না হলেও অন্তত সুদের সুদটা মিটিয়ে ফেলা চলত, কিন্তু কালুর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাহানা তুললে যে, 'চুড়ি আর গলার হার খুবই হাল্কা ওজনের, এবার ওগুলো একটু ভারী দেখে করে দাও।'

কালুর মা বেয়ানকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে দেখে যে বেয়ানের কোনোই অভিযোগ নেই, অভিযোগ রাজুর মামার এবং সে পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়, 'আমাদের বংশমর্যাদা অনুযায়ী গয়না হওয়া চাই। আমি আর কিছু শুনতে চাই না। যদি তা দিতে পারেন তো জানাবেন আর না পারলে না বলবেন।'

রূপা বুঝতে পারে যে মামা যে-কোনো বাহানায় দোষ বার করতে চায়, উদ্দেশ্য সেই অজুহাতে এই পাকা দেখা ভেঙে দেওয়া। সে বেনে মুদিকে অনেক খোশামোদ করে খালি হাতে ফেরত পাঠায়, 'এখন তো আমার ছেলে চাষ করতে শুরু করেছে শেঠ, এই বছরটা একটু অসুবিধে রয়েছে। সামনের বছরে তো রোজগার করে কেবল আপনাকেই দেবার রয়েছে।' কিন্তু তৃতীয়বছরে বিয়ের ব্যবস্থা করার কথা ওঠে।

রাজুর মামার তো ইচ্ছে যে-কোনো উপায়ে এই পাকা দেখা ভেঙে দেওয়ার কিন্তু রাজুর মায়ের তাতে বিন্দুমাত্র সম্মতি ছিল না। 'রাজুড়ীর বাবা নিজের হাতে এই বিয়ের সম্বন্ধ করে গেছে, এ বিয়ে ভাঙব না।'

'দূর্, এ পাকা দেখা তো ফুলী-মার ভয়েতে করা হয়েছিল। এখন তো ফুলী-মা-ই নেই। স্বর্গ থেকে এসে তো আর তোমাকে খেয়ে যাবে না! আজ যদি গলাজী বেঁচে থাকত তা হলে সে নিজেই এ সম্বন্ধ ভেঙে দিত।...'

রাজুর মা তবুও মানতে রাজী হয় না। আর ওদিকে মামাও তার জেদ মোটে ছাড়বে না। বিয়ের দিন ঠিক করার সময় সে বোনকে আবার বোঝায়, 'এখনো ভেবে দেখ বোন। নিজের হাতে কি তুই এমন হীরের টুকরো মেয়ে কুয়োর জলে ফেলে দিতে চাস? কত আদর করে ভালোবেসে ওকে গমের আটার রুটি খাইয়েছিস আর এখন শ্বশুরবাড়িতে ঘাসের দানার রুটি খেতে খেতে গলা ছড়ে যাবে, বুঝলি। আমি যা বলছি শোন...এখনো সময় আছে, রাজী হয়ে যা তুই।'

রাজুর মার মন কিছুতেই সায় দেয় না এ ব্যাপারে। সে ঐ কথাই বলে আবার, 'তাঁর নিজের হাতে ব্যবস্থা করে যাওয়া সম্বন্ধ আমি ভাঙতে পারব না, তোমার যদি সেই ইচ্ছে থাকে তো তুমি নিজে করো তা...উঁহু! ও পাপ আমি আমার মাথায় নিতে রাজী নই।'

'তা তুই যদি মাথায় না নিতে চাস তো আমার আর গরজ কিসের?' বলতে বলতে মামা বাইরের দিকের বারান্দায় বেরিয়ে আসে। গাঁয়ের অন্য লোকেদের মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বসে ছিল, তাকে বলে, 'তা হলে লগ্নপত্রিকা লিখে ফেলুন মহারাজ; আমি আমার বাড়ির দিকে যাচ্ছি—একটু কাজ আছে। লগ্ন ঠিক করা হয়ে গেলে বরের বাড়িতে তা জানিয়ে আসবেন গিয়ে।'

গাঁয়ের লোকেরা— শংকর কাসম ধাঁচী প্রভৃতি ঘোড়ার পিঠে জিন চড়াবার সময় বাধা দেয় তাকে, যেতে বারণ করে কিন্তু তার

বোন কোনো আপত্তি করে না ; শুধু বলে, 'খেয়ে গেলে পারতে দাদা ?'

'অনেক খেয়েছি।' তার কথায় রাগ ঝরে পড়ে।

এমনিতে তো বোনের দাদার রাগের কারণ বুঝতে কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু কী করতে পারে সে ? দাদাকে খুশি করার একটাই উপায় ছিল, যে লগ্নপত্রিকা লেখা হচ্ছিল সেটাকে বন্ধ করে দাদার পছন্দমতো অন্য কোনো ছেলের নামে লগ্নপত্রিকা তৈরি করানো।

কিন্তু তা কী করে হতে পারে ? যেদিন থেকে দাদা এই সম্বন্ধ বদলানোর কথা উঠিয়েছে তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক বার— জেগে থাকলে কল্পনায় ও শুয়ে থাকলে স্বপ্নে মৃত স্বামী তাকে বলেছে, 'দেখো ! আমি ধন দৌলত দেখে মেয়েকে দিই নি। ও তো দিনের মতো— দিনের ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী। সত্যি বলতে কি আমি বংশ দেখেছি। কুটুমদের সদ্‌ভাব লক্ষ্য করেছি আর দেখেছি পাত্রকে। তা ছাড়া মেয়ে জাত মানিয়ে নিতেই জন্মেছে— তাই লোকেদের এ বিষয়ে কথা ওঠানোর সুযোগ না দিলেই পারতিস। আমার— মরা মানুষটার দেওয়া কথা না ভাঙলেই—'

এইজন্যেই ভাইয়ের রাগের কারণ অনুমান করতে পারলেও কিছুই না জানার না শোনার ভান করে থাকতে হয় তাকে।

প্রায় সারা গাঁয়ের লোক উপস্থিত ছিল কেবল পরমা মোড়লের বাড়ি থেকে রণছোড়ের বউ শাশুড়ীর অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করেই এসেছিল। পরমা মোড়ল অবশ্য অন্য গাঁয়ে যাবার জন্যে দুদিন আগেই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

রণছোড়ের স্ত্রী পিসিকে (রাজুর মা) বলে, 'কাকাকে ফিরিয়ে আনুন-না পিসিমা, রাগ করে মেয়ের বিয়ের সময়েও আসবে না।'

'উনি বয়সে বড়ো, না এলে আর কী করব। কিন্তু আমার দ্বারা রাজুর বিয়ের পাকা দেখা ভাঙা কখনোই সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, উনি যদি পাত্র বদল করতে চান তো নিজে করুন।'

'সেভাবে বদলাতে কি উনি রাজী হবেন?' তবু ভাইঝির ইচ্ছে ছিল কাকাকে একবার নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শাশুড়ী ও স্বামীকে দিয়ে বলিয়ে কালুর নামে লেখা এই লগ্নপত্রিকাকে বজলাতে রাজী করায়— সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সে বাইরে এসে দেখে কাকা ঘোড়ায় চেপে বসেছে। ঘোড়ার পেটে এমন জোরে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ দেয় যে ভাইঝি কিছু বলার আগেই···

ভাইঝি পেছন থেকে চিৎকার করতে থাকে, 'একটু তো দাঁড়ান কাকা, আমার কথাটা অন্তত শুনে যান···'

একে তো তেজী বলবান ঘোড়া, তার ওপরে পিঠে অর্ধেক বিরক্ত সওয়ারী, মুহূর্তে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ভাইঝি কাকার পেছনে দৌড়ানো ছেড়ে দিলেও সেই চিন্তাটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারে না, কোনো রকমে কাকাকে একবার বোঝাতে হবে যে ভাইঝির বিয়ের সম্বন্ধ বদলানো তার হাতেই রয়েছে আর এতে পাপের বদলে পুণ্যই হবে। ভাগ্নী কোনো ভালো ঘরে পড়লে গুণগানই করবে।

এই কথাটা সে স্বামীকে বলে বাড়িতে এসে। শাশুড়ী তো চটেই ছিল, তাকেও রাজী করিয়ে নেয়। শাশুড়ী এমন মেতে ওঠে যে খুশির চোটে ভুলেই যায় বাড়িতে এখন ঘোড়া নেই, বলে ওঠে, 'যা দেখি রণছোড়, ঘোড়া তৈরি করে এখনই বেরিয়ে পর, মনোরজীকে ফিরিয়ে আন।'

রণছোড় চটে যায়, 'নিয়ে তো আসব, কিন্তু ঘোড়া কোথায়? বুড়োর কি এমন সুবুদ্ধি হবে যে ঘরে ফিরবে এখন—'

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে মালী বুড়ো পরমাকে বেশ একচোট গাল পেড়ে নেয়···ঘরের বাইরে এসে পাড়ার রাস্তার দিকে তাকাতে থাকে। চঞ্চল নাড়ীর গতিবেগ বেড়ে যায়, 'আহা ঠাকুরের ইচ্ছেয় যদি কোনো ঘোড়া এখন এসে পড়ে!'

কিন্তু দেখতে পায় ঘোড়ার বদলে শংকর, কাসম প্রভৃতি 'শুভ-

কাজে বিলম্ব কেন' চিন্তা করে গোল পাগড়ীওলা ব্রাহ্মণ সমেত লগ্ন-পত্রিকা নিয়ে এদিকে আসছে।

মালীর গমের মতো সোনালি চেহারায় কাজল ছেয়ে যায় যেন।

আর ব্রাহ্মণকে দেখে রূপার চেহারা খুশিতে কুমকুমের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ব্রাহ্মণকে খাটিয়ায় বসিয়ে গাঁয়ের লোকেদের কাছে ছুটে যায়, 'চলুন বোন, লগ্ন-পূজার আয়োজন করতে হবে।'

বিয়ের লগ্ন-পুজোতে আসল আনন্দ তো এই-সব যুবতীদের, গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাস উতরোলে আসর মাতিয়ে রাখে তারা। যাদের নিজেদের বিয়ে তারা তো সাত-আট বছরের ছেলেমানুষ— তাদের কাছে ব্যাপারটা একটা খেলার ব্যাপার— মনোরঞ্জনের বিষয়। আর মা-বাবা আনন্দের চেয়ে এই দায়দায়িত্ব উদ্ধারের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন বেশি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালুদের বাড়ি গ্রামের যুবতীদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠল, ঠিক যেন কোনো গাছের নীচে একপাল সৎভাইরা জমা হয়েছে।

একে তো গরমের ছুটির দিন তার ওপরে বিয়ের ব্যাপার; তাও আবার মরসুমের প্রথম বিয়ে। লগ্ন-পুজো শেষ হতেই যুবতীরা উঠোনে ভিড় জমায়। যুবকেরাও একে একে এসে জড়ো হয়ে গানে যোগ দিতে থাকে।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল বারান্দার খাটিয়াগুলো দখল করে। গাঁয়ের নাপিত উঠোনের এক পাশে আগুন জ্বালিয়ে হুঁকো সাজতে শুরু করে দেয়…

ঠিক সেই সময়েই যমনার স্বামী— কালুর পিসেমশাইয়ের ঘোড়া টগবগ করতে করতে এসে পৌঁছয়। কালুদের উঠোনে জায়গা না থাকায় পরমাদের উঠোনে ঘোড়াটা বেঁধে রাখে। ওটাও তো তার শালা-সম্বন্ধীদের বাড়ি। পিসেমশাই কালুদের বাড়িতে এসে সকলকে কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর খাটিয়ার বাজুতে বসে।

মালীর শরীরে আগুন তো জ্বলছিলই, এই 'উপকারী' আত্মীয়

এসে তাতে যেন ঘৃতাহুতি দেয়। তার ছটফটানি আর বকবকানি একেবারে তুঙ্গে পৌঁছে যায়!

কিন্তু তার সেই বকবকানি এখানে কারোর কানে এসে পৌঁছলে তো? আশপাশের ক্রোশ-দুই অঞ্চল যুবক-যুবতীদের গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে, তার কাছে মালীর চিৎকার দাঁড়াতে পারে কখনো?

যৌবন যেন প্রমত্ত হয়ে ওঠে। খড়ের তৈরি আটচালার ছাতের আচ্ছাদনে সব জায়গাটা ছায়া হয় না, কিন্তু গানে মত্ত গায়ক-গায়িকা-দের তখন কোনো কিছুতেই খেয়াল ছিল না। বর্তমানকেই ভুলে গেছে সকলে। মাথার ওপরে রোদের তাপের কে আর পরোয়া করে তখন? গানের পর গান চলে আর সেই গানটায় তো কল্পনার সেই জীবন ছবির মতো ফুটে ওঠে:

উগমনী ধরতী মাঁ কেসর উড়ে ছে ও রেশমা!
উগমনী ধরতী মাঁ কেসর উড়ে ছে রে লোল।
মীং জাহ্ন্যুং ননদীনো বীরো আবে ছে ও রেশমা!
মীং জাহ্ন্যুং ননদীনো বীরো আবে ছে রে লোল।

(পুব দিকের মাটিতে ধুলোর সাথে আবির উড়ছে রেশমী, আমার মনে হচ্ছিল যেন ননদের ভাই আসছে।)

প্রত্যেক যুবতীর মনের অবস্থা তখন যেন তারা সকলেই প্রবাসী স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে— সিঁদুরের মতো রক্তরাঙা প্রভাত দেখে আশায় বুক বেঁধেছে, কল্পনার স্রোতে ভেসে চলেছে—

মীং জাহ্ন্যুং বংগড়ীও জোড়ী লাবে ছে ও রেশমা!
মীং জাহ্ন্যুং বংগড়ীও জোড়ী লাবে ছে রে লোল।

(আমি ভাবছিলাম সে আমার জন্যে এক জোড়া চুড়ি নিয়ে আসছে।)

যুবকেরাও যেন তাদের পথ-চেয়ে থাকা পত্নীদের বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে উঠতে থাকে। এই গায়িকাদের মধ্যেই তার মনের মতো কোনো সুন্দরী কেউ হয়তো তাকে তীব্রভাবে কামনা করছে এমন কথাও কেউ কেউ কল্পনা করে থাকবে···সে যাই হোক, এটা ঠিক যে এই যুবক-যুবতীরা তাদের কাণ্ডজ্ঞান ভুলে গিয়েছিল এবং

অন্য কোনো নির্জন জগতে বিচরণ করছিল তাদের মন—

আথমনী ধরতী মাঁ ধূল উড়ে ছে ও রেশমা !
আথমনী ধরতী মাঁ ধূল উড়ে ছে রে লোল ।
মীং জান্যুং ননদীনো আবে ছে ও রেশমা !
মীং জান্যুং ননদীনো বীরো ছে রে লোল ।
মীং জান্যুং ফাগ ণিয়ুং ফক্কড় লাবে ছে ও রেশমা !
মীং জান্যুং ফাগণিয়ুং ফক্কড় লাবে ছে রে লোল ।

(পশ্চিম দিগন্তে ধুলো উড়ছে রেশমা । আমি ভেবেছিলাম ননদের ভাই আসছে । আমার মনে হয়েছিল সঙ্গে সে দোল খেলার জন্যে সুন্দর উড়নি নিয়ে আসছে ।)

এই গানের জন্যে কিম্বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক-না-কেন কালুদের বাড়ির উঠোনে উপস্থিত কেউই বোধ হয় জানে না তখন দুপুরের নিদাঘ প্রহর । এমন-কি, প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের হৃদয়ে এই ঘোর গ্রীষ্মে বসন্তের মলয় সমীর প্রবাহিত হয় ।

কিন্তু সামনেই মালীর বাড়িতে এই গীত-গুঞ্জন-মুখরিত আবহাওয়া গরম যেন চারগুণ বাড়িয়ে দেয় ।

যেন সেই গরমের তেজ আর সহ্য করতে না পেরেই রণছোড় বাইরে বেরিয়ে আসে । বাইরে এসেই সে পিসেমশাইয়ের ঘেমে-নেয়ে যাওয়া ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে । ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে গুঁতো দিতে দিতে হাঁক দিয়ে বলে 'পিসেমশাই, আপনার ঘোড়াটা কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে গেলাম ।'

রণছোড় এগিয়ে যেতে থাকে কিন্তু সেই গান যেন তার পিছু নেয় । পাড়ার রাস্তায় তো শোনা যাবেই কিন্তু মাঠেতেও— আধ ক্রোশ দূরে পাহাড়ের টিলার ওপরে চড়ার সময়ে পর্যন্ত নিস্তব্ধ শীতের রাতে যেমন পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায় তেমনি শোনা যেতে থাকে—

দখণাত্য বাবলিয়া বাবা মাংড়য়া ছে বে লোল !
দখণাতো বাবলিয়া বাবা মাংড়য়া ছে বে লোল !
মীং জান্যুং নণদীনো বীরো ··

মীং জান্ন্যাং কমখাণাং কামণ লাবে ছে ও রেশমা !

(দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে রেশমা ! আমি ভেবেছিলাম ননদের ভাই মনোমোহিনী কাঁচুলী নিয়ে আসছে।)

কিন্তু শেষ চরণগুলো শুনতে পাওয়ার আগেই রণছোড় টিলাটাকে ডিঙিয়ে ওপারে চলে যায়। তাতে একদিক থেকে ভালোই হল, না হলে অন্তরের জ্বালা শেষ অবধি কী অবস্থায় যে দাঁড়াত কে জানে !

মীং জান্ন্যাং কালজড়ে কামণ লাবে ছে রে লোল,
ওতরাতী ধরতীনাং বাদল উঠে ছে ও রেশমা !
ওতরাতী ধরতীনাং বাদল উঠে বে লোল।
মীং জান্ন্যাং ননদীনো বীরো···
মীং জান্ন্যাং মনড়াংনো মোর লাবে ছে ও রেশমা !
মীং জান্ন্যাং দলড়াংনো চোর আবে ছে রে লোল।

(উত্তর দিগন্তে মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে রেশমা। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তরে প্রেমের মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে ! আমি ভেবেছিলাম সে মন-ময়ূরী নিয়ে আসছে। আমি জানতাম আমার হৃদয়-চোর আসছে।)

গান থামার পর কিছুক্ষণের সেই স্তব্ধ শান্তির অবসর দেখে সত্যি-সত্যিই মনে হচ্ছিল, গায়ক আর শ্রোতা উভয়েরই অন্তরের সেই কাল্পনিক রঙিন জগৎটাকে কেউ যেন চুরি করে নিয়ে চলে গেছে।

॥ এগারো ॥

কুলাঙ্গার

রণছোড় যখন মনোরের বিরাট উঠোনের একধারে আটচালার নীচে ঘোড়াটাকে বাঁধে তখন চৈত্রের সূর্য অস্ত গেছে। তার মানে এ নয় যে রোদের গরমও চলে গেছে— কারণ তীব্রভাবেই লু বইছে আর সমস্ত প্রাণীর গায়ের চামড়া যেন সেদ্ধ করে দিতে থাকে। আশে-পাশে তাই কোনো পাখি দেখতে পাওয়া যায় না। কুকুরগুলো পর্যন্ত পুবমুখো দরজাওলা বাড়ির সামনে চান করার পাথরের চাতালের পাশে গর্ত খুঁড়ে চুপ করে পড়ে ছিল। লোকজন সকলেই বাড়িতে ঘরের মধ্যে ছিল, পুরুষেরা তো গোয়াল এবং ভেতরের ঘরে পর্যন্ত খাটিয়া বিছিয়ে নিয়েছিল।

মনোরের বাড়ির বিরাট বারান্দা, বারান্দার থামের কারুকাজ, পাঁচ-পাল্লা-দেওয়া দরজায় পেতল পাত ও পেতলের কড়া লাগানো ইত্যাদি দেখে বুঝতে পারা যায় এটা কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ি। কিন্তু বাড়ির অবস্থা দেখে দর্শককে এও বলতে হয় যে যেমন বাড়ি ঠিক তেমন ধরনের মানুষ এ বাড়িতে থাকে না, তা না হলে···

হাত ত্রিশেক লম্বা সেই বারান্দার উত্তর দিকের ঘরগুলো ভাঙা-চোরা অবস্থায় রয়েছে। আশপাশে পড়ে থাকা ছাই দেখে মনে হয় এখন ঘরগুলো ছাই রাখার কাজেই কেবল ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ভাঙা লাঙল, গাড়ির চাকা, ভাঙা খাটিয়া এবং অন্য নানান বাতিল আবর্জনার ভাঁড়ার ঘর যেন। কুকুরদের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। রোজকারের ব্যবহারের দু-তিনটে খাটিয়া এদিকে ওদিকে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। উঠোনের মাঝে মাঝে খুঁটি পোতা দেখে বুঝতে পারা যায় রাত্তিরে তাতে গোরু বাছুর বাঁধা হয়। এরপরে দুটো খাটিয়া রাখা চলে এমন জায়গা মাটি লেপে চাতালের মতো করা আর এর পরেই বাড়ির মাঝখানে সদর দরজা।

দক্ষিণ দিকের অবস্থাও প্রায় এই একই ধরনের। রোয়াকের বাইরের দিকে দেওয়াল তুলে হাত-দশেক জায়গা ঘিরে নিয়ে ভাঁড়ারের মতো জায়গা করা হয়েছে। যেখানে একটা গোটা লাঙল, বলদের কাঁধে লাগাবার কাঠের বাটাম টাঙানো ছিল। গোরুর গাড়ির সামনের দিকের বাটামও খানিকটা জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে আর একটা ধুনি উনুন ছিল তার পাশে। সেটার অবস্থা দেখে মনে হয় এই গরমের দিনে সেটাকে বোধহয় ব্যবহার করা হয় না।

রণছোড় রোয়াকে উঠেই ঘেরা বারান্দার দিকে তাকায়। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'কেউ ঘরে আছে নাকি?' চোখ ধাঁধিয়ে থাকার জন্যে ভেতরের দরজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

দরজা খোলাই ছিল। হাত দশ-বারো লম্বা-চওড়া উঠোনের একধারে একটা ছোটো চাতাল নিয়ে গোয়াল ঘরের সীমানা টানা ছিল, অন্যধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে রান্নার জায়গাটা আলাদা করে দেওয়া। চাতালের যে-দিকটা খড়ের দেওয়াল তোলা সেই দেওয়াল ঘেঁসে জাঁতা রাখা রয়েছে আর চত্বরের মাঝখানে ধান-চাল কোটার হামান দিস্তা মাটিতে গর্ত করে বসানো হয়েছে।

রণছোড় যে-সময়ে যায় তখন হামান দিস্তেতে ধান পড়ে ছিল। পাশে আধমনী মুগুরটা পড়ে আর অন্য ধারে মনোরের ছেলের বউ মেঝেতে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল। কোলের ছেলেটাও পাশে শুয়ে।

রণছোড়ের গলার আওয়াজে যুবতীর ঘুম না ভাঙলেও বাঁশের বেড়ার দিকে পাতা খাটিয়ায় শুয়ে থাকা মনোরের বৃদ্ধা স্ত্রী জেগে ওঠে। খাটিয়া থেকে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলে, 'ওমা তাই তো, আসুন ভেতরে আসুন রণছোড়জী। এই ভীষণ রোদ্দুরে কী মনে করে? যান পেছনের ঘরে আপনার কাকা হুঁকো খেতে খেতে এইমাত্র বোধহয় শুয়েছে।'

সত্যিই তাই। ঘোর অন্ধকার ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা সুন্দর হুঁকোটার কলকের আগুন যেন এক চোখ জ্বেলে মুখ মুচকে হাসছিল। 'আপনার কাকা' বলাতে মনোরও

জেগে গিয়েছিল। নরম তুলোর গদিতে বসে ছিল সে। জিজ্ঞাসা করে, 'কে ওখানে ভাই?'

'আজ্ঞে আমি, রণছোড়।'

এধারে শাশুড়ী বউকে ডেকে তোলে, 'ও মোংধী বউ ওঠো দেখি! চাল কুটতে কুটতে ঘরের মধ্যেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছ, লোক-জনের আসা-যাওয়ার একটু খেয়াল রাখবে তো।'

'কেন, এখন আবার বরযাত্রী কেউ আসবে নাকি?' বউ উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে।

'তোর মামাতো ভাই— রণছোড়জী এসেছে। বিশ্বাস না হয় তো পেছনের ঘরে গিয়ে দেখে আয়।'

মোংধী কালুর পিসীমা যমনার মেয়ে।

মোংধীর উঠে দেখে আসার প্রয়োজন ছিল না। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে যে সত্যি সত্যিই রণছোড়ই এসেছে। কিন্তু এ কথা বোঝবার পরেও মোংধী কোনো আনন্দ প্রকাশ করে না বা তাকে আদর আপ্যায়ন করতেও ওঠে না। তার মুখে একটা বিরক্তিকর ভাব ফুটে ওঠে, 'উনি ওনার শ্বশুরবাড়ি এসেছেন এতে আর অবাক হবার কী আছে?' এই বলে সে জল খেয়ে হামান দিস্তের মুষলটা হাতে তুলে নেয়।

মনোর কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য হয়। জিজ্ঞেস করে, 'কে রণছোড়জী নাকি?…কি ব্যাপার, এই রোদ্‌দুরে? কিছুক্ষণ আগেই তো আমি—'

রণছোড় কাপড়ের কোঁচায় মুখ মুছতে মুছতে খাটিয়ার পায়ের দিকটায় বসে। কথার মধ্যেই সে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, অল্পক্ষণ আগেই আমাদের দেখা হয়েছে। খুব জোর ঘোড়া ছুটিয়ে আসছি কিন্তু…'

মনোরের মাথায় একসঙ্গে অনেক ভাবনা এসে জমা হয়, 'রেগে চলে আসার জন্যে বোনের কিছু হল কী, নাকি এই লগ্ন লেখা বন্ধ রেখে মেয়ের অন্য কোথাও বিয়ে দিতে—'

'কী এমন দরকার পড়ল যে ঝলসানো দুপুরে আসতে হল?'

'যে কাজের জন্যে আপনি গিয়েছিলেন আমি সেই কাজের জন্যেই

আসছি···।' রণছোড় হেসে জবাব দেয়।

মনোর ভাবনায় পড়ে, 'আমি তো কোনো কাজের জন্যে যাই নি, আমি তো এমনিই···'

রণছোড়ের বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুটা কম তো বটেই তা ছাড়া এই ধরনের ব্যাপার ও কথাবার্তায় তার কোনো ধ্যানধারণাই ছিল না। কিভাবে কথা শুরু করতে হয় আর কী করে বোঝাতে হয় তার কিছুই জানে না সে। সে ঠাট্টা করে বলে, 'কেন ? আপনিই তো রাগ করে এলেন উঠে, তাও কিছু বুঝতে—'

মনোর চটে ওঠে, 'হ্যাঁ তা এসেছিলাম কিন্তু তাতে হলটা কী ? মেয়ের বিয়ের লগ্ন-পত্রিকা লেখা কি বন্ধ করা হয়েছে নাকি ?'

'না, লগ্নপত্রিকা লেখা হয়েছে এবং ছেলের বাড়ি পুজোও হয়ে গেছে।' মনোরকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলে, 'কালিয়ার মার তো এখন দারুণ অবস্থা, এটা করব কী ওটা করব, কিছুই ঠিক করতে পারছে না।'

রণছোড় এত জোরে কথা বলছিল যে হামান দিস্তেতে ধান কুটতে কুটতেও মোংঘীর কানে দু-একটা শব্দ এসে ঢুকছিল। শাশুড়ী তো শোনার জন্যে দরজার পাশে এসে বসে।

'তা আনন্দ হবে না কেন ভাই বলো !' মনোর বলে।

'ঠিক আছে, তা না-হয় হল, তা হলে লগ্নপুজোর জন্যে ঐভাবে গান আর হল্লা—'

'তুমি তো অদ্ভুত লোক দেখছি ! একমাত্র ছেলে আর তাও···'

'কিন্তু আমাদের তো বাড়ির দরজার সামনেই জ্বলেপুড়ে মরতে হবে যে ! আপনারা সব আত্মীয়স্বজনে মিলে ··'

'কেন, নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি ?' মনোর তখনো আসল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিল না।

'যেদিন থেকে পাকা দেখা হয়েছে সেদিন থেকেই ধরে নিন। ঐ ফুলী-মার ছেলে শংকর তো গোঁফে তা দিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে তার মামাকে এই কাঠফাটা রোদ্দুরে তাড়িয়েছে, পঞ্চায়েতের সভা করতে

চেয়েছিল তাই।'

'আ—চ্ছা!' মনোর এমন মোটা বিকৃত স্বরে হুংকার দিয়ে ওঠে যে মোংধী, 'কিছু একটা ব্যাপার চলেছে' ভেবে ধান কোটা ফেলে শাশুড়ীর আড়ালে লুকিয়ে শুনতে থাকে।

'আমার মা বলেছে যে আগুন লাগার এই তো সবে শুরু, আর আপনার ভাইঝি (রণছোড়ের স্ত্রী) তো লগ্নের সময় থেকেই কান্না জুড়ে দিয়েছে।—'

'কেন?'

'কেন আবার, ভাগ্নীকে দুঃখের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে— সারা জীবন তাকে তাই দেখতে হবে আর চোখের জল ফেলতে হবে কিনা!' কে জানে কী করে যে রণছোড়ের জিভে মা সরস্বতী এসে ভর করলেন।

'ভাই সব-কিছুই তো জানছি বুঝছি। আমাকে অত ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু এখন আর এর কী করা যেতে পারে? আপনিই তো বললেন যে বরের বাড়িতে লগ্ন পৌঁছে গেছে।'

'লগ্ন পৌঁছে তো গেছেই। সুবিধে হলে হয়তো আজই বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সারতে গণেশ পুজোর আয়োজন করবে।' মনোরকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, 'ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার তো তাই মনে হল।'

মনোর শুকনো হাসি হেসে বলে, 'তবে তো সব শেষ হয়েই গেল।' দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হুঁকোটা উঠিয়ে নিয়ে বলে, 'এখন তো সব-কিছুই হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে ভাই।'

'বেরল আর কোথায়?' রণছোড় পায়ের ওপর পা তুলে হাসির ভঙ্গিতে বলে, 'আসল মজা তো এবার হবে।'

'কিভাবে?' ছিলিম খালি করতে করতে মনোরের হাত থেমে যায়।

'কী করে আবার…হুঁ…। গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পরও যদি

বরের বিয়ে আটকানো যায় তবেই আপনার আমার মান থাকে।'

রণছোড়ের কথাবার্তা মনোরের কাছে নেহাতই ছেলেমানুষের মতো লাগে, 'হুঁঃ, আপনার ভাবখানা যেন আপনাকে-আমাকে এখানে বলার কেউ নেই।'

মনোরের স্ত্রী আর না বলে থাকতে পারে না, 'আরে বাপ রে, তা হলে তো পঞ্চায়েৎ আমাদের একচোট দেখে নেবে, গায়ে-হলুদ দিয়ে বর কখনো কোথাও রয়ে গেছে নাকি?'

শাশুড়ীর পেছেনে লুকিয়ে কথা শুনতে শুনতে ছেলের বউও খুশি হয়ে ওঠে।

'অন্যদের সমাজে এমন অনেক থেকে গেছে।'—রণছোড় বলে ওঠে—'বলেন যদি তো গুনে দেখাতে পারি—'

'কিন্তু আমাদের সমাজে তো—'

'হ্যাঁ···ওটাই যা শুধু একটু গণ্ডগোল রয়েছে।' বলতে বলতে রণছোড় এবার জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে মজাটা কিরকম একবার হয় বলুন দেখি?'

এই-সব কথাবার্তায় মনোর বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে না। তাই সে হুঁকো ভরতে ভরতে কেবল বলে, 'দিন-ক্ষণ-লগ্ন স্থির হয়ে যাওয়া বিয়ে আটকাতে গেলে হাজার লোকের জবাবদিহি—'

'জবাবদিহি করার লোকেদের মুখ···' রণছোড় কোমরে বেঁধে রাখা টাকার থলিটা একটু নাড়িয়ে বলে, 'এই ঝনৎকার ঠিক বন্ধ করে দিতে পারবে।'

মনোর তো রণছোড়ের মুখের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে দেখে। মনে হয় যেন জিজ্ঞাসা করছে, 'কথাটা তা হলে এদ্দূর গড়িয়েছে!' তার সারা শরীরে আশা আর আনন্দের রেখা ঝিলিক দিয়ে ওঠে যেন।

ওদিকে মোংধীর চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তার লাল গোলাপি চেহারা তুলোর মতো সাদা হয়ে ওঠে। কথাটা শুনেই যেন তার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে যায়।

'আপনার পিতাজীকে জিজ্ঞাসা করেছেন ? তিনিও কি—'

'তিনি তো এখন বাড়িতেই নেই, আর তাঁকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই—'

'তা হলে ?'

'আরে আপনার তাঁর সঙ্গে দরকারটা কী ? অ্যাঁ ?···বুড়ো এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না।'

'তা হলে তাই বলুন-না যে এতে তাঁরও সায় রয়েছে—'

'না, তাঁর এতটুকুও মত নেই বা ইচ্ছে নয়। বরঞ্চ তাঁর কাছে কালিয়া ছেলের বাড়া। তবে হ্যাঁ··· তিনি এটুকু জানেন যে বাড়ির লোকেরা যদি বাদ সাধে তো বাড়ি ছাড়া ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই ব্যাপার··· শংকর আমাকে বলে যে তোমাকে ছাড়াই যখন পাকা দেখার কাজ হয়েছে তখন তোমাকে বাদ দিয়ে বিয়েটাও আমরা করাব। ঠিক আছে, দেখা যাক ফাজিল! আমার মা তো এ পর্যন্ত বলেছে যে সমস্ত ঘটিবাটি পর্যন্ত দেনার দায়ে বিকোতে রাজি আছি কিন্তু কালিয়াকে গায়ে-হলুদ দেবার পরেও একটু ঘুরিয়ে মারতে হবে।'

'হ্যাঁ, এমনি করতে পারলে বেশ হয়।' মনোরকেও নেশায় পেয়ে বসে—'নাহলে আপনি যদি একবার তোড়জোড় করে ফের সব ছেড়েছুড়ে সরে দাঁড়ান তা হলে কিন্তু আমাদের তাড়াহুড়ো করে মেয়েকে দিতে হবে। আত্মীয়কুটুমদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে এবং শুধুশুধু সবাই বেইজ্জত হবে।'— কে জানে কেন হঠাৎ মনোর বদলে যায়, তার গলার স্বরও, 'না ভাই না! ও-সবকথা বাদ দাও।'

রণছোড়ের মনে হল যেন তীরে এসে নৌকোর তলা ফুটো হয়ে গিয়ে ভরাডুবি হল। সে বলে ওঠে, 'কেন কেন ? আপনার কি আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'বিশ্বাস তো আছে কিন্তু' সোজাসুজি সে রণছোড়ের মুখের দিকে

তাকিয়ে বলে —'কতটা খরচা করতে রাজি আপনি এ ব্যাপারে ?'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস না হয় তো এই নিন', রণছোড়। কোমরের থলি খুলে ফেলে—'এই পাঁচ কুড়ি টাকা—' তারপর ডান হাতটা উঁচু করে তুলে বাহুতে প'রে থাকা সোনার বালাটা খুলে দিতে দিতে বলে, 'এটাও আপনার কাছে রাখুন। এবার সব ঠিক আছে তো ? এবার দেখুন-না কী করি। আপনি শুধু—'

মনোর অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে, রণছোড়ের থেকেও তার আনন্দের মাত্রা বেড়ে যায়। পয়সা যার নষ্ট করার ইচ্ছে সে নষ্ট করছে, কিন্তু ফাঁকতালে তার কাজটা হয়ে যাবে। সে বলে, 'ব্যস্, আর আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু এখনই চললেন কোথায় ? একটু সবুর করুন। বসুন।'

রণছোড় বসে পড়ে, 'হঁ্যা বলুন তা হলে !'

মনোর চিন্তা করতে করতে বলে, 'ধরুন এদিকের ব্যবস্থা নাহয় ঠিকমতো করা গেল, তারপরেও আমাদের মেয়ের জন্য একটা বর দরকার তো ?'

'তাও আমি আর আমার মা ভেবে রেখেছি।'

'সে তো দশগুণ ভালো কথা। কিন্তু সময়মতো ঠিক পাওয়া যাবে তো ? তা নাহলে আবার—' মনোর যেন আপন মনে কথা বলে।

'আরে পনেরো গুণ ভালো বলে ধরে নিন।' বলে রণছোড় হাসতে থাকে।

'বরের একটু খবর বলুন শুনি !'

'আমার ভাই নানিয়া।'

'দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে নাকি ?' মনোর হতবাক্ হয়ে যায়। রণছোড় হেসে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

'পাগল হলেন নাকি ?' মনোর বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'সতীনের ব্যাপারে কোনো কথাবার্তাই বলবেন না। অন্য কোনো পাত্র সন্ধানে থাকে তো বলুন—' সে হুঁকো টানতে শুরু

করে দেয়।

'সতীনের কথা বলছেন কেন? আপনি কি জানেন না? নানিয়ার বউকে প্রথমবার ঘরে আনার পর সেই যে ফেরত পাঠানো হয়েছে এই তিন বছরে তাকে নিয়ে আসার জন্যে আর কোনো খবর কি আমরা পাঠিয়েছি? আর তাকে আনাও হবে না। এমনিতে তো খোঁড়া কিন্তু মেজাজ আছে ষোল আনা।'

মনোরের এ কথাটা পছন্দ হয়। পরমাজীর মতো সম্ভ্রান্ত ঘর আর বরও— নানাকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু পরিণামের কথা ভেবে সে আবার একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে, 'আপনি ভালো মানুষ, কেন এই-সব গোলমাল পাকাতে চাইছেন? সমাজের সবাই যে আপনাকে পরে দুষবে।'

'সে দুষুকগে যাক। আমার মা তো এ কথা পর্যন্ত বলেছে যে দরকার পড়লে জমিও বিক্রি করে দেবে। কিন্তু কালিয়ের জন্যে যে কনে ঠিক করে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে নানিয়ার বিয়ে দিতেই হবে।'

'সে আপনি জানেন। আমার তো মনে হচ্ছে যে আপনি যতই পয়সা ঢালুন তবু—' একটু চুপ করে থেকে আবার স্বগত বলে ওঠে 'আমার তো মনে হয় না যে ব্যাপারটা খাটবে শেষ পর্যন্ত।'

'পুরোপুরি খাটবে! দিন দেখি একবার হুঁকোটা টানতে আমাকে। আজ রাত হবার আগেই কথামতো সব কাজ হওয়ার খবর না আনি তো কী বলেছি…'

'কিন্তু দেখুন, একটা কথা আমি বলে রাখতে চাই। পঞ্চায়েৎ বিচারে যে জরিমানা করবে, আমার বোনের ওপরে, এবং আমার ওপর হয়তো করবে না কিছু, কিন্তু তবু যদি কিছু করে সে-সব টাকা আপনাকে মেটাতে হবে কিন্তু ভাই। পরে যে বলবেন এমন কোনো কথা হয় নি।…'

'লেখাপড়া করি নি তাই, না হলে লিখে সম্মতি দিয়ে দিতেম। তবুও যদি কোনো চিন্তা থাকে তা হলে পঞ্চায়েৎ তো আপনার বোনের বাড়িতেই বসবে, তখন একবার আমার বারো তোলা ওজনের

হাঁসুলীটা প'রে নিয়ে পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলবেন ; কী এবার ঠিক আছে তো সব ?'

মনোর এ কথাটা খুব বেশি গায়ে মাখে না। হুঁকো সেজে রণছোড়ের হাতে দিতে দিতে তাকে বলে দেয় কার কার সঙ্গে এ ব্যাপারে দেখা করতে হবে কার কতটা ক্ষমতা এবং কোথায় কত দিতেথুতে হবে। তিনি নিজে তো কথাটা খানিকটা রটিয়েই দিয়েছিলেন যে, 'এতে আমার আর কী আছে বলুন ? আমি তো ঐ বেচারী বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যেই ছুটোছুটি করছি।—'

'আমাকে আর বলতে হবে না' বলতে বসতে রণছোড় উঠে দাঁড়ায়। হুঁকোটা ফিরিয়ে দেবার আগে যেন পথ-খরচার খোরাক জমা করার মতো দু-তিনটে লম্বা টান দিয়ে নেয়, 'দেখবেন আপনি, কী করি ! এখান থেকে সোজা পেথা প্যাটেলের বাড়ি এবং আপনার শুয়ে থাকতে থাকতেই আরো তিন-চারটে গ্রাম ঘুরে…'এই বলে সে ঘরের থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে বসে। রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যেতে থাকে—টগবগ তরবড়…তড়াক… তড়াক…

রণছোড় চলে যেতেই একদিকে স্ত্রী এসে স্বামীর কাছে বসে আর অন্য দিকে মোংধী দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চোখের জল ফেলতে থাকে।

তার পরেই হঠাৎ যেন কোনো উপায় বার করতে পেরেছে এমনি ভাবে জল রাখবার জায়গায় গিয়ে ঘড়া আর কলসী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

গাঁয়ের বাজারের আগেই একটা নদী ছিল। কুয়োর ধারে ঘড়া-কলসী রেখে সে সামনের নদীর তীরের দিকে এগোয়। মিনিট পনেরোর রাস্তা। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বাপের বাড়ি পৌঁছে যায়।

কিন্তু এ কী ব্যাপার ? উঠোনে চালার নীচে পরমা মামার ঘোড়া বাঁধা ছিল। সে ভাবে যে এই ঘোড়াতে রণছোড় এখানে এসে

গেছে। এই ঘোড়া কে এসে বেঁধেছে ভেবে ও পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখতে যায় সে মুখপোড়া এখানে আবার কী গল্প জুড়ে বসেছে। কিন্তু দেখে যে বারান্দায় বসে খোদ পরমা মামা হুঁকো টানছে। সে উঠোনের রোয়াকের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েক বছর বাদে পরমা মামাকে এখানে আসতে দেখেও 'কেমন আছেন' সে কথাও জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

'কী খবর রে খুকি ? নাতিটাকে না নিয়েই যে এলি ?' মা জলের কলসী-ঘড়া নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করে।

মোংধী কোনো উত্তর না দিয়ে কাঁদতে থাকে। বালামামার অনাথ ছেলে কালুর জন্যে দুঃখে মনটা ভারী হয়ে ছিল যেমন তেমনি এখানে পরমা মামাকে দেখে কী বলবে আর কী বলবে না ভেবে ঠিক করতে না পারাও কান্নার একটা কারণ।

সে আর কী করে জানবে যে পরমা মামা বর্তমানে কালুরই শুভাকাঙ্ক্ষী !

মা আর মামা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে থামায়। মামা বেচারী শশুর বাড়িতে কোনো ঝগড়াঝাটির ব্যাপার মনে করে নেয় — 'এমন আকছাড় হচ্ছে বোন ! ঝগড়া-গণ্ডগোল তো সবখানেতেই আছে।'

মোংধী নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলে, 'আমি আমার কোনো দুঃখের জন্যে কাঁদছি না মামা। বালামামার ছেলে কালুর দুর্ভাগ্যের জন্যেই তো কাঁদছি আমি।'

'কেন, কালিয়ার আবার কী হল কী ?' বুড়ো পরমা একেবারে হকচকিয়ে যায়, 'এই তো একটু আগে কে যেন খবর এনেছিল যে আজ তার বিয়ের গণেশপুজো হবে !'

'সে তো ঠিক হয়েই আছে কিন্তু—'

মোংধী শুরু থেকে শেষ অবধি সমস্ত কথাই বলে শোনায়।

সে কথা শুনেই বুড়ো-বুড়ী দুই ভাই-বোন যেন অথৈ দুঃখের সাগরে পড়ে যায়। যমনা চোখের জল ফেলতে থাকে ' আর পরমার

তো চোখের জল ফেলার মতো ভাগ্যও করে আসে নি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'যা তুই নিজের শ্বশুর বাড়ি চলে যা নইলে তোর শ্বশুর-শাশুড়ী হয়তো আবার—'

মায়েরও সে কথা খেয়ালে আসা মাত্রই মেয়েকে রওনা করিয়ে দেয়। পরমা ওদিকে ঘোড়ার পিঠে মালপত্র রাখছে দেখে তাকে থামাবার চেষ্টা করে, 'দাদা, আপনি এখন গিয়ে আর কী করবেন! আপনি তো জাঁতির মধ্যে রাখা সুপারির মতন, আর—'

পরমার নিজের মনেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোড়ন চলছিল। সে জানত যে সে যদি কালুর পক্ষ নেয় তা হলে এই বয়সে তাকে বাড়ি জায়গা জমি ছাড়তে হবে; তাও না-হয় ঠিক আছে কিন্তু হয়তো ছেলেদের পর্যন্ত ছাড়তে হতে পারে; আর পক্ষ না নিলে বংশের সাতপুরুষের মুখে চুনকালি লাগবে।

তবুও সে ঘোড়ার পিঠে মালপত্র রাখে, লাগাম চড়ায়, তামাকে দুটান দেবার জন্যে হুঁকেটাকে ঠিক করে······

পুরো দুটো টানও হুকোয় দেওয়া হয় নি হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যায়। দেখতে পায় ঘোড়াটা বোনের বটে কিন্তু তার পিঠে সওয়ারী তার নিজের 'কুলাঙ্গার'। বুড়োর শুধু দুচোখে নয়, মুখ দিয়েও যেন আগুনের হল্কা বেরোতে থাকে।

কিন্তু ছেলের চেহারাও ক্রোধে হিংসায় রাগে এবং গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে রক্তবর্ণ। তার ওপরে সে তখন ঘোড়ায় চড়েও ক্লান্ত।

যমনা বেচারী যেন সেই দুজনের মধ্যে পড়ে জীবন্ত দগ্ধ হতে থাকে। ঘোড়া বাঁধার পর অনেক চেষ্টার পর সে তাকে অভ্যর্থনা জানায়—'এসো ভাই রণছোড়।'

রণছোড়ের তখন সেদিকে কান ছিল না। নিজের ঘোড়া থেকে নামতে নামতে সে বুড়োকে বলে, 'মা বলে দিয়েছে যে যদি নিজের আর আমাদের মঙ্গল চাও তো এখন দু-চার দিন এখানেই পড়ে থেকো, তা না হলে—'

'তোর মায়ের নিকুচি—' বুড়ো জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলে! কানে শোনা যায় না এমন গালাগাল দিতে দিতে দাঁড়িয়ে ওঠে, 'বেঁধে দে তুই আমার ঘোড়া, না হলে তুই—'

'আয়-না দেখি এখানে'—রণছোড় ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো ফুঁসতে থাকে।

যমনা পরিষ্কার বুঝতে পারে, ভিন গাঁয়ে আমার বাড়ির উঠোনে বাপ-বেটাতে হয়তো হাতাহাতি করে বসবে। সেই ভয়ে সে ছুটে যায়। ভাইকে আটকে ধরে রণছোড়কে বলে, রণছোড় ভাই! তুই তো বুদ্ধিমান হয়েছিস এখন।···আমার ঘোড়া নিয়েই চলে যা তুই। এভাবে ভিন গাঁয়ে এসে আমার হেনস্তা করিস নি বাবা!'

রণছোড়ও দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে কিংবা বুড়োর মেজাজ দেখে যে কারণেই হোক, যে ঘোড়ায় চেপে এসেছিল তাতেই আবার চড়ে বসে। তবুও যাবার আগে বুড়োকে সাবধান করে যায়— 'এখন আমার তাড়া রয়েছে, কিন্তু বাড়ি গিয়ে যদি পঞ্চায়েৎ বসাবার চেষ্টা করো তো মজা দেখিয়ে দেব!'

'চুলোয় যাক তোদের বাড়ি।' এই বলে যমনা বুড়োকে টানাটানি করতে থাকে, 'চলুন দাদা আপনি! এখন কোথাও আর যেতে হবে না। কালিয়ার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে!'

বুড়োও পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। কোনো মতে খাটিয়ায় বসতেই গলাছেড়ে কেঁদে ওঠে—'হায় হায়, আমার ছেলে কুলাঙ্গার হয়ে জন্মাল শেষ পর্যন্ত! ভগবান তোমাকে যেন নরকে ফেলে। জ্যান্ত থাকতে থাকতে তোমাকে পোকায় খাক্‌। নির্বংশ হোক তোমার···

কিন্তু যমনা ততক্ষণে এসে বুড়োর মুখে হাত চাপা দেয়, 'এ-সব কী বলছ দাদা! তোমার বুদ্ধিও লোপ পেল নাকি?'

॥ বারো ॥

অসৎ লোকে অসৎ কাজই করেছে

উঠোনের একচালার নীচে বলদগুলোকে বেঁধে তাদের মুখে ঘাস পাতা দেওয়া হয়েছে আর গোরুমোষদের বাইরের মাঠে ভুট্টার খোসা খেতে দেওয়া হয়েছে। বউয়েরা ঝাঁটপাট দেবার পর জল আনার কিংবা রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত। পুরুষেরা বেশ আয়েশ করে হুঁকো খেতে থাকে যেন আট-দশমাসের খাটনির ক্লান্তি দূর করছে।

এধারে গোরুবাছুরের দল ছোটাছুটি করছে আর ওধার দিয়ে আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের পঞ্চায়েতের লোকদের আসতে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে চেপে আর অন্যেরা পাঁচ-সাতজনের দল করে হুঁকো টানতে টানতে।

এ গাঁয়ের প্রায় সকলেই বেশ ভাবনায় পড়ে যায়—। আজ তো কোনো জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নেই, তবে এখানে এদের আজ কী দরকার? কেবল শংকর, যমনার স্বামী ফুলজী প্রভৃতিরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কালুর মা বেশ হতচকিত হয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোদরদের বাড়ির বারান্দায় বিছানো ফরাশের চারকোণ পর্যন্ত ঠেসাঠেসি করে লোকে ভর্তি হয়ে যায়। রণছোড় কেবল প্রধান মোড়লদেরই ডেকেছিল কিন্তু বিধায়ক মোড়লেরা তাদের পাঁচ-ছ'জন সমর্থক চেলা ছাড়া আসবেই বা কী করে?

সভায় যে দুটো পক্ষ তা পরিষ্কার বোঝা যায়। মনোর-রণছোড়দের একটা দল, অন্যটা শংকর-ফুলজীদের। নির্দলীয়ও ছিল অনেকে। তারা যেমনি বদপ্রকৃতির তেমনি খামখেয়ালীও বটে। কেন যে তাদের আজ এখানে ডেকে আনা হয়েছে তাও জানে না। পেথা মোড়ল অবশ্য জেনেশুনেও বাইরে ও অন্তরে বকের মত্যেই কপট ভেক ধারণ করে বসেছিল··· গাঁয়ের নাপিত

হুঁকো সাজছিল। পঞ্চায়েৎ কাজের কথা শুরু করে।

পঞ্চায়েতের প্রধান পাঁচ-সাতজনের মধ্যে পেথা প্যাটেল আগে গলা পর্যন্ত রণছোড়ের কাছে ঘুষের টাকা খেয়েছিল, সে ফরিয়াদী পক্ষের নালিশ যাতে বেশ যুক্তিযুক্ত শোনায় সেইভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে থাকে, 'দেখুন ভাই, এখন কন্যাপক্ষের বলার কথা হচ্ছে যে পাঁচ-ছ বছর আগে এই বিয়ের পাকা-দেখা যখন হয়েছিল তখনো এদের অনেক আত্মীয়-স্বজনের সে ব্যাপারে আপত্তি ছিল। কিন্তু তখন কারো চাপে পড়ে এদের সম্বন্ধ বাধ্য হয়েই করতে হয়।'

শংকর সরাসরি বিরোধ করে কথাটার— 'কে আজ বলতে চায় সে কথা? সমাজের সকলেই জানে যে গলা ভাই নিজে এ সম্পর্ক করেছিল। তাঁর নিজের ইচ্ছেতে না হলে তিনি কুটুমদের বাড়ি সারিয়ে দিয়েছিলেন কেন, এবং প্রায়ই চাষ-বাসের কাজেই-বা সাহায্য করতেন কেন? আত্মীয়তার প্রীতি বজায় রাখার আগ্রহ আর চিন্তা ছিল বলেই না? মেয়ের মঙ্গলের কথা ভেবেই না?'

বারান্দায় বসে থাকা লোকেদের তিনের চার ভাগ মাথা দুলিয়ে সায় দেয়, 'ঠিক কথাই তো ভাই।'

'গলা আজ বেঁচে থাকলে তো কোনো কথাই ছিল না। ওর ছেলেমেয়েরা এখন ছোটো বাচ্চা সব, এ অবস্থায় মেয়ের মঙ্গল কেই-বা দেখবে?' মনোর বেশ মিষ্টি করে বলে।

'এ কথাটাও ভাববার মতোই বটে।' পুনরায় ঐ বারান্দায় গুঞ্জন ওঠে।

'তা হলে এরা বিয়ের লগ্ন ঠিক করে তত্ত্ব পাঠালে কেন? গায়ে হলুদ দেবার পর এখন বর আইবুড়ো থেকে যাবে নাকি?' কালুর পিসেমশাই ফুলজী গর্জে ওঠে। সাথে সাথেই অন্য পাঁচ-সাতজন উঠে দাঁড়ায়, 'আপনারা ভেবেছেনটা কী? একজন গরিব মানুষের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চান?'

রণছোড়ও উঠে দাঁড়ায়, 'তা হলে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে হবে নাকি? তোমরা সব ঝগড়া করার জন্য তৈরি দেখছি যে!'

রণছোড়ের সঙ্গেও জনা দশেক লোক উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে মনোর এবং তার চেলারাই প্রধান। কিন্তু মনোরকে তার ছেলেই মুখের মতো জবাব দেয়, 'আমার বাবার তো বুদ্ধির ভীমরতি ধরেছে কিন্তু আপনারা যাঁরা ন্যায়বিচার করতে এসেছেন, তাঁরা তো একবার ভালো করে ভেবে দেখুন।'

মনোর বুঝতে পারে যে ছেলে বউয়ের হয়েই বলতে এসেছে এখানে। রাগে তার চোখ লাল হয়ে ওঠে। ছেলের দিকে খিঁচিয়ে ওঠে তক্ষুনি, 'দেখি একবার অ্যাঁঃ, ছোঁড়া মিটিং করতে এসেছে, এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয় তিনি আবার…'

কিন্তু ছেলের পাশ থেকে জন দশেক উঠে দাঁড়ায়, 'আরে তুই বাপ হয়েছিস বলে হয়েছেটা কী? পঞ্চায়েতের মিটিং-এর মধ্যে গায়ে হাত দিয়ে দেখ-না একবার কী হয় শেষ পর্যন্ত—'

'তোমরা সব এখনো ঠিক করে কাপড় পরতে শেখো নি আবার পঞ্চায়েতের মিটিং করতে এসেছ!' তটস্থ বকবাবাজী এতক্ষণে কথা বলে ওঠেন।

ঝামেলা বেশ পাকিয়ে ওঠে এর পরে। রণছোড় আর শংকর তো হাতাহাতিই শুরু করে দেয়। সমস্ত বারান্দাই ক্ষেপে ওঠে যেন। দু'পক্ষের লোকেরাই জগাখিচুরির মতো একসাথে মিশে গিয়েছিল তাই এখানে-ওখানে কে কী বলল তা নিয়ে দু-এক জায়গায় লাথালাথিও লেগে যায়।

বারান্দার নীচে উঠোনে প্রায় সারা গাঁয়ের মেয়েরা ও ছোটো বাচ্চারা সব জমা হয়েছিল। মারামারি দেখে মেয়েরা দূরে পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

পেথা মোড়ল এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, এবার সে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজের ভারী শরীরটাকে একটু উঁচু করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে সে মোটা কর্কশ স্বরে বলে, 'আরে একি ভীলেদের মতো খেয়োখেয়ি শুরু করেছ তোমরা? সবাইকে মিটিং থেকে বার করে দিয়ে ফিরে চলো যে যার ঘরে। এরা

সব তো দেখছি নিজেরাই আপসে ন্যায়বিচার করে নেবে।'

পেথা প্যাটেল উঠে দাঁড়ায় না বটে তবে তার আশপাশের দু-চারজন সর্দার উঠে পড়ে। 'যা, যাঃ সব বেটাই দেখছি ঝগড়াটে। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে যার লাঠির জোরে নিজেরাই বিচার করে নাও, আমরা সব চলে যাচ্ছি।'

একমাত্র পেথা প্যাটেল ছাড়া বারান্দার প্রায় সবাই উঠে দাঁড়ায় ঐ সর্দারেরা তো নিজেদের বসবার আসন ও লাঠি তরোয়াল সব গুছিয়ে নেয়...

কিন্তু তারা রোয়াকের বাইরে যাবার আগেই এরা সবাই ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়, উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তা কখনো হতে পারে নাকি। পঞ্চায়েৎ ভেঙে দেবার দোষ আমাদের নামে লাগলেই হল। এই পঞ্চায়েতের দিব্যি রইল যে এখান থেকে যে চলে যাবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপে পাতকী হবে।'

এরা সবাই ফিরে আসতেই পেথা মোড়ল তিরবিড়িয়ে ওঠে, পাশে-রাখা তলোয়ার পাগড়ী ঠিক করে নেয়—'আমার কথাই কেউ শুনতে চাও না এখানে তা হলে বিচার আর কী করব ছাই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো বাড়িতেও রয়েছে। আমার দ্বারা এখানে কোনো বিচার করা সম্ভব নয় ভাই।'

তাকে আবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বসাতে দুপক্ষকেই বেশ বেগ পেতে হয়। তাদের কথা দিতে হয়, 'আপনি যা বলবেন আমরা তা মাথা পেতে নেব।'

পেথা মোড়লকে এ অঞ্চলে সকলেই এক নম্বরের ধূর্ত বলে থাকে। জমিদার-জমিদারনীরা পর্যন্ত তার পরামর্শ নেয়। বেনে মুদিও তাকে মানত খুব। এমনিতে বয়স গোটা পঁয়তাল্লিশ কিন্তু চেহারা দেখলে ষাট বছরের বলে মনে হয় আর রায় দেবার সময় তাকে সত্তর বছরের বুড়োর মতো দেখায়।

বিরোধী পক্ষকে পরাস্ত করার তার অনেক বিচিত্র ফন্দিফিকির জানা ছিল। কোনো বড়োরকমের গোলমাল বাধলে সে নিজেই

সেটাকে আরো জটিল করে তুলত এবং তার পরে সেই গোলযোগকে ঠিকমতো সমাধান করার জন্যে সবাই চ্যালেঞ্জ করত···তারপরে চট করে সহজ উপায় দেখিয়ে দিয়ে সকলের মুখ একেবারে বরাবরের জন্য বন্ধ করে দিত।

কিন্তু সত্যি বলতে কি পেথা প্যাটেল নিজেই একটা বিভ্রান্তিকর লোক। সে যে কার ভালো করবে আর কার খারাপ করবে তা বলা মুশকিল। খোলাখুলি লোকের কাছে টাকা খায় কিন্তু কখনো কোথাও অন্যায় করেছে এ বদনাম আজ পর্যন্ত কেউ ওর নামে দিতে পারে নি। এমনিতে সে নিজের ভাইকেও দেখত না কখনো তবু সকলে তাকে আপনজন বলে মনে করত।

ছোটোখাটো মামলায় সে কখনো মাথা গলাত না। আর কোনো বড়ো মামলা হাতে এলে এক রাস্তায় দুকাজ সারা কেন, বাইশ কাজ সেরে নিত। সারা বছর চলার মতো আফিম, কাপড় আর খাবারের বন্দোবস্ত আদায় করে নিত।

শংকর ফুলজী প্রভৃতি কালুর দলের লোকদের পেথা প্যাটেল একধারে নিয়ে গিয়ে লাখ কথার এক কথা বলে দেয়, মেয়ের জেদের কথা না-হয় ছেড়েই দাও। মেয়ের মামা যদি মেয়েকে সম্প্রদান করতে বিয়ের বিয়ের দিন আসরেই না যায় তো আপনাদের বর বিয়ে করবে কাকে? হ্যাঁ, যদি বাড়িতে মালিক বেঁচে থাকত তো কোনো মুশকিলই ছিল না। কিন্তু মেয়ের মা এখানে বিধবা। তাকে ছোটো বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ করতে হবে। একটু অবস্থাপন্ন আত্মীয়-কুটুম থাকলে ভবিষ্যতের সুরাহা হয়। আর এ তো আমার নিজের বাড়ির ব্যাপার নয় যে জোরজবরদস্তি করে লাগিয়ে দিলেই হল?'

'তা হলে সরকারের কাছেই নালিশ করব বিচারের।' ফুলজী বলে।

'সে আপনি জানেন। কিন্তু সরকারও তো শেষ অবধি সমাজের সকলকেই জিজ্ঞেস করবে কিনা! তা ছাড়া পঞ্চায়েতের আদেশ অমান্য করার জন্যে সমাজ আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হবে', পেথা হাসে,

'আপনিই ভেবে দেখুন। আপনি কি সরকারকে নিয়েই ঘর-সংসার চালাবেন? মেয়ের বিয়ে-থা—'

'তা হলে কি আমরা কনেকে ছেড়ে দেব? নিজেদের নাক নিজেদের হাতে কেটে? গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর দুনিয়ায় কোথাও কোনো বর আইবুড়ো পড়ে থেকেছে নাকি?' ফুলজী রেগে ওঠে।

'কেউই আইবুড়ো পড়ে থাকবে না। আর সমাজ থাকতে দেবেই বা কেন? একবার আগে এই মেয়ের ব্যাপারটা তো মিটমাট হয়ে যেতে দাও।' পেথা ঘন চুলে ভর্তি চোখের পাতা কুঁচকে এমন ভাবে হাসে যেন কোনো গভীর রহস্যের কথা বলছে। বেশি কথা আর কিছু বলার ছিল না কেননা গোপন পরামর্শ হলে বারান্দার প্রায় অর্ধেক মাথাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল এই কথাবার্তা।

অন্য লোকেদের আর-একজন সর্দার বোঝাচ্ছিল। লোকমত তোলার কাজ সেই ঠিকমতো করছিল, 'আমরা সকলেই তো ন্যায় অন্যায় বিচার করতে বসেছি কিন্তু এই বেচারি সহায়হীন বিধবার কথাটা কি কেউ ভেবে দেখছি? নইলে আপনারাই ভেবে দেখুন না, সাত-আট বছর আগে ঠিক করা এই পাকা দেখা ভাঙার ইচ্ছে কারুর হবে কেন?…'

পেথা প্যাটেল শংকর-ফুলজীর কানে কানে বলে, 'আপনি এমন অবুঝ হচ্ছেন কেন ফুলজী! মেয়ে তো এমনিতেই অন্যের হাতে যাচ্ছে। আপনি বলুন না, পঞ্চায়েৎ কি তাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করেছে নাকি যে আজ তার নিজের জোর খাটাবে! কী সত্যি কিনা বলুন।… তার চেয়ে বরং ভেবেচিন্তে এই সম্মানহানির জন্যে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন সেটাই আদায় করে নিন না। পড়ে পাওয়া কানাকড়িই লাভ।'

শংকর-ফুলজী বুঝতে পেরে যায় তাদের কোনো যুক্তিই আজ এরা মানবে না। কোনো না কোনো আপত্তি তুলবেই তখন পেথা মোড়লের পরামর্শটা খারাপ কোথায়?

ফুলজী তার দলের সমর্থকদের নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে যায়। দলেতে সে নিজে ছিল আর ছিল শংকর, কাসম ঘাঁচী, বেচাত এবং সমাজের অন্য কয়েকজন সাধাসিধে ভালো মানুষ। মাওজীর ছেলে তো কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল কে জানে। আর বেচাত ও কাসমের এই পঞ্চায়েতের সমস্ত ব্যাপারটাই অপছন্দ ছিল। কিন্তু তারা কীই-বা করতে পারে; নিজেদের সমাজের ব্যাপার তো আর নয়। তবুও তারা দুজনে দু-তিন বার বলেছিল— 'শংকর, তুই যদি বলিস তো মেয়ে রাত্তিরে উঠিয়ে নিয়ে এসে কালিয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব। এখন এই লোকেরা যা করতে চায় ওদের করতে দে।'

কথাটা শংকরের মনে ধরেছিল। বেচাতের নিজেরই একটু আশঙ্কা ছিল, এটা আর শেষ পর্যন্ত হয় কি করে? সমাজের ভয়ও ছিল কিছুটা। বিয়ে না-হয় দেওয়া গেল কিন্তু সমাজ সে বিয়ে মানলে তবেই-না টিকবে! আর দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ-সুবিধে যে জাতের রয়েছে সেখানে এভাবে জবরদস্তি বিয়ে দিয়ে লাভ কি? মেয়ে বড়ো হয়ে উঠলে দাও অন্য কোথাও বিদায় করে— আরে এই পঞ্চায়েতই তাকে ব্যবস্থা করে বিদায় করে দেবে। এখন লোকেদের খোশামোদ করে রাজী করার দরকারই-বা কোথায়!

সব দিক দিয়ে ভেবে দেখে এদের পেথা মোড়লের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত তারা সম্মানহানির জরিমানা হিসেবে এগারো কুড়ি টাকা নেবে ঠিক করে।

কিন্তু এরা জানবে কী করে যে রণছোড় এগারো কুড়ির জায়গায় একশো কুড়ি টাকা দাবি করলেও দিয়ে দিত। সে কেবল চাইছিল যে কালিয়া যেন এ মেয়েকে বিয়ে করতে না পারে। পেথা মোড়ল তাকে বলে, 'আমাদের যাবার পর আপসে নিজেদের মধ্যেই সব ঠিক-ঠাক করে নিয়ো, যেখানে ভালো বুঝবে সেখানেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়ো; তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

সকলের মতামত শুনে নেবার পর পেথা মোড়ল রায় শোনায়: 'কনেকে তার বাবা-মা যেখানে চায় বিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু

কবে ? যবে বালা প্যাটেলের ছেলেকে পাঠানো লগ্ন-তত্ত্বতাবাস ফেরত যাবে তখন।'

আর এই বিয়ে নাকচ হয়ে যাবার জন্য পাত্র-পক্ষকে এগারো কুড়ি টাকা পাইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু টাকাটা নেবে কে ? কে নিয়ে কোঁচার খুঁটে বাঁধবে ? ফুলজী তো রায় শুনেই রেগে ঘোড়ায় উঠে বসে। শেষে পেথা প্যাটেল শংকরকে আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় নেবার জন্যে, 'হ্যাঁ ! তুমি নিয়ে রাখো তোমার কাছে ! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

শংকর নিয়ে নেয় বটে তবে বলে রাখে, 'দেখবেন কিন্তু পেথা মোড়ল, আপনার ভরসাতেই এই টাকা নিলাম। বরের গায়ের হলুদ যেন শেষে মুছতে না হয় আমাদের।'

কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করে, 'মেয়ের তো ঝামেলা থেকে মুক্তি হল কিন্তু ওর এখন বিয়ে হবে কোথায় ?'

'সে যেখানে ওর আত্মীয়-স্বজনেরা চাইবে। তাতে আমাদের এই পঞ্চায়েতের খোঁজ নেবার দরকারটা কী। নাও চলো দেখি, খেতে যাওয়া যাক এবার।' এই বলে সে উঠে পড়তেই অন্যেরাও সকলে তার সঙ্গে উঠে পড়ে।

শংকর, বেচাত প্রভৃতি আগেই অবশ্য চলে গিয়েছিল। এধারে খাওয়াদাওয়ার ভোজ চলতে থাকে অন্য ধারে কালুদের বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। শংকর বুড়ীকে অনেক করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজুর মতো অমন সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়েকে হাতছাড়া করতে হওয়ায়, মায়ের মন কিছুতেই প্রবোধ মানতে চায় না।

পেট এবং পকেট দুইই বেশ ভালো করে পরিতৃপ্ত হবার পর ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেথা মোড়ল শংকরকে ডেকে পাঠায় ; তাতে বুড়ীর চোখের জলঝরা কিছুটা কমে এবং ক্রমশ বিশ্বাস জন্মায় যে তার ছেলে গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর আইবুড়ো থেকে যাবে না। শেষ পর্যন্ত, বিয়ে কোথাও হবেই ; তবুও অন্তরাত্মা বিলাপ করতেই

থাকে, 'হায় হায় রে, অসৎ লোকেরা শেষ অবধি সেই খারাপ করেই তবে শান্ত হল। ওরে মুখপোড়া সর্বনেশে ডাকাত রে!' আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভগবানকে যেন জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'এতবড়ো পঞ্চায়েতের মধ্যে একজনও কোনো সৎলোক উঠে দাঁড়াতে পারল না?··· ন্যায় বিচার করার মতো কেউ সেখানে কি ছিল না?'

॥ তেরো ॥

হতভাগ্য পরমা মোড়ল

পঞ্চায়েতের লোকেরা বিদায় নেবার পর সারা গাঁ নিঝুম হয়ে যায়। বালার বাড়িতে বিয়ে প্রসঙ্গ তখনকার মতো ছেদ পড়েছিল কিন্তু রণছোড়দের বাড়িতে গোপন শলাপরামর্শ চলতে থাকে। আর কোদরদের বাড়িতে তার মা এই ব্যাপারে বুঝে উঠতেই পারছিল না, খুশি হবে না কাঁদবে? সে রাতে তার মেয়ের জন্যে ঘোড়ায় চড়ে বরাত এল না, আর কালুর বিয়ে করতে বেরোবার তো কথাই ওঠে না! সারা গাঁয়ের সকলেই ভাবনা করতে থাকে যে 'কালিয়া শেষ পর্যন্ত কি আইবুড়োই থেকে যাবে?' কেউ কেউ আবার বলে, 'তা তো না-হয় হল কিন্তু রাজুর বরই-বা কোন্ গাঁ থেকে আসবে?'

সকাল বেলাই সে প্রশ্নের জবাব মিলল। নাপিত বাড়ি বাড়ি বলে গেল, 'পরমা কাকার ছেলে নানা গণেশ পুজোয় (বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ) বসবে আজ, আপনারা সকলে মিষ্টিমুখ করতে যাবেন সেখানে।'

অন্য গাঁয়ে বসে এখবর শুনে পরমা প্যাটেল যেমন অবাক হয়ে যায় এ গাঁয়েরও সকলের সেই অবস্থা হয়, 'কী ব্যাপার! আমাদের মোড়লের বাড়িতে কী হবে বলছে যেন?'

ঘোড়া ছুটিয়ে পরমা প্যাটেল বাড়িতে এসে পৌঁছয়; রেকাব থেকে পা নাবাতে যাবে, তসরের কাপড় পরে বেশ মেজাজের সঙ্গে এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছিল স্ত্রী। পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়, 'খবরদার, একটা টুঁ শব্দ করেছ তো···বিয়েতে বাধা পড়ে না যেন কোনো।'

কিন্তু পরমা মোড়ল তখন আরো পরের কথা চিন্তা করছিল, 'শুধু বিয়েতে বিঘ্নের কথা কী বলছিস, বিঘ্ন তো আমাদের জীবনেই এসে দেখা দিয়েছে।' বিড় বিড় করতে করতে সে ঘোড়ার সাজ খুলতে থাকে। রেকাব নামিয়ে জিনটা আলগা করতে যাবে এমন সময়

রণছোড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হুকুম দেয়, 'থাক্, সাজ খুলতে হবে না, নানিয়ার বরাত নিয়ে বেরতে হবে এখনি।'

পরমার মাথায় রাগ চড়ে যায়, 'তোর মায়ের নিকুচি···বল কোথায় বরাত নিয়ে চলেছিস?'

পাশেই মা এবং গাঁয়ের অন্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল এবং দু-চারজন পুরুষ আর ছোটোছেলেরা শুনছিল এই কথাবার্তা, তাদের সকলের সামনে এমন মা তুলে গালাগাল তিরিশ বছরের জোয়ান ছেলে কী করে সহ্য করবে? মনে মনে মালীর কাছে স্বামীর মৃত্যু বহুদিন আগেই হয়েছিল, ইদানীং তার সন্তানদের বাবা হিসেবেও পরমার কোনো স্থান ছিল না আর অন্তরে, তার পরিচয় টিঁকেছিল কেবল, 'অপয়াটার কাকা' হিসেবে!

রণছোড় উঠোন থেকে একলাফে তেড়ে যায় কিন্তু ততক্ষণে দু-চার জনে মধ্যে এসে পড়েছে। শুধু মালী বলতে থাকে, 'লাগা ঘা-কতক হতভাগা হায়নাটাকে, একেবারে জন্মের শোধ শেষ হয়ে যাক।'

পরমার কোঠরগত চোখ দুটো উত্তেজনায় বেরিয়ে আসে। চোখ থেকে রাগে যেন রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। মালীর যেন যৌবন হঠাৎ ফিরে এসেছে। একবার ভাবে মালীর গলা টিপে শেষ করে ফেলে, কিংবা ঘরের মধ্যে যে পুজারী বামুন গণেশ পুজো করতে বসেছে তার পুজোর কমণ্ডলু দিয়েই তার ন্যাড়া মাথাটা দেয় ফাটিয়ে। কিন্তু উপায় নেই। যমের মতো রণছোড় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল···

'সবই কপালের দোষ।··· লোকে বলবে এই বুড়ো বয়সে একি দশা হল।'

পরমা রাগ ঠাণ্ডা করে আবার ঘোড়ার পিঠে লাগাম চড়ায়। রেকাবেতে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যাবে এমন সময় মালী বলে ওঠে—

'এই ঘোড়া কিনতে তোর বাপঠাকুদারা একপয়সাও দিয়েছিল যে আজ···

মেজ ছেলে নাথা অনেকক্ষণ থেকেই বিরক্তি চেপে ছিল, সে

মায়ের ওপর চটে যায়।

'তোর বাপ-ঠাকুর্দার যা আছে সব নিয়ে চলে যা তুই তোর বাপের বাড়ি!' আর রণছোড়ের দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠে:

'তুই বুড়ো বাপকে মারতে লাফিয়ে উঠেছিলি? খুব গায়ে জোর হয়েছে, তাই না?'

কিছুক্ষণের জন্যে সব একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। নাথা এমন কথা বলবে, তার বাবার দিকে গিয়ে ভিড়বে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। মালী তো তাকে তার সবচেয়ে মুখচোরা ছেলে বলত এতকাল।

কিন্তু সত্যি বলতে গেলে নাথার এই উগ্রমূর্তি পরমারও ভালো লাগে না। যা ভেবেছিল তার চেয়েও এ বাড়ির ভবিষ্যৎ অনেক বেশি ভয়াবহ হবে বলে এখন তার মনে হয়: 'তুলকালাম কাণ্ড হবে দেখছি!'

'এখনো তার বাকী আছে নাকি আর-কিছু?' রণছোড় আর নাথা দুজনেই মুখ খিস্তি করতে থাকে।

পরমা চিৎকার করে মালীকে ডেকে বলে, 'দেখে যা, দেখে যা, নিজের পেটের ছেলেদের দেখ একবার কেমন সুন্দর শাস্ত্র পাঠ করছে।' আর মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'সংসারে অশান্তি আর শত্রুতার বীজ বুনেছিস তুই···তোর নিজের ঘরেতেই তোর জীবন-কালেই সেই পাপে যদি সব না ডোবে তো কি বলেছি!'

পরমা আর দাঁড়ায় না। ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে গোত্তা দেয়, হাতের চাবুক দিয়ে ছিপটি লাগাতে লাগাতে মালীকে বলতে থাকে, 'তোকে যে পেটে ধরেছিল, আর তুই যাদের পেটে ধরেছিস তাদের জন্যে এখন তুই কাঁদ। বসে বসে নিজের বাপের সম্পত্তি খাগে যা···' ঘোড়ার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে মোষের বাছুরটাও যেন মালীকে মুখ ভেঙায়—'ই···হি···হি···হি.... !'

লোকেরা ভেবে উঠতে পারে না যে পরমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, নাকি যে দুই ভাই হাতাতাতি করতে শুরু করেছে তাদের

শান্ত করবে, কিম্বা মালীকে সান্ত্বনা দেবে অথবা ভেতরে গিয়ে গণেশ পুজোর গান গাইবে ?

এতেও আনন্দ কিছু কম হচ্ছিল না ! কালুদের বাড়িতে বসে কাসম বেচাত ইত্যাদিরা, মালীর ভাষায় যারা 'শত্রু', খুশি হয়ে উঠতে থাকে ।

বুড়ো মাওজীর পনেরো বছরের ছেলে রামা তো চিৎকার করে শুনিয়ে শুনিয়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকে, 'ওরে কে আছিস শুনে যা, নানিয়ার বিয়েতে গান গাওয়া হচ্ছে । মালী গান গাইছে, ছেলেরা সঙ্গে সংগত করছে । বাঃ ভাই বাঃ ! তামাশা জমেছে মন্দ নয় রে !'

তামাশা ছাড়া একে আর কী বলা চলে ? দুই ভাই হাতে লাঠি তুলে নিয়েছিল আর মালী তাদের মধ্যে গিয়ে শান্ত করানোর চেষ্টা করছিল ।

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে প্রাণ যায় উলুখড়েদের ।' রণছোড় আর নাথার কারো হাত ভাঙে তো কারো মাথা ফাটে, মালীর হাতে কাচের চুরি ছিল, সেগুলো ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে । আর কিছুক্ষণ চললে শেষ অবধি কী হত তা ভগবানই জানেন, কিন্তু ততক্ষণে গাঁয়ের লোকেদের টনক নড়ে । বেচাত-কাসমকেও এগিয়ে আসতে হয় ।

নাপিতের নেমন্তন্ন করাতেও যারা আসে নি তখনো পর্যন্ত এই তামাশা দেখতে তারাও বিনা নেমন্তন্নে এসে জমা হয় । নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলতে থাকে, 'আমি ভেবেছিলাম যে কেবল নানিয়া গণেশ পুজোয় বসছে কিন্তু, এ তো দেখছি তিন ভাইই গণেশ পুজোয় বসে গেছে !'

অন্য কেউ একজন বলে ওঠে, 'আরে বুড়ীও সঙ্গে বিয়েতে বসেছে দেখছি । ওর আঘাতটা একটু কম হয়েছে নাকি ? বাড়ি সুদ্ধ সবাই বিয়ের মঙ্গল পুজোতে নেমে পড়েছে রে ভাই ।'

'আর গায়ে হলুদ রক্ত দিয়ে মেখে নিয়েছে । হলুদের রঙ ফিকে

পড়ে যায় কিনা সেইজন্য !'

কিন্তু পরমার বাড়ির এই মারামারি দেখে কালুর মার বিন্দুমাত্র আনন্দ হয় না বরং দুঃখই হয়। পরমা রেগে বেরিয়ে পড়তেই সে তক্ষুনি দৌড়ে বাড়ির পেছনের দিকে উঠোনে যায় ; আর রাস্তার দিকে চেয়ে হাঁক পাড়ে, 'পরমা ভাই, ও পরমা ভাই ! ফিরে এসো। না ফিরলে তোমার কালিয়ার দিব্যি রইল।'

কিন্তু এই শেষ কথাটা শুনতে পাবার আগেই পরমার রঙিন ঘোড়া মাঝ রাস্তা পেরিয়ে গেছে। কালুর মা কেবল এটুকুই শুনতে পায়, 'কালুর গায়ের হলুদ এক্ষুনি তুলে ফেলো না যেন।'

রূপা পরম কৃতার্থ হয়ে পরমার দিকে তাকিয়েই থাকে, 'আমার জন্যেই একে ঘর ছাড়তে হল !'

গ্রীষ্মের দুপুর তেতে উঠতে থাকে। ধূ ধূ মাঠের জমি দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরোচ্ছিল। গোরু-বাছুরেরা খুঁজে পেতে আম-বটগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, পাখিরা যেন পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলমাত্র পরমা প্যাটেলের ঘোড়া তীব্র গতিতে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে জলস্রোতের মতো অবাধ ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে থাকে। পেছনে পেছনে সেই বাছুরটাও ধুলোর ঝড় ওড়াচ্ছিল...

কেউ যদি তখন তাকে দেখতে পেত তা হলে বলত, 'ঘোড়ায় চেপে গেলে কি হবে, বেচারী চরম দুর্ভাগা কেউ হবে।'

॥ চোদ্দ ॥

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য

তখন সন্ধে ঘনিয়ে আসছিল, ফুলজীর ঘোড়ার পিঠে চেপে শংকর উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সে রাস্তা থেকে পরমাকেও ধরে এনেছিল।

শংকর ঘোড়ার থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে বলে, 'কোথায় গেলেন রূপা খুড়ী? কই লগ্নপুজোর ব্যবস্থা করুন।'

আর পরমা তার বাড়িতে অভিনন্দন জানাতে যায়, 'কাঁদো এখন বসে বসে বাপ-মায়ের নাম ধরে। নিজের ছেলে গায়ে হলুদ চড়িয়ে এখন তো রইল পড়ে। রণছোড় ভাইকে গিয়ে বলো যে পঞ্চায়েত ডাকতে।'

দুজনের কথাই সত্যি। এখান থেকে ওঠার পর পঞ্চায়েতের সর্দারেরা নানার শ্বশুরের বাড়িতে আবার বসেছিল। এবারের নালিশ ছিল, 'ভাগ্নী কি কেবল একা মনোর প্যাটেলেরই আছে নাকি যে সে যার ইচ্ছে পাকা দেখা ভাঙবে কিংবা ঠিক করবে? আমার মেয়ে কী দোষ করেছে যে জামাই দুবার বিয়ে করতে যাচ্ছে? আমরা গরিব বলে কি আমাদের কোনো মান-সম্মান নেই?'

গোনা গুনতি কয়েকজন মাতব্বর ছাড়া অনেকেরই রাগ ছিল। থাকবে না-ই বা কেন। গরিব সকলেই। তবুও এক-আধবার নাহয় পঞ্চায়েতের সুপারিশ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এইভাবে?— অন্য সকলেই একসুরে গেয়ে ওঠে, 'আরে ল্যাজ মোটা মাতব্বর সব, তোমরা এ-সব কী শুরু করেছ? নিজেদের ছেলেদের দুটো করে বিয়ে দেবার জন্যে আমাদের মতো গরিবদের সম্বন্ধ ভেঙে দেবে নাকি?'

দু-একজনে পেথা প্যাটেলকে শুনিয়ে দেয়, 'বিচার করতে হয় তো ঠিকভাবে করবে নইলে এবারে আর তোমার মান-সম্মান থাকবে না।'

কিন্তু এরা কী করেই বা জানবে যে পেথা প্যাটেল নিজে গিয়ে

নানার শ্বশুরকে পরামর্শ দিয়েছিল এবং সাহায্য করেছিল এ-ব্যাপারে।

প্রচুর বিরোধ খাড়া করে প্রায় অর্ধেকদিন মাথা ঘামানোর পর পেথা মোড়ল বিচারের রায় শোনায়, 'ঠাসরা গ্রামের জগা নরসির মেয়ের পাকা দেখা হবার দিন-পনেরোর মধ্যে বর মারা যায়। তার সঙ্গে বালা খুশালের ছেলে কালুর সম্বন্ধ করা হোক। আর কালুর ঠিক করা মেয়ে রাজুর সাথে জগা নরসির ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া হোক।'

এই রায় শুনে সকলেই খুশি হয়ে ওঠে। অনেকে বলেও ফেলে, 'বলিহারী বুদ্ধি বটে আমাদের পেথা মোড়লের!'

আর ওদিকে পরমা মোড়লের ছেলে নানিয়া যে বিয়ের মঙ্গলঘট বসিয়েছে তার কী হবে? সমাজের যখন কালিয়ার বিয়ের জন্যে এত খেয়াল তখন তার সম্মান রাখার কী ব্যবস্থা?…'

মনোরের এই প্রশ্নের উত্তরে পেথা মোড়ল পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়, 'ভাই মনোর, এদিকে শুনে যান একটু', পেথা মোড়ল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মনোরকে কাছে ডাকে। বারান্দার সবাই চুপ করে শুনতে থাকে। পেথা বলতে শুরু করে—

'আপনাদের নানিয়া গণেশ পুজোয় বসেছে আর গায়ে হলুদও মেখেছে, খুবই সত্যি কথা, তা হলে ধরুন আমিও যদি বলি—'কে আছ ভাই, তোমরা দুজনে মিলে কারো বাড়ি থেকে আধসের হলুদ নিয়ে এসে মাখিয়ে দাও আমার গায়ে। দেখি এখন পঞ্চায়েৎ কী করে আমার জন্যে মেয়ে নিয়ে আসে?'

সারা দালান একেবারে হো হো করে হেসে ওঠে। আর মনোরের অবস্থা তেলে পড়ে যাওয়া মাছির মতো হয়ে দাঁড়ায়।

তখন সে রাজুর আগের সম্বন্ধটাই কায়েম রাখার জন্য প্রচুর চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে গেলে যে পেথা মোড়লের ভরা পকেট খালি করতে হয়! আর তা যদি নাও করতে হয় তবুও পঞ্চায়েতকে নিজেদের উগড়ানো থুথু নিজেদেরই গিলতে হয় যে? তাই সে প্রস্তাবকে কোনো আমল দেওয়া হয় না এবং সমাজের এই নতুন

সিদ্ধান্ত অটল রাখা হয়।

শংকর পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতেই কালুর এই নতুন লগ্ন-পত্রিকা লিখিয়ে নেয় আর পঞ্চায়েতও রাজুর লগ্ন-পত্রিকা মনোরকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। পেথা মোড়ল লগ্ন-পত্রিকা দুটো দেবার সময় শংকরের সাথে জগাকেও দাঁড় করায়, 'যা জগা, তোর নিজের ভাই আর মেয়েকে গণেশ পুজোয় বসিয়ে দে গিয়ে।'

শংকরও ফুলজীর ঘোড়ায় চড়ে বসে। রাস্তায় পরমার সঙ্গে দেখা হতে তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু বুড়ো পরমার দুঃখের সীমা থাকে না। নিজের সারা জীবন ধরে— সাতপুরুষ ধরে অর্জিত বংশের মান-মর্যাদা বাড়ির বউ এক মুহূর্তেই ধুলোয় মিশিয়ে দিলে! 'আমার ছেলেই শেষ পর্যন্ত গায়ে হলুদ মেখে বিয়ে না হয়ে পড়ে থাকল।...' বুড়োর কাউকে মুখ দেখাবার আর ইচ্ছে থাকে। কিন্তু কীই-বা করতে পারে সে?

ওদিকে মালী ঠিক করে উঠতে পারছিল না সে নিজে ডুবে মরবে, না বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে কিংবা বুড়োর মাথাটা কেটে চিবিয়ে খায়....

অন্যধারে খাটিয়ায় পড়ে থাকা রণছোড় নিজের যন্ত্রণা ভুলে ভগবানের কাছে মিনতি করতে থাকে—'যে কে সেই হয়ে গেল— আমার মৃত্যু দিয়ে দাও ঠাকুর!'

আর কালুর বাড়িতে রূপা অন্নজল ত্যাগ করে ছিল বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে। সে এখন উপবাস ভঙ্গ করতে উঠোনে গানের ফোয়ারা বসে যায় যেন :—

'হরি গলহুং ছোগুং নে গলনো গোটো কেশরিয়া লাল,
কো তো সাহবা ঘোড়ীলা বোংরী আলুঁ কেশরিয়া লাল।'

(ফুলের পাপড়ি আর ফুলের তোড়া এনেছি, প্রিয় যদি চায় তো সুন্দর ঘোড়াও কিনে দেব।)

রাজুদের বাড়ি মনোর ঘোড়ায় চেপেই আসে একা, তবু রাজুর মা জিজ্ঞাসা করে 'গানের জন্যে কাউকে আনলে নাকি?' বাড়ির

লোকের মনেই যখন কোনো আনন্দ নেই তখন গাঁয়ের লোকেরাই বা কেন গান গাইতে আসবে ?

কালুদের বাড়িতে অন্য লোকেরা, যুবক প্রৌঢ় সবাই কালকের আনন্দের ঘাটতিটুকু আজ পুরণ করতে প্রাণ খুলে গান শুরু করে দেয়। তীরন্দাজ যেমন আপন মনে চারিদিকে তীর ছোঁড়ে কাসম তেমনি নতুন নতুন গান শোনাতে শুরু করে—

'অংরেস আব্যো রে জুদী জাতনো
টোপীবালো আব্যো রে বিলাংত নো।
এনী গাড়ী মাঁ ভরিয়া ছে লাল
এনী মঠমনা বোল কালা কালা, রে অংরেস আব্যো।
এ তো সপৈড়া লাব্যো ছে মাতা
এনী মঠমনা গাল রাতা রাতা, রে অংরেস আব্যো।'

(টুপী মাথায় এক নতুন ধরনের বিলিতি সাহেব এসেছে ভাই। তাদের গাড়িতে কয়লা ভরা থাকে। তাদের মেমেরা কথা বলে আধো আধো স্বরে। তারা সিপাই এনেছে ভাই গাদা গাদা, তাদের ম্যাডামদের গাল লাল লাল দেখতে; ইংরেজ এসেছে রে ভাই ইংরেজ এসেছে।)

লোকেদের কাছে ইংরেজ, গাড়ি আর মেম সব-কিছুই নতুন ছিল। সবাই খুব মন দিয়ে শুনে উৎসাহের সঙ্গে গাইতে থাকে। কিন্তু কাসমের তখন সব থেকে বেশি আনন্দে আত্মহারার অবস্থা। সে গাড়ির আর-একটা গান শুরু করে। সে নাচছিলও এক আলাদা ভঙ্গিতে। চারজন করে যুবকদের এক-একটা দল করে দলের সকলকে পর পর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড় করায় কাসম—

'গাড়ি সড়প দইনে আবী রে রামা রাঠোড় !
গাড়ি ডুংগর মাং অচকানী রে রামা রাঠোড়
গাড়ি হালে ছে কে চালে রে রামা রাঠোড়
গাড়ি কোদালা মঁগাবে রে রামা রাঠোড়
গাড়ি পাবড়া মঁগাবে রে রামা রাঠোড়

গাড়ি রেলবাইও পথবাবে রে রামা রাঠোড়
গাড়ি সড়প দইনে চালী রে রামা রাঠোড় !'

(ওহে রামা রাঠোর, গাড়ি খুব জোরে ছুটে এসেছে। গাড়ি পাহাড়েতে আটকে গেছে। গাড়ি নড়েও না, চলেও না। গাড়ি কোদাল চেয়ে পাঠায়, গাড়ি খোন্তা চেয়ে পাঠায়, গাড়ি লোহার রেল লাইন পাতে, গাড়ি হঠাৎ জোরে চলতে শুরু করে দেয়।)

মেয়েরাও আনন্দে মেতে উঠেছিল বেশ, শংকর নাথা আর বামার বউয়েরা ছেলেদের অনুকরণ করতে থাকে। গাড়ির মতো থমকে থেমে যাওয়া, এগিয়ে পেছিয়ে যাওয়া এবং 'সড়প-দইনে' (হঠাৎ জোরে) বলার সাথে সাথে পাঁচ হাত লম্বা লাফ মারে!

গায়কদেরই শুধু নয়, দর্শকদেরও মজা লাগে। ঐ একই গান দুবার গাওয়া হল এবং পরের বারে মেয়েরা ছেলেদের মতোই, বরঞ্চ আরো মধুর ভঙ্গিতে হালে ছে কে চালে রে (না নড়ে না চড়ে) পঙ্‌ক্তি বলার সময় হেলতে দুলতে থাকে। শেষের লাইনটি অনুপম চঞ্চলতায় 'সড়প-দইনে' (হঠাৎ জোরে) চলতে থাকে।

একটু রাত হলে লোকেরা খাবার জন্যে যায় বটে কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসার ব্যস্ততা থাকে সকলের এবং এইভাবেই সমস্ত রাত গানের ফোয়ারা ছুটতে থাকে। সামনের বাড়িতে পরমা প্যাটেলেরই বিরক্ত ধরে যায়; তখন মালী রণছোড় আর নানা নতুন করে আর কী বলবে? কিন্তু এই রাত্তিরেতে যায়ই-বা কোথায় এখন?—

দিনের বেলাও হৈ-হল্লা কিছু কম হয় না। ছেলেমেয়েদের দল-বেঁধে গান গাওয়া বন্ধ হলে মেয়েরা গান গাইতে শুরু করে দেয়। তার ওপরে সেদিন আবার কালুদের বাড়িতে পঞ্চায়েতের সকলের খাবার নেমন্তন্ন ছিল। যুবকেরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে উনুন তৈরি করে তাতে কড়াই চাপানোর কাজে লেগে যায় আর বুড়ো ও প্রৌঢ়েরা মালমশলা ওজন করে হিসেব লাগাতে থাকে— 'এক মণ ময়দায় ছাব্বিশ সের গুড় লাগলে, একশো দশ সেরেতে কতটা গুড় দিতে হবে তা হলে?'

দশ-বারোজন লোকে কাঁকড়ি (শশার মতো ফল) গুনে হিসেব করে করে রাখছিল। কিন্তু কোনো দলই অন্য দলের হিসেব ঠিক হয়েছে বলে মেনে নিতে রাজী নয়। রাজীই-বা হয় কি করে? দুদলে এক পদ্ধতিতে হিসেব করলে তবেই না ওজনে মিলবে? আর ওজনে মিললে তবেই না হিসেব ঠিক হয়েছে বলে ধরা যাবে?

এই লোকেরা একদিকে হিসেব নিয়ে সোরগোল করছিল অন্যধারে গানে মত্ত মেয়েদের তো তখন কোনো কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না। পেছনের দিকে উঠোনে রান্নায় ব্যস্ত ছেলেদের পরিবেশটা বরঞ্চ কিছুটা শান্ত ছিল। সামনের উঠোনের লোকেরা মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে যেমন আনন্দ পাচ্ছিল এরাও তেমনি নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা মস্করাতে খুশি ছিল···

এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস মালীর কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিক থেকে ভালোই বলতে হবে যে সে অন্য পাড়ায় তার নিজের বাপের বাড়িতে চলে যায়, নাহলে হয়তো—

তবুও রাগ হয়ে যায় তার। হবে না কেন? চোখ বন্ধ করে রেখেছিল বটে কিন্তু কান দুটো তো খোলাই।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে আসা গাড়ির ঘন্টি শোনা যাচ্ছিল। আশপাশের অন্য পাঁচ-সাতটা গাঁ থেকে বিয়ের নেমন্তন্নে যোগ দিতে আসার সময় মেয়েরা দল বেঁধে প্রাণ খুলে গান গাইতে গাইতে মরশুমের এই প্রথম বিয়ের লগ্নকে স্বাগত জানাচ্ছিল। মালীর মনে হচ্ছিল গানের ফাঁদ পেতে ঐ আনন্দমুখর যুবতীরা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হাজির হয়েছে।

খাওয়াদাওয়া শুরু হওয়ার পরও মেয়েদের গান থামে না।

পেছনের দিকে অন্য মহল্লাতে মালী নিজের মনেই ঝগড়া করতে থাকে, 'বুঝতে পারি না এই হতভাগা মাগীরা খেতে এসেছে না গান গাইতে এসেছে। কী দিয়ে যে ভগবান এদের মুখ তৈরি করেছেন কে জানে?···'

সারারাত মালী খাটের একবার এপাশ আর ওপাশ করতে থাকে।

ওদিকে কালুদের বাড়িতে কালই শেষ দিন বলে বেশি হৈ-চৈ, উল্লাস আর আনন্দ হতে থাকে। গলার আওয়াজ আর পায়ে যেন সব দ্বিগুণ শক্তি ফিরে পেয়েছে। এক-একবার মালীর মনে হয় যে কানের পর্দা বোধহয় ফেটে যাবে।

শেষ পর্যন্ত মালীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় আর সেই আগের দিনের মতোই সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে, মাথা কুটতে থাকে আর চুল ছিঁড়তে থাকে— 'বাপরে বাপ··· ! আমার ছেলে গায়ে হলুদ দিয়ে পড়ে রইল বলেই তোমরা সকলে খুব—'

সকাল হতেই মালী নানার মারফৎ বাড়িতে 'হুকুম' পাঠাল— 'খবরদার। কেউ যদি অপয়াটার বরযাত্রীতে যায় তো আমি তাকে দেখে নেব। আর নাথার বউকে বলে দিয়ো যে, গান গাইতে যে গিয়েছিল তা আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু বরযাত্রীতে গেলে যেন জেনে যায় যে বাড়িতে আর পা রাখতে দেব না।' বুড়োর জন্যেও এটা প্রযোজ্য ছিল।

তবুও নাথার বউ কথা শোনে না— নানা কথায় বলতে হলে, 'বেশ মেজাজের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে' বসেছিল।

এ খবরও মালীর কাছে অসহ্য হয়ে যায়। মনে প্রাণে সে আহত হয়। তবুও 'ছোটো বংশের মেয়ের আর কাজ কত ভালো হবে' বলতে বলতে সে হঠাৎ খাটিয়া থেকে নেবে পড়ে।

বলদেরা গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যেমন যায় শংকরের ঘোড়া তেমনি সেই বিস্তৃত মাঠে ধুলো-খড় উড়িয়ে যেতে থাকে আর উৎফুল্ল বরযাত্রী যুবতীদের গলায় গানের ঢেউ খেলতে থাকে—

'এক ঝালাবাড়ী সোপারী নুং ঝাড় ছে
অমারা কালুভাই নে টুঁপিয়ানী হোশ ছে
বেবাই না মলে তো অমনে কোই মে···ল
ঝালাবাড়ী সোপারী নুং ঝাড় ছে।'

(একটা ঝালোয়ারের সুপুরির গাছ আছে। আমাদের কালু ভাইয়ের একটা সোনার হার পাবার সম্ভাবনা আছে। ও বেয়াই তুমি যদি

ব্যবস্থা করতে না পারো তো আমাকে বলে দিয়ো।)

ওদিকে পরমার বাড়িতে গালাগালি গান গাওয়া হতে থাকে, রাত বাড়তেই ভাগাভাগির হিসেব নিকেশ চলতে থাকে…

রাজুদের বাড়িতেও বরযাত্রী আসে এবং ভোরবেলা পূজারী ব্রাহ্মণ ঢুলীকে ঢোল বাজাতে বলে সপ্তপদীর মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করে দেয় :

নিদ্রা মহীং নহি হতুং তনভান জ্যারে
জেগে জুবো পূরণ রক্ষণ কীধুং ত্যারে…

(ঘুমের সময় যখন শরীরের প্রতি কোনো খেয়াল থাকে না, সে সময়ে যিনি আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন—)

এমনিভাবেই ঢোল ও শানাইয়ের শব্দের মধ্যেই ব্রাহ্মণ বর-কনের হাত ভাই-বোনকে দিয়ে ধরিয়ে মিলিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার সময় বর-কনেকে আশীর্বাদ করা হয়, সিঁদুর পরানো হয়। পরের দিন সকালে বালিকা রাজু শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়—

এদিকে সন্ধ্যার সময় কালুর বরযাত্রীরা নতুন বউকে নিয়ে গ্রামে ফেরে। রূপা দেখে যে পাড়া একেবারে শান্ত হয়ে গেছে, শুনতে পায় যে, মালী, রণছোড় ও নানা অন্য পাড়ায় চলে গেছে— এ বাড়ি নাথা ও পরমার ভাগে পড়েছে জেনে সে ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে। যাকে দেখে তাকেই বলতে থাকে, 'আমার কালিয়ের বউ খুব পয়মন্ত হয়েছে দেখছি। পাড়ায় এত শান্তি— এত সুখ শ্বশুর বাড়ি এসে অবধি এই প্রথম দেখছি।'

তা ছাড়া ছেলের বিয়েতে এক পয়সাও ধার নিতে হয় নি। যা টাকা ছিল তাতেই সব মিটে যায় খরচপত্র— এও এই নতুন বউয়ের জন্যেই হয়েছে ধরতে হবে।

বৃদ্ধা ভাগ্যবতী হওয়ার ব্যাপার এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় যে সুন্দরী রাজুর সঙ্গে বসন্তের দাগে ক্ষত-বিক্ষত মুখ ভলীর তুলনা করতেও ভুলে যায়, বরঞ্চ ক্রমশ খুশিই হয়ে উঠতে থাকে—। 'হোকগে যাক, আমাদের মতো মেহনতী মানুষদের রূপ দেখে বসে

থাকলে তো চলবে না। আর হিসেবী বুদ্ধির কথা যদি বলো তো —সে আমার কালিয়ার যথেষ্ট আছে।'

শংকর যা বলছিল তাইই ঠিক। কালিয়ার থেকে ত্বছরের বড়ো তা ভালোই হয়েছে। লাভই হয়েছে, শ্বশুর বাড়িতে ত্বছর আগেই এসে যাবে। কাজেকর্মেও বেশ পাকা পোক্ত। আর বারবার বলতে থাকে, 'না, না! বউয়ের পা ভাগ্যমন্তই বটে তা না হলে কখনো—' রাজুর সঙ্গে তুলনা করার বদলে পাড়াতে আগের অশান্তি আর আজকের শান্তির তুলনা করতে থাকে, বারবার এই কথাই বলে 'সে যাই হোক-না-কেন, বউ আমাকে 'লোকসানে' ফেলে নি, তার জন্যে তো আমাকে কোনো ধার-দেনা করতে হয় নি। সৌভাগ্যবতী বটে। ওরা ঠিকই বলছিল যে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।' আর এরপরেই রূপার স্বামীর কথা মনে পড়ে যায়।

তার চোখে জল এসে যায় আর সে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—'ভগবান তাকে কখনো সুখের মুখ দেখতে দিলেন না। তা হলে আর ভালো কী করলেন— আর এখনি কী বিশ্বাস করি যে ঐ ছেড়ে চলে গিয়ে কালসাপিনী আমাকে সুখে থাকতে দেবে?' তবুও রূপাকে শেষ পর্যন্ত ভগবানকেই স্মরণ করতে হয়: 'যত খুশি ও গোলযোগ পাকাক। আমাকে দেখবেন ভগবান, তিনি তো আমার মাথার ওপরে।'

॥ পনেরো ॥

ভাষাহীন রাজু-কালু

নতুন বউকে রূপা অন্তরে মানিয়ে নিলেও যখনই সে রাজুকে দেখত মন কেঁদে উঠত। আর মন কাঁদবে নাইবা কেন? ভগবান রাজুর রূপের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করেন নি। দিন দিন সে রূপ বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে— বসন্তে যেমন লতা গাছ সতেজ হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, রাজু এখনো কালুর মার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে 'শাশুড়ী' কথাটা ব্যবহার করত। এখন সে বড়ো হয়ে গেছে। তার মা তাকে অনেক বার শুধরে দিয়েছে কিন্তু তবু তার ভুল হয়ে যেত, সে ঐ 'শাশুড়ী'ই বলে ফেলত।

একদিন মার সঙ্গে কথা বলার সময় গাঁয়ের অন্য পাঁচজনও শুনে ফেলে যেন— 'মা, আমাদের ভূরী (মোষ) আর আমার শাশুড়ীর চাঁদরী দুটোতে—'

কিন্তু মায়ের মুখ ঝামটানিতে রাজু আর কথাটা শেষ করে উঠতে পারে না। দু-চারজন স্ত্রীলোক হেসে ওঠে আর রণছোড়ের বউ ঠাট্টা করে—'এই মেয়েটা, তোর কটা শাশুড়ী রে?'

কালুর মাও লজ্জায় পড়ে যায়। রাজুর মা সেই রাস্তাতেই রাজুকে ধমকাতে থাকে, 'তুর হতভাগী, এত বার ধরে টিকটিক করি তবু ভুলতে পারিস না···খবরদার ফের যদি কখনো বলতে শুনি তো কেটে টুটুকরো করে ফেলব মনে থাকে যেন!'

কিন্তু বাড়িতে ফিরে গিয়ে মা নিজেই কাঁদতে থাকে। পাকা দেখা যারা ভেঙে দিয়েছিল তাদের অভিসম্পাত দেয়, 'নির্বংশ হয়ে যাস্ তোরা, আমার এমন সাধের কুটুম্বিতা—'

কালুর মাও ঘরের কোণে চোখের জল ফেলে।

ধীরে ধীরে কৈশোরের পথে এগোতে থাকা কালুর ভাগ্যে কান্না-

কাটি করার কিংবা চোখের জল ফেলার কোনো উপায় ছিল না। কারো কাছে মনের দুঃখ যে খুলে বলবে তেমন কোনো উপায়ও ছিল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে মনে মনে বলে, 'যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কী করা যাবে।'

কিন্তু কালু-রাজুর জগতে সেই ছোটো বাচ্চারা এখনো ব্যাপারটাকে ভুলতে পারে নি। ভুলে থাকবার কোনো, উপায়ও ছিল না। চাঁদনী রাতে 'লুকোচুরি' 'চোরচোর' কিংবা 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলার সময় সেই অতীতের বর-কনেরা এক হয়ে যেত। ভুল করে কখনো যদি একে অন্যকে ধরে বা ছুঁয়ে ফেলত তা হলে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠত, 'এ মা! রাজুড়ী ওর বরকে ধরে ফেলেছে, এ মা!'

কালু লজ্জায় পড়ে যেত, আর রাজু তো লজ্জার চোটে ছুটে পালাত। যেন পাখির মতো উড়ে যেত। ভয়েতে বাড়ি যেতে পারত না; কোনো নিরালা নির্জনে লুকিয়ে থাকত।

এখন অবশ্য তারা যথেষ্ট বড়ো হয়ে গিয়েছে। কালু খেলছে দেখতে পেলে রাজু সেই খেলাতে ভাগ নিত না। আর রাজুকে খেলতে দেখলে কালু একপাশে হাতে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

কিন্তু দিন যতই কেটে যেতে থাকে তাদের সমাজ একে অন্যকে দূর থেকে দেখার সুযোগও কেড়ে নেয়। কৃষ্ণচূড়া ফুলের ক্রমশ প্রস্ফুটিত হতে থাকা রাজুর বরাতে খেলতে আসা তো বন্ধ হয়ে গেলই, আড়ালে দূর থেকে কালুকে দেখার সুযোগও চলে যায়। মা তাকে বোঝায়, 'এখন তুই কত বড়ো হয়ে গেছিস সেদিকে তোর খেয়াল আছে? খবরদার আর কখনো খেলতে গেছিস কি দেখবি কী করি!'

কালুও যতই বড়ো হয়ে উঠতে থাকে ততই ধীর গম্ভীর হয়ে যায়, 'যার জন্যে আমার অপমান হয়েছে তার সঙ্গে আর কখনো আমি কথা বলব?'

এমনি ভাবেই কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে যে চার-পাঁচ বছর

আসে তারা দুজনে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে না, বিরোধের মধ্যেই তা কেটে যায়। জল ভরতে যাবার সময় কখনো দেখা হয়ে গেলে এমন ভাবে চোখ ফিরিয়ে চলে যেত যেন অন্য জন তার শত্রু। একবার মাথায় বোঝা উঠিয়ে দেবার জন্যে রাজু কোনো উপায়ান্তর না দেখে কালুর সাহায্য নেয়, কিন্তু সে সময়েও দুজনে কোনো কথা বলে নি। রাজু মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে— সামনের দিকে তাকায় নি।

সত্যি কথা বলতে কি কালু-রাজু নিজেরাই আপন খেয়ালে কথা-বার্তা বলা বন্ধ করে দেয়, নাহলে সমাজের সকলে তো এত বছর কেটে যাওয়াতে ভুলেই গিয়েছিল সব-কিছু। প্রসঙ্গক্রমে কখনো এ বিষয়ে কোনো কথা উঠলে সকলেই বলত— এতে অবাক হবারও কিছু নেই আর দোষেরও কিছু নেই। পাকা দেখা সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। বহু ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে। অদল-বদল হয়ে যাওয়া পাত্র-পাত্রীরা বড়ো হয়ে কখনো দেখাসাক্ষাৎ হলে সকলের সামনেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, 'আমাদের পাকা দেখা অমুক কারণের জন্যে ভেঙে গিয়েছিল, নাহলে আজ আমরা স্বামী-স্ত্রী হতাম।' এ কথা বলে বক্তা নিজেই হাসত এবং যারা শুনত তারাও হাসত।

কালু-রাজুর নীরবতা ভাঙতে এইটুকু শব্দেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কে আগে বলবে কথা? কালু-কোদরের ছেলেবেলার বন্ধুত্ব আবার নতুন করে গড়ে উঠেছিল। একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করত। বয়স্কদের সাথেও কথাবার্তা হত। তারা নিজেরাই সেই পুরোনো প্রসঙ্গ তুলে দুঃখ জানাত। কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কালু কোনোদিন রাজুর সঙ্গে কথা বলে উঠতে পারে নি। আর না পারে রাজুও কোনো কথা বলতে। দুজনেই চাইত যে আগে অন্য জন কথা শুরু করুক তবে সে কথা বলবে।

একবার গ্রামের সব যুবক-যুবতীরা ঝালাদেবের (গ্রাম্য দেবতা) মেলা দেখতে গিয়েছিল। গোঁফের রেখা তখনো ভালো করে না

উঠলে কী হবে কালুরও একটা দল ছিল নিজের। নানাকে যুবকদের মধ্যে পাণ্ডা বলে মানা হত। কিন্তু সে নিজে তার দলে যায় না আর কোদরকেও যেতে দেয় না। শংকরের পনেরো বছরের ছেলে ভগাকেও আটকে নেয় সে, 'যারা যেতে চায় এখন যেতে দে তাদের। আমরা তো সবার শেষে বেরোব আর সকলের আগে পৌঁছাব।'

ভগার বোন রুথী কথাটা জানতে পারে। ওধারে রাজুও শোনে কথাটা কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এদের সঙ্গে যাবার সাহস করে উঠতে পারে না। যত যাই হোক-না-কেন ওরা বেটাছেলে তো বটে; আর মেলায় যেতে হবে তাদের নির্জন পথ দিয়ে।

কিন্তু সেই গভীর জঙ্গলের রাস্তায় ঢোকার মুখেই যুবতীরা তাদের নিজেদের গানের মধ্যেই যেন অন্য একটা গানের শব্দ এসে ধাক্কা দিচ্ছে অনুভব করে—

'ধীরো বোরীলা নে হাটে রে, ধীরোরে মেবাসী।
ধীরো বংগড়ী মূলবী জুবে রে, ধীরোরে মেবাসী।
ধীরো পেরী ফেরবী জুবে রে, ধীরোরে মেবাসী।
ধীরো কোনা সারু ধীংরো রে, ধীরোরে মেবাসী।
মারে নানীশী ধনিয়ানী রে, ধীরোরে মেবাসী।
মারে এনা সারু বোরুং রে, ধীরোরে মেবাসী।
ধীরো বাণীলানে হাটে রে, ধীরোরে মেবাসী।'

(মেওয়াস গ্রামের ধীরো বেনের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়। ধীরো চুড়ির দাম জিজ্ঞেস করে। ধীরো সেগুলো হাতে পরে দেখতে থাকে। (জিজ্ঞাসা করা হল:) 'ধীরো কার জন্য কিনছ এ-সব?' 'আমার ছোট্ট একটা বউ আছে, তাঁর জন্যেই কিনছি।' ধীরো বেনের দোকানে রয়েছে এখন।)

কালু কোদর প্রভৃতি নিয়ে দলে লোক মোটে পাঁচ-ছ জন কিন্তু গানের আওয়াজ শুনে মনে হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ জন লোক আসছে। রাজু রুথী ও আর-সকলে দেখে যে কালু, কোদর এবং ভগা সকলের আগে সার বেঁধে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কালুর মাঝারি গড়ন এবং

বলিষ্ঠ চেহারা। সে মাথায় চুড়ো রেখে পাগড়ি বেঁধেছে। কানে বুনো ফুল, হাতে তার তীর-ধনুক। কোদরের হাতে তলোয়ার আর ভগা বর্শা নিয়ে ছিল··· ।

এই যুবকদের সাহস দেখে, এদের এগিয়ে পার হয়ে চলে যেতে দেখে, অথবা নানা-রামাদের গানের থেকেও এদের গান শুনতে অনেক ভালো বলেই হোক বা অন্য যে-কারণেই হোক-না-কেন রুখী এদের সাথে যেতে থাকে, আর রাজু তো শুরু থেকেই তাই চাইছিল এবং দলের দুজন প্রধান মেয়েকে অন্য দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে দেখার পর কেইবা আর পেছনে পড়ে থাকতে চায় ?

কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেল নানা, রামা প্রভৃতি দু-চারজন যুবকই কেবল একলা পড়ে থাকে। এরণ্ড গাছের আশপাশে ফুলে ভরা যে বাগান ছিল তা যেন ছড়িয়ে এধার-ওধার আলাদা হয়ে গেছে! হ্যাঁ, কেবল মাত্র নানার খোঁড়া বউ পা টেনে টেনে পেছনে আসতে থাকে।

'আমাদের কি শেষকালে চুড়ি পরতে হবে নাকি নানা! চলো তাড়াতাড়ি সকলে', রামা বলে।

কিন্তু নানার মনে মনে রাগ হওয়ার জন্য বা ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা না থাকায় বা সেটা ছেলেমানুষী হবে ভেবে—তা সে যে-কারণে হোক, তবে বউয়ের ওপর দয়াপরবশ হয়ে নয় কিন্তু—হেসে শুধু বলে, 'যেতে দে না ওদের। মেয়েরাও সঙ্গে গেছে, রাস্তায় মাতাল ভীলেরা ধরলে মজা বেরিয়ে যাবে তখন।'

কিন্তু মেলায় পৌঁছে দেখে সকলেই নিরাপদ রয়েছে। সকলেই খুব খুশি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কালুর মারফত জিনিসপত্র কেনা-কাটা করছে।

কোদর ভগা প্রভৃতিরা তীর তৈরি করার শরকাঠি কিনতে গেছে, তাই কালু এই যুবতীদের সঙ্গে একলা থাকতে দেখে নানার অবস্থা এমন দেখায় যেন তার পেটে কেউ গরম তেল ঢেলে দিয়েছে। আর কী আশ্চর্য তার খোঁড়া বউও ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে! কালুর

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে বলে, 'ও কালু ভাই! এই এক আনা দিয়ে আমাকে ভালো দেখে চুড়ি কিনে দাও-না ভাই!'

কিন্তু কালু একা কত জনের কেনাকাটা করবে? রাজু তার নিজের সব পয়সা— আনি সিকি হাতে করে রেখেছিল। কালুরও ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল, 'ও যদি বলে তবেই এনে দেব!'

রাজুর যথেষ্ট আড়ষ্টতা ছিল। রুখী তাকে ঝাড়ুর দোকানের সামনে জিজ্ঞেস করে— 'কী রে বল-না! তোর কী নেবার আছে? কাঁচুলির জন্যে ফিতে নিবি বলছিলি যে?'

কিন্তু রাজু, 'তোর নিজের যদি নেবার থাকে তো নে-না তুই', বলে চুপ করে থাকে। চুড়ি কেনার সময় একবার ইঙ্গিতও দেয়—'আমায় আর কে কিনে দেবে ভাই!' এর পরেও সোজাসুজি কালু বলতে পারে না বলে বলাও হয়ে ওঠে না।

শেষ পর্যন্ত কালুকেই নত হতে হয়, অবশ্য অন্য ভাবে। সে দু-জোড়া পুঁথি-দিয়ে-বোনা কাঁচুলির ফিতে নেয় আর দু-আনার চুড়ি কেনে। একটা সুন্দর পছন্দসই বিঁড়েও নেয়। রুখী, নানার খোঁড়া স্ত্রী ও অন্যেরা তাকে ক্ষেপাতে থাকে—'তুমিও তো দেখছি ঐ ধীরোর মতোই কাজ করছ কালু ভাই! ···কিন্তু তোমার মনের মানুষ, আমাদের ভলী বউদি তো মেলায় এসেছে! আর সে তো তোমার থেকে বয়সে বড়ো', কানে কানে জিজ্ঞেস করে—'তোমার আবার অন্য কে ছোট্ট বউ আছে তা হলে?'

কালু এর কী জবাব দেবে?

কিন্তু সে জবাব না দিলেও রাজু বুঝতে পারে কার জন্যে সে-সব জিনিস, তাই সে নিজেই কি এবার কেনাকাটা শুরু করে দেয়? কালুর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে বারণ করে দেয়, বলে দেয় যে, সবই তো কিনেছি।'

রাজুকে বিঁড়ে কিনতে দেখে সে সমস্ত জিনিস রুখীকে দিয়ে বলে, 'এই নে রুখলী, এগুলো সব ঐ ঝাড়ুর দোকানে ফেরত দিয়ে দে।'

বোকা রুখী হাসতে থাকে—'তবে! আমি কি বলছিলাম কি

একটু—'

ঠিক এই সময়েই রাজু ভালো করল কি খারাপ করল তা সে-ই জানে, তবে সমস্ত প্রসঙ্গটাকেই সে ঘুরিয়ে দিল 'তোর মাথাতে কিছুই আসে না ! এ-সব তো আমার ভাইঝির জন্যে কিনেছে ।'

আর সত্যি সত্যি সে মেলার মধ্যে ভলীকে খুঁজে বার ক'রে তার হাতে কালুর কেনা সব জিনিসগুলো দিয়ে বলে, 'ভলী বোন, তোমার কর্তা এ-সব তোমার জন্যেই কিনে পাঠিয়েছে ।'

ভলী গরিব ঘরের মেয়ে, এ-সব পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে ।

আর এই-সমস্ত ব্যাপারটাতে কালু এত লজ্জা পায় যেন কেউ তার গালে এক ঘা চড় বসিয়ে দিয়েছে ।···

বাড়ি ফেরার পথে সারা রাস্তা কালু এ কথাটাই নানা ভাবে ভাবতে ভাবতে আসে । কিন্তু কোনোই সমাধান খুঁজে পায় না, 'রাজু কি সত্যি সত্যিই খুব রাগ করেছিল নাকি রুখলী আর অন্য সবাই জানতে পেরে গিয়েছিল বলেই এমন করলে ?' রাজুকেই প্রশ্নটা করার ইচ্ছে হচ্ছিল তার । কিন্তু সেই মেলাতে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রচুর সুযোগ ও রাজুর তরফ থেকে প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ছেলেবেলা থেকে বড়ো হয়ে-ওঠার এই দীর্ঘ সময় অবধি কথা না বলার অভ্যেস যখন কাটিয়ে উঠতে পারে নি এখন গ্রামে ফিরে এসে আর কাটায় কি করে সে দ্বিধা ? বরং যে নীরবতা, যে দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার দরকার ছিল তা যেন আরো অনেক বেশি বেড়ে গেল ।

॥ ষোল ॥

যৌবন-জ্বালা

চৈত্র-বৈশাখের নবপত্রপল্লবিত সজল শ্যামল প্রফুল্ল বনরাজিমালার মতোই কৈশোর পেরিয়ে যুবতী রাজুর রূপলাবণ্য বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। তার উজ্জ্বল আয়ত চোখে আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। তার গতিতে ছন্দ ফুটে ওঠে আর কথায় তো প্রতি শব্দেই ঠাট্টা অথবা কৌতুক ধ্বনিত হয়।

কালুর কিন্তু সেই হাসি-ঠাট্টা শোনার ভাগ্য হয় না। তার বরাতে কেবল ভগা, রামা প্রভৃতির সঙ্গে রাজুর এই হাসি মস্করা ও সদ্ভাব দেখে মনে মনে জ্বলুনিই সার। শেষে ক্রমশ কালুর ধারণা জন্মায় যে রাজু তাকে রাগানোর জন্যেই রামা, ভগার সঙ্গে এইভাবে হাসি-ঠাট্টা করে।

'রামা ভাই, ইন্দ্রধনু দেখতে বড়ো সুন্দর হয় কিন্তু কি কাজে আসে বল? রূপ দেখে যদি কেউ সেটা খেতে যায় তা হলে মৃত্যুই হবে তো তার, তাই না?'

কালু এ কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করে। আর এই এক কথার অনেক মানে হতে পারে দেখে মুশকিলে পড়ে যায়। এক সময় রাজুর ওপরে রেগে যায়, 'ও নিজে যা মনে চায় বলুক-না, কিন্তু এভাবে আমাকে শোনাবার কী দরকার?'

একদিন তো রাজু একটা কাণ্ডই বাধিয়ে বসে। দুপুরবেলা ক্ষেত থেকে ঘরে ফেরার সময় কালু দুটো মাঠ দূরে আলের ওপর রাজুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার গলার আওয়াজও শুনতে পায়—'নানা ভাই, এই বোঝাটা মাথায় চড়িয়ে দাও-না ভাই!'

সামনে যেতে যেতে নানা মাথা সমান উঁচু ভুট্টার ক্ষেতের মধ্যে ঢোকে। তা দেখে কালু ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে। রাজু তো আজ চূড়ান্ত দেখালে। তাকে দেখা সত্ত্বেও রাজু ঐ শয়তানটাকে

মাথায় বোঝা তুলতে ডাকলে !

একবার কালুর এও মনে হল, 'আমাকে হয়তো দেখতেই পায় নি ! তা হলে কি নিজেদের মধ্যে গোপনে ভাব-ভালোবাসা চলছে ?' আর সে নিজেও ভুট্টার ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে ওদের ভালো করে দেখার জন্য।

নানাকে ফিরে আসতে দেখে রাজু বোঝা ওঠানোর জন্য ঝুঁকে দাঁড়ায় কিন্তু নানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে, সে বলে, 'বোঝা উঠিয়ে দিলে কিছু মজুরী পাব কি, নাকি এমনি এমনিই উঠিয়ে দিতে হবে ?'

নানাকে দেখতে খুবই সুন্দর : লম্বা ফর্সা এবং পাতলা দোহারা চেহারা। হাতের বাহুতে সোনার তাগা, আঙুলে রুপোর আংটি। কানের লতিতে মাকড়ি আর ওপরের অংশে ছোটো ছোটো কড়া আর সারা কান জুড়ে সোনার ঝুমকো দুল। সেই সাথে গান দোঁহা আর ছড়াতে চোস্ত এবং কথাবার্তায় চৌকস।

নানার কথা কালু পুরো শুনতে পায় না। কিন্তু ভঙ্গি দেখে মতলব বুঝতে পেরে যায়। আর তার মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে চড়ে যায়।

'নাও-না, উঠিয়ে দিতে হয় তো দাও-না !' রাজু একটু রাগ রাগ স্বরে বলে।

'এমনি এমনি কেউ উঠিয়ে দেয় নাকি ? কতদিন থেকে আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তা তুই কি জানিস ? তোকে পাবার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেছি রে রাজু !' শেষ কথাটা বলতে বলতে হাত বাড়ায়।

কালুর নিশ্বাস থেমে যায় যেন। চীৎকার করে বাধা দিতে যাবে ততক্ষণে 'ঠাশ' করে একটা আওয়াজ হয় আর কালু খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাঃ, বেশ হয়েছে।'

রাজুর দিকে এগিয়ে আসা নানা লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। কুকুর যেমন লেজ গুটিয়ে পালায় ঠিক তেমনি ভাবে সে ভুট্টার ক্ষেতের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

অত্যন্ত খুশি হয়ে কালু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোঝাটা উঠিয়ে দিতে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েও রাজু দু-মনি বোঝা একাই মাথায় তুলে নেয়। কালু বলতে চেয়েছিল, 'ধন্য তুই রাজু, ধন্য তোর বাবা-মা', কিন্তু তার ঠোঁটের ডগায় এসে থমকে যায় শব্দগুলো।

আর তাই আজও তাদের মৌনতা কাটাতে পারল না।

রাজুর আজকের এই নতুন পরিচয় পেয়ে কালুর অন্তরের জ্বালা কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যায়। 'আহা রে! রাজুর মতো স্ত্রী হত যদি··· জীবন সার্থক হয়ে যেত! দেখেই চোখ জুড়িয়ে যেত, ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে যেতাম···' মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই হতাশার নিরুপায় নিশ্বাস ফেলতে হয়। আসলে এখনো তার বাসনায় রাজুর চিন্তা জেগে ছিল।

গাঁয়ে প্রবেশ করতেই তার কাছে পাড়ার থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। কালু কান্নার আওয়াজ চিনতে পারে; রাজু এত জোরে কাঁদছিল যেন ওর মা-বাবা মারা গেছে। নীরবে কাঁদলে তার দুঃখের পরিমাণটা অনুমান করা যেতে পারত। তাকে বোঝানো সম্ভব হত; কিন্তু সে ছেলেমানুষের মতো চীৎকার করে কাঁদতে থাকে।

তবুও কালু যেন বুঝতে পারে, 'অন্য কোনো কারণ নয়, যে জন্যে আজ আমার হৃদয় কাঁদছে, রাজুও সেই কারণেই কাঁদছে!'

কালুর এই বিশ্বাস সত্যি কি মিথ্যে তা ঈশ্বরই জানেন কিন্তু রাজু নিজেই বুঝতে পারে না সে কেন কাঁদছে। মা অনেক করে জানতে চেষ্টা করে 'মাথার থেকে বোঝা নামিয়েই তুই কাঁদতে বসেছিস কিন্তু কি হলটা কী? কেউ কিছু বলেছে, নাকি কোনো জন্তু-জানোয়ারে কামড়াল কোথাও?'

রাজুকে কিছুতে দংশন করেছিল তো বটেই কিন্তু তার মা যেমন ভাবছিল তেমনি কোনো সাপ-বাঘের কাজ এ নয়। মা দেখতে থাকে তার হাত-পায়ে কোনো কামড়ের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু

ফুল ফুটেছিল তার অন্তরতম হৃদয়ে— যে জীবন আজ মাটির সাথে মিশে বিলীন হয়ে গেছে সেই অতীত জীবনের নিভৃত প্রদেশে কোথাও ব্যথা লেগেছিল। কল্পনার রঙিন স্বপ্ন যৌবনকে আহত করেছিল আর সেই আঘাত প্রেম হয়ে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন ছড়িয়ে পড়ে।

মাথায় বোঝা নিয়ে বাড়ির দরজার কাছে আসতেই বোঝার ওপরে বসে থাকা পাখিটি উড়ে যায়— সেইসঙ্গে মনের নিবিড় কল্পনাও যেন উড়ে যায়। রাজুও এতক্ষণে বুঝতে পারে শরীরের রক্ততরঙ্গে যে বিষ ছড়িয়ে গেছে তার কোনো চিকিৎসা সম্ভব নয়, এর হাত থেকে কোনো মুক্তি নেই, মুক্তি যে দিতে পারে তাকেও এ জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়…আর—

আশাবিহীন অন্তরে হতাশার ঘূর্ণি ওঠে, সেই উজ্জ্বল আয়ত চোখ দুটিতে জল ভরে আসে আর—

ভগ্ন আশার জন্য কান্না ছাড়া আর কিই-বা উপায় আছে ?

রাজু চিন্তিত থাকে, বার বার জিজ্ঞেস করে বিরক্ত কোদরের স্ত্রী কেনারকে, ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের কী বলবে ? কী উত্তর দেবে ? উত্তর দেবার মতো কোনো কারণ ছিল না বলেই সে কান্নার জবাব কান্না দিয়েই দিতে থাকে।

কিন্তু এখানে সে কথা বোঝে কে ? একমাত্র বুঝতে পেরেছিল কালু, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেই থাকে সে। বিড়বিড় করে মনে মনে বলে, 'কেন যে লোকেরা একে বিরক্ত করছে এখন ? সাপেও ওকে কামড়ায় নি বাঘেতেও না। এ জ্বালা যৌবনের, অন্য কিছুর নয়।'

সে অন্য লোকেদের ভিড় সরিয়ে দেয় এবং কোদরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতের দিকে এগোয়, 'চল আজ ভুট্টা পোড়াবো।'

কে জানে কেন আজ তার সমস্ত হৃদয় এক অবর্ণনীয় আনন্দে মেতে উঠেছিল, নিঃস্ব ভিখিরী হঠাৎ প্রচুর ধন সম্পদ পেলে যেমন খুশি হয়ে ওঠে তেমনি এক পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে।

॥ সতেরো ॥

গতস্য শোচনা নাস্তি

ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকের এক বিকালবেলা। রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার দিন হলেও আকাশে মেঘেরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভুট্টার ফসলে ভরা বিস্তৃত মাঠে আলো-ছায়ায় এক মনোরম দৃশ্য ঢেউ খেলে যেতে থাকে। মৃদুমন্দ বাতাসে ভুট্টার শীষগুলো যেন খুশিতে নেচে উঠছিল! টিয়া ও কাকেরা এই স্তব্ধ প্রহরে ক্ষেতে নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে কিন্তু তারা কোথাও শান্তিতে বসতে পারে না। মাঠে নেমে বসতে না বসতেই আলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে মাঠের পাহারাদার চীৎকার করে ওঠে, 'টিয়া ···ও টিয়া···। যাঃ···যাঃ··· পালাঃ··· ।'

তবুও সাহস করে সেই সবুজ রঙের পাখিদের যেগুলো মাঠে নেমে পড়ছিল তাদের 'ফরাক' করে গুলতি থেকে পাথর ছুটে এসে উড়িয়ে দিতে থাকে!

ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্লান্ত পাখিরা শেষে মাঠের ধারে কোনো গাছেতে আশ্রয় নেয়, বিশেষ করে কালুদের ক্ষেতের বটগাছটায়।

কিন্তু সেখানেও যে কালু তাদের নিশ্চিন্তে বসতে দিচ্ছিল এমন নয়। কালু আর কোদর ছ-আট হাতের ঘুপচি কুঁড়েঘরে বসে না থেকে টিয়া তাড়াবার জন্যে গোটা দুয়েক করে স্যাঁকা ভুট্টা নিয়ে খোলা ছাতে এসে বসে। কালু আলগা গায়ে বসেছিল। গল্পগুজব করতে থাকলেও তার নজর সবসময় ক্ষেতের চারধারে ঘুরতে থাকে। বটগাছেও বার বার পাথর ছুঁড়ছিল!

কোদর না বলে আর থাকতে পারে না—'তোদের জমির পাহারা তুই তো এবার থেকে একাই দিতে পারবি ভাই। পাথর ছোঁড়ার জন্যে তোর গুলতিরও দরকার হয় না। তোর হাত যে কী দিয়ে তৈরি কে জানে।'

সত্যিই কালুর হাত লোহার মতোই শক্ত আর মজবুত চওড়া। 'তুই গুলতি দিয়ে ছোঁড় আর আমি হাত দিয়ে ছুঁড়ব, দেখি কার পাথর দূরে যায়?' কালু বেশ গর্বের সঙ্গে বলে।

কোদরেরও মেজাজ চড়ে যায়, 'অত বড়াই করিস না!'

'ওঠ তা হলে। এই নে গুলতি।' কালু চালেতে গুঁজে রাখা গুলতিটা টেনে বার করে দেয়।

'নে ওঠ, দেখা যাক এবার।'

কালু চালাঘরের দেয়ালের দিকে একটু সরে আসে আর কোদর জমা করে রাখা পাথরের থেকে একটা পাথর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, গুলতি ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, 'লক্ষ্য ঠিক রাখিস।'

ধাবমান পাথরটার দিকে এক দৃষ্টে নজর রাখতে রাখতে কালু বলে, 'ওই ওদিকের ফুলের ঝোপের কাছে পড়ল। ঠিক ঐ বাবলা গাছের গোড়ার কাছেই পড়েছে।'

কোদর সায় দিয়ে বলে—'হ্যাঁ, ওখানেই পড়েছে। নে এবার তুই ছোঁড় দেখি। আমার থেকে ছোটো পাথর নিস না যেন, তা হলে সে তো হাওয়াতেই ভর দিয়ে…'

'ঠিক আছে, তা হলে তুই বেছে দে পাথর।'

কোদর অবশ্য বেশি বড়ো পাথর না তুলে নিজের মাপ মতোই পাথর বেছে তার হাতে দিয়ে বলে, 'নে, এইটা ছোঁড়।'

কালু পাথর নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ায়, 'ঠিক করে দেখ তা হলে এবার।'

যে হাতে পাথর আছে তার বলিষ্ঠ শরীর সে দিকে ঝুঁকে যায়। সারা দেহ ধনুকের মতো বেঁকে যায়। চোখের দৃষ্টি দুটো ক্ষেতের ওপারে জমিতে স্থির নিবদ্ধ। কোদরের মনে হয় কালু যেন নদীর তীরের গাছগুলোর উপরে নিশানা করছে।

হাতের পাথরটা যতদূর অবধি যাবে বলে কালু ভেবেছিল ততদূর অবশ্য গেল না। কিন্তু কোদর গুলতি দিয়ে ছোঁড়া পাথরের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়ে। এক দু-হাত দূরে নয়, অন্তত কম করে হলেও

বিশ-পঁচিশ হাত দূরে।

কোদর কালুর বিশাল বুক আর চওড়া কাঁধের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকে। তারপরে খুশি হয়ে বলে, 'তোর গায়ে কী ভীষণ জোর রে বাবা!'

'ভগবান একা আমাকে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে, আর এটুকুও যদি না দেন তো—'

'একলা আছিস বলে দুঃখ করছিস কেন? নিজের বউকে আনিয়ে নে না! আমার মা বলছিল তোর বুড়ী মা বেচারি আর সংসার টানতে পারছে না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে এবার মেয়েকে পাঠাতে বল। তুই পরমা কাকাকে দিয়ে খবর পাঠা!'

কোদরের কথা কালু বোঝে সবই কিন্তু নিজের মতের সঙ্গে তা খাপ খায় না। সে নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে বলে— 'কাজকর্ম থেকে রেহাই দিয়ে কে আর মেয়ে পাঠায়? ঝাড়া হাত-পা মেয়ে আর দুধেল গাইকে কার না পছন্দ বল?' আর সে বলেই দেয় শেষ পর্যন্ত, 'তোদের মতো বোঝদার লোকেরাই যখন অবুঝের মতো বসে আছে তখন আর কি হবে?'

কোদর সাফাই গায়, 'রাজুর কথা বলছিস তো— আমার মা বলছিল যে এই দেওয়ালীর পরেই শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেবে তাকে। কিন্তু তোর বউ তো অনেক বছর আগে থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসবার যুগ্যি হয়ে গেছে।'

'আমাদের সমাজের এটাই একটা সবচেয়ে বড়ো দুঃখের ব্যাপার। কাজ করতে করতে মেয়ে যখন মুখ হাঁড়ি করে থাকবে তখন সবার চোখ ফুটবে।'

আসলে কালু কোদরকে শুধু শোনানোর জন্যেই এ-সব কথা বলছিল নইলে তার নিজের বাড়ির কাজকর্মের তার কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। স্ত্রীর জন্যেও কোনো বাসনা-কামনা অনুভব করে নি। সে কেবল চাইছিল, রাজু শ্বশুরবাড়ি গেলে তবেই ভাবনা-চিন্তা দূর হয়, নইলে কখন—' আর সে কোদরকে বলেই ফেলে—

'মনে নেই তোর? ওই মাণ্ডলের বোন সেবার কিরকম গণ্ডগোল বাধিয়েছিল? আমার বাবা বলত যে যেদিন থেকে মেয়ে অন্যদের দিকে পেছন ফিরে কাঁচুলি পরতে জানবে সেদিন থেকেই সে শ্বশুর বাড়ি যাবার যুগ্যি হয়ে গেছে।' এতক্ষণে বাদে এবার বটগাছে টিয়া পাখি বসে থাকার কথা মনে পড়তেই সে তাড়াতড়ি উঠে দাঁড়ায়, 'এই টিয়া, টিয়া··· ! দুর, তোদের জাতের নিকুচি করেছে, সারা বটগাছ ছেয়ে গেছে একেবারে··· ! দিন তো পড়ে এল, এবার অন্তত মুক্তি দে আমাদের !'

'ওরে বাপরে! আকাশ ছেয়ে গেছে একেবারে যেন!' উড়ন্ত টিয়ার ঝাঁক দেখে কোদর বলে ওঠে।

অস্তগামী সূর্য সোনার থালার মতোই ঝকমক করছিল যেন মুচকে হাসছে! পাখিরা মাঠে নামা ক্রমশ বন্ধ করে আর চারধারে ছড়িয়ে থাকা টিয়া ডাক পাড়তে পাড়তে ক্ষেতের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উড়ে যেতে থাকে। আকাশের দিক্‌দিগন্তে মেঘেরাও যেন ক্লান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলগা হয়ে···সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে তারাও হেসে বিদায় জানায়···এবং তার পরেই মনে হয় যেন গেরুয়া রঙের চাদর টেনে শুয়ে পড়েছে।

কালু কোদর চালাঘরের মাচান থেকে নেমে আসে। সারা রাস্তা দুজনেই একরকম চুপচাপ থাকে, দু-একটা কথাও যা বলে তা চাষ-বাসের কিংবা কালকের কাজের বিষয়ে।

আসলে কালু তখনো চিন্তা করছিল, কোদরকে সে বলবে মনে করছিল যে, 'দেওয়ালী অবধি অপেক্ষা না করে আজকালের মধ্যেই রাজুকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দে-না কেন।' কিন্তু বলে কি করে, সে কথা? বর্ষাকালে এই সময়ে প্রথম মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো রীতি নয়। কেউ পাঠালে অন্য লোকেরা মনে করতে থাকে, 'কোনো গোপন প্রেমের ব্যাপার ঘটে নি তো?' তাই বেশি জোর দিয়ে সে বলে কি করে? কোদর নাহয় বুঝবে কিন্তু তার মা-বউ তো অন্য মানে করবে, 'জ্ঞান দিতে এসেছে যে, তা আমাদের রাজু কি কোনো

গণ্ডগোল করেছে যে এখনি পাঠাতে হবে ?'

কালুর কাছে এ কথার কোনো উত্তর ছিল না। রাজু যে ভুল পথে যাবে এমন সম্ভবই নয়। তবুও তার ভাবনা হতে থাকে, 'ঘাস পাতা আনার জন্যে সে মাঠে গেলে নানা যদি আজকের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ওর পেছনে লাগে তা হলে এই নির্জন মাঠে তাকে বাঁচাবে কে ? মেয়েদের আর কতটাই বা ক্ষমতা ?'

তাই সুযোগ পেতেই সে পরোক্ষভাবে রাজুকে শুনিয়ে দেয়, 'অবস্থাপন্ন সংসার আর মনের মতো সুন্দর বর পেলে তো সকলেই সুখে ঘরকন্না করতে পারে কিন্তু গরিব ঘর আর নিঃস্ব স্বামীকে নিয়েও যে সুখে দিন কাটাতে পারে সংসারে তাকেই কৃতিত্ব দিতে হবে।'

কোদর বলেছিল যে দেওয়ালীর পর রাজুকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে। তা দেওয়ালী আসতে তেমন কিছু দেরি নেই। মোটে দেড়-দুমাসের ব্যবধান। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে লোকেদের দেওয়ালী মানে যে ঠিক কি তা কালু জানত, 'বলবে দেওয়ালীর পরে পাঠাবো কিন্তু আসলে পাঠাবে দোলের পরে হয়তো !'

তার নিজের মা বউকে আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কালু তাই বলে, 'তুমি যতই চেষ্টা করো-না-কেন রাজুড়ীকে শ্বশুরবাড়িতে আগে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা না করলে ওরা তোমার বউকেও পাঠাবে না।'

কথাটা মার কাছে ঠিক বলেই মনে হয়। গোরু-বাছুর নিয়ে যাবার সময় কিংবা জল ভরে ফেরার পথে এরপর থেকে দেখা হলে কালুর মা নিজের দুঃখের কথা বলতে থাকে কেবলই—

'সংসারের কাজকর্ম আর তো আমি টানতে পারি না··· ওদিকে আপনার বেয়াইরা তো কিছুতেই রাজী হয় না। কিন্তু বেচারী তারাই বা কী আর করবে ? তাদের চাষের কাজকর্ম করার লোকও তো দরকার। ভলী ছাড়া আর কেই বা করার আছে ?··· কিন্তু

এদিকে আমিও যে আর পেরে উঠছি না। যাকগে যাক, বউয়ের হাতের রুটি মরার আগে আমার বরাতে জুটবে, যদি কপালে লেখা থাকে তা হলে…' কালুর মা সত্যিই একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছিল। মরবার ফুসরৎ ছিল না বলেই যেন কোনো মতে বেঁচে আছে।

রাজুর মার শরীরে দয়ামায়া ছিল। তবে রূপার ক্ষেত্রে দয়ার চেয়েও পুরোনো যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছিল তার টানও খানিকটা ছিল। কালুদের বাড়ির ভালোমন্দ চিন্তার ব্যাপারে সেই পুরোনো সম্পর্ক আজও কাজ করে।

কোদরের মা তাই দেওয়ালীর পরেই রাজুর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠায়, 'বেয়াই যেন অমুক দিন অমুক ক্ষণে কুটুম নিয়ে রাজুকে নিয়ে যেতে আসেন।' কালুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রাজুর জন্য দশ-বারো জোড়া নতুন কাপড় কিনে আনে।

কথামত পনেরো-কুড়িজন অতিথি এসে উপস্থিত। কিন্তু রাজুর বাড়ির লোকেদের বরাতে যেমন বিয়ের লগ্নে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর ব্যাপারেও সেই একই দুর্ভাগ্য দেখা দেয়। নিমন্ত্রিতদের জন্যে রান্না শেষ হবার পর পরিবেশন করার সময় কালু নিজের বাড়ি চলে যায়।

কোদর নিজে তাকে ডেকে আনতে যায় কিন্তু তাকে শুধু বলে, 'তুই তো সবই জানিস কোদর!… আমি যাব না ওখানে!' কোদর এরপরে আর কী করে জোর জবরদস্তি করে? আর ছেলের মুখে 'ও তো আসবে না' এই উত্তর শোনার পর মা-ই বা কি করে রাজী করাতে আসতে পারে!

নানাকে ভালো বলতে হবে যে সে, 'আসে নি তো তাতে আর অসুবিধেটা হয়েছে কি? ডেকে নিয়ে আসুন অতিথিদের, খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করুন', এই বলে সমস্যার সমাধান করে দেয়।

অতিথিরা উঠোনের একধারে সার দিয়ে খেতে বসে, তাদের পরিবেশনের কাজ শুরু হয়ে যায়। উঠোনের অন্য দিকে হামান-দিস্তে, কুলো, ঝাড়ু, ছাতের টালি, হুকো ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস

পড়েছিল, 'নিন্ এ-সব বাধাগুলো সরিয়ে খাওয়া শুরু করে দিন।'

প্রায় সারা গাঁয়ের লোক এসে সেখানে জড়ো হয়ে ছিল। বাধা সরাতে অতিথিদের অসুবিধে তারা উপভোগ করতে থাকে। হাসি-ঠাট্টার ফোয়ারা ছুটতে থাকে চারিদিকে।

কিন্তু কোদরের বউ ছাড়া বাড়ির লোকেদের মধ্যে আনন্দের নাম-গন্ধও ছিল না। রাজুর তো চোখের জল পড়তে থাকে—টপ্ টপ্ টপ্ করে!

পরের দিন বিকেলে বিদায় নেবার সময় যখন এল তখনো কালুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতেই রাজু লোকেদের ভিড়ে কালুকে খুঁজছিল— তাকে দেখার জন্য তার মনটা ছটফট করছিল···

কিন্তু কালু গ্রাম থেকে আধ ক্রোশ দূরের মাঠে গিয়ে বসেছিল।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করে দেখবে?' রাজু বুঝতে পারে। শুধু তাই নয় সে এও বুঝতে পারছিল যে কালু এখন কোথাও কাঁদছে বসে

আর সে কল্পনা তো মিথ্যে নয়! মন যেখানে সাক্ষী রয়েছে মিথ্যে হবেই বা কি করে?

দুজনের অন্তরাত্মা তখন যেন একে অন্যের হৃদয়ের গভীরে উপস্থিত হয়ে পরস্পরকে বলতে থাকে, 'যতই এখন কান্নাকাটি কর-না-কেন, যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন আর কোনো উপায় নেই।'

কথাটা মিথ্যে নয়। এতদিন তো যা হবার তা হয়েছিল কিন্তু এবার তো রাজু শ্বশুরবাড়ি চলে গেল— সব-কিছুই শেষ হয়ে গেল!

মাঠের চালাঘরের ছাতে দাঁড়িয়ে ছিল কালু, সেখান থেকে রাজুকে যেতে দেখতে না পেয়ে কালু বটগাছের ওপর চড়ে···কান্নাভরা হৃদয়ে আর জলভরা চোখে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে একটা ক্ষেতের সীমানার ওপাশ দিয়ে গমনরত রাজুকে দেখে কালু যে-কথা বলে তাতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই— এতদিন মন ভেঙে ছিল, আজ দেহে

ভাঙন ধরল আর কাল হয়তো— এই স্পন্দন-রত হৃদয়ও ভেঙে পড়বে।

সে গভীর নিশ্বাস নেয় যেন নিঃস্ব হৃদয়ে ভরে নিচ্ছে, আর বিড় বিড় করে বলে, 'আমার তো তবু ঠিক আছে! কিন্তু তোর তো সারা জীবন বন্দক দেওয়া রয়েছে— এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত।'

রাজু অদৃশ্য হতেই কালুর চোখের জল গাল বেয়ে পড়তে থাকে, বটগাছের পাতায় যেন বৃষ্টি ঝড়ে পড়ে—টপ্ টপ্…।

॥ আঠারো ॥

ক্লান্তির পর বিশ্রাম

আট-দশদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা রাজুর প্রশংসা করতে আরম্ভ করে, 'বউ কেমন বিচক্ষণ ! কোনো ঢঙ বা আদিখ্যেতা নেই। সে নিজেও যেমন ভালোমানুষ তার সব কাজও তেমনি ভালো।'

ভলীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার কথা বলতে পরমা খুড়ো এলে রাজু তার বড়োজাকে পরামর্শ দেয়, দু-একখানা যা জোগাড় করা যায় মুখ-রক্ষার জন্যে তাই দিয়েই ভলী বোনের শ্বশুরবাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিন। ওপক্ষের দুজনে এসে নিয়ে যাক তাকে। পরে আবার যখন কাপড়ের কথা উঠল তখন সে, 'আমার কাপড়ের থেকে দেখে দিন' বলে সমস্যার সমাধান করে দেয়। তাইতে বড়োজা এত খুশি হয়ে ওঠে যে তার চোখে জল এসে যায়। স্বামীর কাছে সে ছোটো বউয়ের গুণগান করে, 'কেমন বুদ্ধিমতী দেখো ! এমন বউ কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না··· আমাদের এখানে ঘাসের দানার রুটি খেতে হয় তবুও কোনোদিন তাকে মুখ বেঁকাতে দেখেছ কী ? নইলে ঘি-দুধ-খানেওলা বউরা কত ঝঞ্ঝাট করত।···'

কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা রাজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে যে-কথা বলত এখনো সে-কথাই বলে বেড়ায়, 'এ-সব ওপর ওপর লোক-দেখানোর জন্য। রাজুড়ী যদি সংসারে মন বসাতে পারে তো কী বলেছি।'

লোকেদের এ ধারণা অকারণে নয়। শ্বশুরবাড়িতে দুটো বলদ ও দুটো গোরু ছাড়া পঞ্চম কোনো জন্তু-জানোয়ারের ল্যাজের চিহ্নটি পর্যন্ত ছিল না। আর তার স্বামী বয়সে যুবক হলেও চেহারা আর স্বভাবের দিক দিয়ে দেখতে হলে সেই যে কথায় আছে, 'মাস্টার মারেও না, পড়ায়ও না' তেমনি কোনো কাজের নয়।

কিন্তু গাঁয়ের লোকেদের ভবিষ্যদ্‌বাণী রাজু মিথ্যে প্রতিপন্ন করে

দিতে থাকে। তারা বলত যে রাজু যদি আট-দশদিন কাটাতে পারে তো ভাগ্যের কথা। তার জায়গায় একমাস হয়ে যায় তবুও সে বাপের বাড়ি যাবার নাম পর্যন্ত মুখে আনে না। ‘কম কথা বলে যারা তারা গভীর জলের মাছ’ এ প্রবাদও সে মিথ্যে করে দেয়। যুবকেরা শেষে বাজি ধরে, ‘রাজু বউদিকে সামান্যও যদি কেউ প্রলোভিত বা উত্তেজিত করতে পারে তা হলে বুঝব সে মায়ের দুধ খেয়েছে।’

যারা বাজি ধরেছিল তাদেরকেও শেষে স্বীকার করতে হয়, ‘সত্যিই তো রাজু বউদির মতো বিচক্ষণ মেয়ে আমাদের সারা তল্লাটে আর একজনও নেই, খুবই কাজের মেয়ে··· খুবই বুদ্ধিমতী।’

ব্যাপারটা সেইরকমই ঘটেছিল বটে। রাজু তার সেই যৌবনোচ্ছলতা, হাসিকৌতুক, উন্মাদনা এবং বাচালতা ইত্যাদি সব-কিছুই যেন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি আসার সময় সেই পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ পথের দুধারে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে— কিছুটা চোখের জলে আর কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে যেন সব-কিছুকেই অন্তরের কোনো নিভৃত প্রদেশে বন্ধ করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে কালুর সেই উপদেশ তার মনের ওপর ভারী বোঝার মতো চেপে বসেছিল, ‘সুখী ঘর, সুন্দর মনের মতো বর নিয়ে সংসারে মন বসানোতে গর্বের কিছুই নেই ; অভাবের সংসার, হাবাগোবাকে মানিয়ে নিয়ে সংসার করাই গর্বের বিষয়।’

তা ছাড়া কালুর ওপর মনে যে ক্ষোভ জমা হয়ে উঠেছিল এত দীর্ঘদিন তাও ক্রমশ যেন কমে আসতে থাকে, ‘ও তো ভালোমানুষ। ওর আর দোষ কোথায়? সব দোষ তো তার ঐ শত্রু মামার আর ধরতে গেলে মায়েরও কিছুটা···’

শুধু তাই নয়, রাজুর মনে মনে ইচ্ছে ছিল কালুকে সুখী দেখার এবং যদি সম্ভব হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করার। তাই সে কালুর মায়ের অসুস্থতার বাহানা তুলে ভগ্নীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর জন্যে বড়ো জাকে রাজী করিয়ে নেয়। কেবল তাই নয়, নিজের মায়ের পেটের বোনকে যেন শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে এমনি ভাবে নিজের বাক্স

থেকে ভালো ভালো তিনটে কাঁচুলী তার সাথে তিনটে ঘাগরা আর দুটো খুব মজবুত দেখে শাড়ী দেয়। শাড়ীর মধ্যে একটা তার নিজের বিয়ের শাড়ী ছিল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময়—কালু, কোদর, পরমা খুড়ো আর কাসম ঘাঁচী উঠোনের খাটিয়ায় এসে বসে। তখন কে জানে কেন রাজুর সব আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন হারিয়ে যায়। জামাইয়ের সঙ্গে নানা ধরনের ঠাট্টা-ইয়ার্কি করার যে-সব কথা ভেবে রেখেছিল, ছড়া, গালিগালাজের যা-কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিল সব-কিছুই বানচাল হয়ে যায়! ভলীকেই তার শত্রু বলে মনে হতে থাকে···

রাজু না গানের আসরে অংশ নেয়, না বরযাত্রীদের পাগড়ি ধুতি ইত্যাদি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অন্যদের সাহায্য করে। বরঞ্চ কালু খেতে বসলে খাটিয়া থেকে তার পাগড়ি উঠিয়ে আনাতে মেয়েদের ওপর চটে যায়, 'পাগড়ি দিয়ে দোলনা বাঁধার দরকার নেই··· ছোটো বাচ্চাকে সেই দোলনায় শুইয়ে আর কাঁদাতে হবে না। যাও, ফেরত রেখে এসো।'

উঠোনে স্ত্রী-আচারের অঙ্গ হিসেবে নানার জিনিস দিয়ে তৈরি বাধা সরাতে সরাতে কাসম মিঞা নানান মজার ব্যাপার শুরু করেছিল কিন্তু তা দেখার জন্যে রাজু বাইরে বেরোয় না। বাইরের হাসির গমক শুনে সে উল্টে বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে, 'কখন যে শেষ হবে এ-সব।' কিন্তু তখনও অনেক বাধা সরানোর বাকী ছিল। তার মধ্যে মাখন তোলার হাঁড়ি ও ঘোরাবার কাঠি সরানোর সময় খুশির চোটে কাশম দুলাইন দোঁহা গেয়ে শোনায়—

রড়ী হঁসাড়ে হঁসী বড়াবে এ বেবাণ ভবায়ো ;
জীবতরস্থুংয় এবুং বলোণুঁ, লইলো বেবাই খায়ো।

(কেঁদে যে হাসায় আর হাসিয়ে যে কাঁদায় আমাদের বেয়াই সেই ধরনের ভাঁড়। আমাদের জীবনেও সেই ভাবেই দুধ থেকে মাখন তোলা হচ্ছে, নিন মাখন তোলার কাঠিটা নিয়ে নিন।)

শংকর জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে যেন কাসম? বেয়াই ভাঁড়?

আর-একবার বলো, আর-একবার !'

কাসম আবার বলে আর লোকেরা দ্বিগুণ আনন্দে হেসে ওঠে।

আর কালু ভাবতে থাকে, 'আমাদের জীবনেও মাটা তোলার মতোই অনবরত ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে।'

কিন্তু রাজু জীবনের এই ভয়াবহ ঘূর্ণি উপস্থিত হওয়াতে কেঁদে ফেলে,··· সে রাতে এবং পরের সারাদিন এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারে না···। বিদায় নেবার সময় যখন আসে তখন আর সে বাইরে এসে মুখ দেখাতে সাহস করে উঠতে পারে না। লোকেরা, তার মনে হয়, সকলেই যেন বলাবলি করতে থাকে, 'তা রাজু বউ, ভলী শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তাতে তোমার মুখ অত ভার কেন ? নিজের মুখের চেহারাটা একবার দেখেছ কি ? তবে কি··· ! এখন বুঝতে পারা গেল। সেই পুরোনো সম্পর্কের কথা মনে পড়ে গেছে, তাই বলো-না কেন ?'

ভলীকে বিদায় জানানোর জন্যে বাইরের আসবার সময় যখন এল তখন রাজু তার নিজের জীবনকে 'ভাগ্যের এক অসম্পূর্ণ কাহিনী' হিসেবে প্রবোধ দিয়ে, স্মৃতি আর কল্পনাকে জলের ওপর ভেসে থাকা ময়লার মতো একধারে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছ জলের মতোই নির্মল হয়ে ওঠে যেন, মৃদু মৃদু হাসতে থাকে, 'এসো বোন, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা করে নেবে চলো, বলে ভলীকে নিয়ে সে এগিয়ে যায়।

রাজু ভেবেছিল ভলীকে কিছু উপদেশ দেবে, 'ওর (কালুর) চানের সময় গরম জল করে রেখে, ধুতিও তুমিই নিজে হাতে করে দেবে। খাবার সময়ে ডাল-শাক ভালো করে তৈরি কোরো আর [illegible] গরম গরম চাটুর থেকে নামিয়ে [illegible]··· ও যদি কিছু বলে তো সাথে সাথেই তা মেনে নেবে, [illegible] জবাব দেবার সময় হাসিখুশি মুখে বলবে। দুজনেই তোমরা [illegible], আর খুড়ী তো সাক্ষাৎ ভগবতী। উনি কারুর সমালোচনা করা পছন্দ করেন না। তোমরা যখন দুজনে ঘরে থাকবে উনি দেখো ঠিক বাইরে ক্ষেতে কাজে বেরিয়ে পড়বেন। আর তোমরা মাঠে থাকলে উনি ঘরেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবেন। তা ছাড়া খবর পেয়েছি দিদি এখন অসুস্থ রয়েছেন। তা হলে তো

খাট থেকে উঠবেনই না হয়তো। আর উঠলেও তাঁর কোনো-কিছুতেই অমত থাকবে না। সুতরাং তোমরা দুজনে—'

রাজু তখনো তার ভাবনার জগতে বিচরণ করছিল, 'একসাথে থেকো আর প্রাণ ভরে আনন্দ কোরো' এই কথাগুলো চিন্তা করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিদায় দেবার সময় সে ভলীকে ও-সব কথা বেশি কিছু না ব'লে শুধু বলে, 'তুমি তো বোন আমার থেকে বয়সে বড়ো, তোমাকে আমি আর কি উপদেশ দেব।'

কালুর উদাস, ভাবলেশহীন চেহারা দেখে কিন্তু রাজুর অন্য চিন্তা মনে আসে, 'ভলী বেচারী তো নেহাতই সাদাসিধে ভালোমানুষ। যা বলবে তাই করবে, কিন্তু এই ভাই সাহেবের মেজাজ একটু গরম মনে হচ্ছে।'

বিদায় নেবার সময় কালুর চোখে চোখ পড়ে যেতে অথবা তার ক্লান্ত, পরাজিত চেহারা দেখেই কিনা কে জানে রাজু নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'হয়তো দুজনে ঝগড়া লাঠালাঠি করবে। তোকে তো আর দেখতে-শুনতে যেতে হবে না? আর দেখতে বা শুনতে পেলেও ওদের ব্যাপারে তোর মাথা ঘামাবার কী দরকার। তুই তো আর ওদের ঘর-সংসার পেতে দেবার ঠিকেদারী নিয়ে বসে থাকিস নি—'

ভলী কাঁদতে কাঁদতে কালুর সাথে যাত্রা শুরু করে, গ্রামের সীমানায় অন্য চার-পাঁচজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজু আড়চোখে ভলীকে দেখতে থাকে। আপন মনে বিড়বিড় করে বলে, 'এটা লোক-দেখানি কান্না নয়তো আবার কি? নইলে এমন সুপুরুষ বরকে পেয়ে মনে মনে তো—

বড়ো জায়ের পেছনে পেছনে বাড়ি ফেরার পথে রাজু এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সবার অলক্ষ্যে চোখের কোণ মুছে নেয় আর মনকে প্রবোধ দেয়, 'গত জন্মের কর্মফল! ভলী তো আর তোর পাকা দেখা ভাঙাতে যায় নি। এ-ব্যাপারে সেই-বা কি করতে পারে, মেয়ে আর গোরু, দুই সমান… যেদিকে চালাবে সেদিকেই যেতে হবে।'

কিন্তু কালু অন্য কথা ভাবছিল— বিধাতা আমার নাম করে সিন্দূর পরাতে যাচ্ছিলেন রাজুর কপালে, লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভলী সেখানে, সে তার ছোটো কপালটা মাঝখানে এগিয়ে দিয়েছে। ফলে তার নিজের বরাতে ঐ কমনীয় সুন্দরী রাজুর বদলে এই কদাকার গাছের গুড়িটা এসে পড়েছে !

ভলীকে কালুর বিন্দুমাত্র পছন্দ ছিল না। অসুস্থ মায়ের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই সে ভলীকে নিয়ে যেতে এসেছিল। নইলে তো মনে মনে সে আপসোস করছিল, 'আগে যদি জানতুম যে রাজুকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠালে এর শ্বশুরবাড়ি আসাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা হলে কোদরকে বারণ করে দিতাম রাজুকে না পাঠানোর জন্য। ব্যাপারটা যেন এরকম হল যে, ছাগল তাড়ালাম তো দেখি উট এসে ঢুকে বসে আছে।'

বাড়িতে ঢুকেই কালু বেশ বিরক্ত হয়ে মাকে বলে, 'বার বার আক্ষেপ করতিস্, নে এবার যত পারিস বউ-এর হাতের রুটি খা।'

মা খাটিয়ায় শুয়ে ছিল, চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, কী হল আবার ?'

কালু সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাঁচ-বোতাম-ওলা কোট আর মাথার পাগড়ি আলনায় টাঙিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অসুস্থ মায়ের খবর পর্যন্ত নেয় না, 'শরীর কেমন আছে ! জ্বর কম ছিল নাকি এই দু-তিন দিনে আরো বেড়েছে ?' কোনো কথাই সে জিজ্ঞেস করে না।

মা তো কিছুই বুঝতে পারে না। ততক্ষণে বউয়ের পুঁটলি নিয়ে কোদর হাজির হয়। বুড়ো পরমা আর শংকরও এসে পৌঁছয়, আর তাদের পেছনে পেছনে বউ এসে ঢোকে।

বউকে দেখে বুড়ীর মন শান্ত হয়, 'আয় মা, আমার কাছে আয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই তোর !'

কাছে আসতে বুড়ী তার এই পয়মন্তর বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে। তাকে পাশে বসিয়ে— যেন মৃত্যুর আগে শেষ

আদর করছে তাকে, বলে, 'আমার কপালটা একটু টিপে দে তো মা, একেবারে ফেটে যাচ্ছে যেন যন্ত্রণায় !'

বুড়ি বলে বটে কিন্তু তক্ষুণি তার ভাবনা হয়, 'হয়তো আপত্তি করবে··· তা হলে তো প্রথম গরাসেই মাছি পড়ে যাবার মতো সবই মাটি হয়ে যাবে ।'

কিন্তু ভলী না করে না, তাই শুরুতেই কিছু মাটি হয় না আর। অল্প কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য, 'ব্যস মা হয়েছে, হয়েছে রে,' বলে ওঠে বুড়ি এবং বউকে ঘর-সংসারের কাজে লাগিয়ে দেয়, 'একটু পরে এক ঘড়া জল তুলে নিয়ে আসিস তো ।'

ইতিমধ্যে নাথার বউ এসে উপস্থিত হয়। দুটো ঘড়া-কলসী খালি করে সে ভলীকে সাথে নিয়ে জল আনতে যায়।

বুড়ী যেন বউয়ের কাজকর্ম আর ছেলের ঘর-সংসার দেখার জন্যেই তিন-চারদিন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ভলীকে ঘরের কাজকর্ম করতে দেখে বুড়ী খুবই খুশি হয় কিন্তু ছেলের গরম মেজাজ দেখে তার ভীষণ দুঃখ হয়। ··· প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে যেমন জয় করা যায় তেমনি তাকে বুঝতে হলেও ভালোবাসা একমাত্র উপায় ···দু-দিনের মধ্যেই বুড়ীর মন আর হৃদয় বুঝতে পারে যেন ছেলেকে।

তৃতীয় দিন বিকেলে বুড়ী কোদরকে দিয়ে গাঁয়ের পথেঘাটে অকারণ ঘুরে বেড়াতে থাকা কালুকে ডেকে আনায়। কাছে বসিয়ে তাকে বোঝায়, শোনায় এবং সবশেষে বলে, 'আমি যদি আরো দু-একটা রাত কাটাতে পারি তো খুবই ভাগ্যের কথা ! তাই যা খুশি তোর তাই করিস কেবল আমার এই মৃত্যুতে আর অশান্তি ডেকে আনিস না। ··· আমি বুঝতে পেরেছি যে তোর ভলীকে পছন্দ নয় কিন্তু—' বুড়ী একটা গভীর শ্বাস নিয়ে জলে-ভরে-ওঠা চোখের দু-কোণ লুকিয়ে আড়ালে মুছে বলে, 'নিজের জীবনের অশান্তির জন্যে আমাকে দোষী করিস না যেন। আর··· আমার চোখ বোঁজার পরে তো আর এ-সব কথা কিছুই মানবি না তুই। আমিই কী আর তোর কিছু দেখতে আসব রে, খোকা ?···

এর পরে কালুকে তার এতদিনের স্থির সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়, অপ্রিয়কে ভালোবেসে প্রিয় করে নিতে হয়— রাত্তিরে পেছনের দালানে নাথার বউয়ের পেতে যাওয়া খাটিয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে শুতে হয়। অবশ্য কালুর মনে হচ্ছিল যেন শূলের ওপরে শুয়ে আছে।

ওদিকে বুড়ী ভাবছিল, 'ছেলের বুদ্ধি হয়েছে, তার কথা শুনেছে। তিনদিন বাদে সে দেহত্যাগ করে তার মনের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করার পর, ছেলের কাছ থেকে মনের মতো প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়ে নেবার পর, 'খোকা, বাপ আমার, ভগবান যেমন আমার মুখ রেখেছিলেন, তেমনি গর্ব যেন তুইও করতে পারিস। আর দেখিস,' বুড়ীর চোখের সামনে তার বিগত জীবনের কলহমুখর পাঁচ বছর, যখন বংশ রক্ষার জন্যে তার স্বামী সতীনকে বিয়ে করে নিয়ে আসে, জীবনের সমস্ত আনন্দকে ভুলিয়ে দেওয়া সেই অতীত যেন ভেসে ওঠে, 'আমাদের তু-জনের মধ্যে একজন মরে গিয়ে ভালোই হয়েছিল, নইলে,' বুড়ী একটা গভীর শ্বাস নিয়ে বলে কালুকে, 'তুই আমাদের তুঃখ থেকেই শিখে নিস্… গাঁয়ের লোকেদের জিজ্ঞেস করে দেখিস তারপরে বুড়ো-বুড়ী যত দিন তুজনে একলা ছিল তাদের গলার এতটুকু উঁচু আওয়াজ কেউ শুনেছে কিনা?' আবার তার সেই পুরোনো পাঁচ-বছরের কথা মনে পড়ে যায়, আর সে বলে—

'আর হ্যাঁ, কালিয়া! তোর নিজের বাপের কথাটা সব সময় মনে রাখিস, আমাদের সেই পাঁচ বছরের জীবনের অবস্থা দেখে সে বলেছিল— যদি সুখে থাকতে চাও তো…এই কলিযুগের জল শান্তিতে গলা দিয়ে নামাতে চাও তো সাত ঘর নির্বংশ হয়ে গেলেও এক বউ বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বউয়ের নামও মুখে এনো না কখনো।…'

কালুর মনে হতে থাকে যে বুড়ীর ভীমরতি ধরেছে। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, সে বলে, 'কী যে সব বলছিস মা! তোকে এ-সব কথা বললে কে?' কালুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'আমার নিজের অন্তরাত্মা বলছে রে খোকা। কিন্তু মনে রাখিস যেন গরিব ঘরের মেয়ে ও— কাজেকর্মে ভালো হলেই তাকে ভালো

বলতে হয়— ওকে যেন কখনো দুঃখ পেতে না হয় !'

পরমা খুড়োকেও বলতে হল, 'দুঃখ দেবে কেন ? বাজে বকবক না করে চুপচাপ শুয়ে থাকো দেখি ! তোমাদের বংশ রক্ষা হচ্ছিল না সেইজন্যই একদিন ঐ পাথর পায়ে এসে পড়েছিল। এমন আজেবাজে বকবক—'

কিন্তু বুড়ী তার নিজের খেয়ালেই ছিল, 'আজেবাজে মিথ্যে হলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না !' তবুও তুই—' তার দুর্বল হাত খাটিয়ার পাটায় চিৎ করে রাখে সে, 'দে, কথা দে আমাকে, আবার—'

'কী কাণ্ড দেখো, বুড়ীর মনের ভয় ভাবনাটা কিসে দেখো—' কেবল কালুই নয় আশপাশে বসে থাকা বিশ-পঁচিশ জন লোকেদেরও হাসি পেয়ে যায়।

'দিয়ে দে না ভাই কথা, বুড়ীর প্রাণে একটু শান্তি হয়', বুড়ো পরমা বলে।

কথা দিতে গিয়ে কালু ভাবনায় পড়ে যায়, 'বুড়ীর কি শুধু ভবিষ্যতের খেয়াল ছিল নাকি সেই ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল সে ধারণাতে কিংবা রাজু এর ভেতরে আবার কোনো গোলমাল পাকায় নি তো যে এ-সব কথা আদায় করতে চায় ? আর রাজু কোনো গোলমাল পাকালেই-বা এটা কী করে হতে পারে ? নিজের খুড়শাশুড়ীকে কেউ কোথাও বিয়ে করেছে নাকি, আর আমার কী এমন দরকার পড়েছে যে বংশের সাতপুরুষের মুখে চুনকালি দিতে যাব। সে বুড়ীর হাতে বেশ জোরের সঙ্গে হাত রেখে বলে, 'এই আমি পূর্বপুরুষের নামে শপথ করছি যে একজন থাকতে আর-একটা বউ কখনো আনব না।'

আর বুড়ী যেন এই কথাটা আনন্দে আর খুশিতে নিজের স্বামীকে ছুটে জানাতে যাচ্ছে এমনি ভাবে কয়েক মুহূর্ত তার চোখ দিয়ে অমৃত বর্ষণ করে পুত্রকে আশীর্বাদ করতে থাকে। পরের মুহূর্তেই তার চোখ কপালে উঠে যায় আর—

শংকর বুড়ো পরমা আর কাসম বলে ওঠে, 'আরে দাঁড়িয়ে দেখছ

কী? নামিয়ে নাও নীচে।'

খাটিয়ার থেকে নীচে নামাতে নামাতেই সেই পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর জীবনের সমস্ত খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ফুল আনা হয় এবং গরুড়পুরাণ পাঠ করতে বসে ব্রাহ্মণ। চতুর্থ আর পঞ্চম দিনে লোকে রীতি অনুযায়ী শোক প্রকাশ করে যায় এবং গাঁয়ে ধান কোটার কাজ শুরু হয়, দশ দিনের দিন নিয়মভঙ্গ করা হয়। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ও বালভোজন হল। দ্বাদশীর ক্রিয়াকর্ম কালু খুবই ভালো ক'রে করে। সাত-আট গাঁয়ের সমাজের সব লোককে ঘিয়ের তৈরি মিষ্টি খাওয়ায়। ত্রয়োদশীতে যে যার ভাগের খাবার খেয়ে সন্ধের সময় লোকেরা ফেরার পথে কালুর প্রশংসা করতে থাকে, 'যে যাই বলো ভাই, ছেলেটা বুড়ীর পরকালের ক্রিয়া-কর্ম বেশ ভালো করেই উদ্ধার করেছে। ধার করে হলেও বুড়ীর পেছনে পাঁচমন ঘি ঢালা খুব সোজা কথা নয়', আর বুড়োরা অন্যদের বলা কথাই বলতে থাকে, 'ছেলে হলে যেন এমনি ছেলেই হয়।'

এবার কালু এই ব্যাপারে সব-কিছু ঠিকমতো জোগান দেবার জন্য যে ব্যাবসাদার শেঠ এসেছিল তার সঙ্গে হিসেব করতে বসে। শেঠ পুরোনো ধারদেনাকে নতুন করে লিখে নেয়। সামান্য কিছু রেহাই দিয়ে মোড়লদের সকলকে খুশি করে আর আগের বাদশাহী টাকার হিসেব কেটে নতুন টাকার হিসেবে খরচা লিখে রাখে, 'তা হলে সতেরো কুড়ি আর সাত টাকা হল ভাই, নাও এবার আঙুলের ছাপ লাগাও এখানে।'

'ওরে বাপরে— আমার মাথায় তো অত চুলই নেই শেঠ।' বলতে বলতে কালু আঙুলে কালি লাগাতে থাকে! বারান্দা পর্যন্ত সকলে শুনতে পায় এমন উঁচু গলায় বলে, 'এত টাকা আমি কোন্ জন্মে শোধ করব, কাশী কাকা?'

'কোন্ জন্মে আবার, এই জন্মেই শোধ করতে হবে। জানো তো, দর্জির ছেলে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন সেলাই করে।' শেঠ খাতাপত্র সব বন্ধ করতে করতে বলে।

'সে তো ঠিক কথা বটে,' গাঁয়ের লোকেরা সকলেই সায় দেয়। এবং তারা সকলে শেঠের এই হিসেব লেখার উপলক্ষে তৈরি করা মিষ্টি খাবার জন্যে উঠে পড়ে।

চতুর্দশীর দিন সকালে শেঠও ঘোড়ায় চেপে বসে।

তেরোদিন বাদে আজ প্রথম কালুর খেয়াল হল যে মা চিরদিনের জন্যে চলে গেছে আর তার বদলে ঘরে আর-একজন অপদার্থ মানুষ সদাসর্বদা থাকার জন্যে এসে গেছে।

কালুর কাছে সব-কিছুই খালি খালি লাগে। এই একাকিত্ব তার ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে, দুঃখে শোকে তার দু-চোখে জল এসে যায়। ভলীকে স্বীকার করে নেবার জন্য সে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করলেই যদি মন মেনে নিত তা হলে কি আর মানুষের জীবনে এত দুঃখকষ্ট থাকত ?

কালু বাড়ি এবং ঘি-দুধ প্রভৃতি বোনের কাছে বন্ধকী রেখেছিল কিন্তু এ প্রসঙ্গে তার বয়ান হল, 'ও তো মুদীর দোকান থেকে রেখে যাওয়া কানাস্তারা জানে আর ওর (ভলীর) পেট জানে কোথায় কী !'

গোরু-বাছুরের কাজকর্মও সে ভলীর হাতেই ছেড়ে দেয়। নিজের দেহও দিয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু ভলীর— বিবাহিত স্ত্রীর প্রয়োজন শুধু দেহতেই মেটে না। সে চায় মন। কালু তাকে হৃদয় অর্পণ করে নি, করা সম্ভবও ছিল না। জানত সবই সে, বুঝতেও পারত যে ভুল হচ্ছে। ভলীর ওপর মাঝে মাঝে মায়া হত। মায়ের নির্দেশ মনে পড়ত, তবুও! তার হৃদয় যেন তার নিজের নয়, অন্য কারোর। কেউ যেন তার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে কিংবা ভুল করে কেউ ফেলে গেছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত ছিল যে সেটা কাউকে দেবার তার অধিকার ছিল না, উপায়ও না।

অন্য দিকে প্রেতের মতো শূন্য মনে খালি বাড়িতে ঘুরতে ফিরতে ক্রমশ ভলীর অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠতে থাকে।

স্ত্রীলোকের সহজাত স্বভাবে রাগ করে, দুঃখ করে, কিন্তু কালু

তেমনিই ঠাণ্ডা থাকে। সেই একই রকমের 'মৌন ব্রত' পালন করে।

ভলী বাপের বাড়ি চলে যাবার ভয় দেখায়। বদলে কালুর কাছ থেকে সে যে উত্তর আশা করেছিল তার ঠিক উল্টো জবাব মেলে— 'আমি যদি তাতে বাধা দিতে যাই তো আমাকে বোলো।'

এর পরে আর ভলী থাকে কী করে? পছন্দমতো একজন সঙ্গী পেতেই বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় ভলী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, 'এবার গরজে পড়ে ও নিজে সেধে নিয়ে যেতে এলে তবেই এ বাড়িতে পা রাখব।'

কালু এই চলে যাওয়াতে খুশি হয়। তার মনে হয় বাড়ি থেকে যেন পেতনী বেরিয়ে গেল। আজকাল তেমন কোনো কাজের চাপ ছিল না— আর মাস খানেক বাদে গম-ছোলার ফসল কাটার সময় অন্যেরা দয়া করে সাহায্য করতে এলে সে বলে, 'আরে, আমি একাই হাজার লোকের সমান।'

কালু তা দেখিয়েও দেয়। বিদায়ী বসন্তের ভোর হতে-না-হতেই খাট ছেড়ে সে উঠে পড়ত। রামা-নাথা প্রভৃতিরা জাগার আগেই সে মোষের দুধ দুয়ে তাদের জাব তৈরি করে দিত। গোরু মোষ সব বাইরে বার করে কোমরে কাছা লাগিয়ে গোয়াল পরিষ্কার করে তিন ঝুড়ি গোবরের ঘুঁটে দিয়ে আসত। উনুনে জল চাপিয়ে তা গরম হয়ে উঠতে উঠতে ঐ সময়ের মধ্যে দুটো ঘড়ায় করে দুবার জল নিয়ে আসত এবং অন্যেরা যখন তাদের গোরু-বাছুর গোয়াল থেকে বাইরে বার করছে ততক্ষণে সে চান করে নিয়ে দুধ আর আটা ফুটিয়ে নিয়ে তাতে ছটাক খানেক ঘি ঢেলে এক-একটা একপোয়ের মতো গোটা পাঁচেক গরস খেয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ত।

পাড়ার অন্যেরা তখন সবে দাঁতন করছে আর কালু, 'রামা ভাই, অন্যদের গোরু চরতে বেরোলে আমার গোরু-বাছুরও ছেড়ে দিয়ো', বলতে বলতে কাস্তে হাতে ফসল কাটতে রওনা হয়ে যেত।

মাঠে পৌঁছে প্রথমেই গায়ের জামা খুলে ফেলত, পাগড়িটাকে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে মালকোঁচা বেঁধে তৈরি হয়ে যেত।

অন্যেরা মাঠে এসে পৌঁছনোর আগেই তার বিঘে খানেক জমির ফসল কাটা হয়ে যেত। রামারা তা দেখে বিস্ময়ে ঢোঁক গিলত। একদিন সে বলেই বসে, 'কিরে, তোর সঙ্গে কোনো ভূত-প্রেতের বন্ধুত্ব আছে নাকি ?'

কালু হেসে ফেলত, 'আমি নিজেই তো ভূতই একটা ! দেখ-না, সেই রকমই মনে হচ্ছে না আমাকে ?'

কথাটা মিথ্যে নয়। কালুর শ্যামবর্ণ চেহারা ঘেমে নেয়ে গেছে তখন। চওড়া বুক আর পেশীবহুল হাত ফুলে উঠেছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে আর চোখ দুটো লাল— করমচার মতো লাল।

'তা তোর কথা সত্যি, অন্ধকার রাতে পথে তোর চেহারা দেখলে লোকে ভয় পেয়ে যাবে ভাই !'— রামা বলে। ফিরে যেতে যেতে উপদেশ দেয়, 'কিন্তু এরকম ভূতের মতো খাটুনি সহ্য করা ভালো নয়, বুঝলি। ডেকে পাঠালেই তো পারিস। কেন মিছিমিছি জেদ করে বসে আছিস ? এখন নাহয় ঠিক আছে, কিন্তু বর্ষার সময় তোর খুবই অসুবিধে হবে।'

কিন্তু এ ধরনের উপদেশ তো গ্রামের সকলেই দিচ্ছিল, কোদরের মা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল আর বুড়ো পরমা ঝগড়া পর্যন্ত করে, 'এক নম্বরের বদমাইস তুই ! তোর বউয়ের দোষটা কী তা তো আমাকে একবার বলবি ! হতভাগা নির্বংশ হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিস নাকি ?'

কিন্তু কালু মুখ খুললে তবেই না কেউ কিছু ধরতে পারে ব্যাপারটা কী ঘটেছে ?

. বুড়োর অন্য চিন্তার থেকেও বড়ো চিন্তা ছিল, 'আমার তো দিন ঘনিয়ে এসেছে ; এখন সেখানে বালা ভাই আর রূপা বউদি আমায় ছেলের খবর জানতে চাইলে কী উত্তর দেব ?' বুড়ো সত্যি সত্যিই এই ব্যাপারটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতে শুরু করে যে বর্ষা শুরু হতেই সে কালুকে না জিজ্ঞেস করেই ভলীকে নিয়ে আসার জন্যে রওনা হয়ে যায় পায়ে হেঁটেই, কারণ ঘোড়াটা রণছোড়ের ভাগে

পড়েছিল।

কিন্তু অন্য পক্ষেরও চার গুণ আপত্তি ছিল, 'জামাই নিজে নিতে এলে তবেই পাঠাব, নইলে মেয়েকে জন্ম যখন দিতে পেরেছি ছুটো খেতে দিতে পারব না কি আর?' রাজুও সে সময়ে তার বাপের বাড়িতে গিয়েছিল নইলে বুড়োর এই নিতে যাওয়াটা হয়তো ফলবতী হতে পারত।

অবশেষে একসময় কালুর ক্লান্তি আসে। আর আসবে না-ই বা কেন ক্লান্তি? কথায় বলে, 'চাষ-আবাদ (বেশি করে করতে হলে) লোকবলের খেলা।' একলা মানুষ কত দিক আর সামলাতে পারে? ঘর-সংসারের সব কাজকর্ম করা, তারপরে লাঙল চষা, এর মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়ো কাজ হল গোরু-বাছুরকে চরাতে নিয়ে যাওয়া। রোজ রোজ কে আর তোমার গোরু-বলদ চরিয়ে আনবে? খুব ভোরে গোরু-মোষ চরিয়ে এনে, ঘরদোর পরিষ্কার করা, জল আনা এবং খাবার তৈরি করে তবে সকলের সাথে মাঠে এসে চাষের কাজ শুরু করা! দিন পড়ে এলে গোরু-বাছুর ঘরে তোলা এবং লাঙল থেকে খুলে ক্ষুধার্ত বলদ ছুটোর পেটের ব্যবস্থা করা। গভীর রাতে ঘরে পোঁছে উনুন জ্বালিয়ে আটার জন্যে হাঁটু মুড়ে জাঁতা ঘোরাতে বসা।

বহু কষ্টে দেওয়ালী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ফসল কাটার সময় আমদানির হিসেব করতে বসে দেখে প্রায় আধা লোকসান হয়েছে। তখনো সব কাজ শেষ হয়েছে কোথায়! বুনতে বুনতে কোনোমতে না-হয় সব জমিতে বীজ বুনে দিয়েছে, সব ফসল কেটে তুলতে গেলে এখন রাত ভোর হয়ে যাবে।

কোদর আর তার মা তো উঠতে বসতে তার পেছনে লাগে। তোর জন্যে ভেবেই আমি আমার নিজের ছঃখ চেপে রেখে রাজুকে তড়িঘড়ি শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলাম, আর এই দেওয়ালীতে তুই যদি ভলীকে আনতে যাস তো আমিও আমার মেয়েকে নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠাব। নইলে দেওয়ালীর সময়েও সে কি ওখানেই পড়ে থাকবে।'

কালুকে চুপ করে থাকতে দেখে বুড়ী চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ; 'দেওয়ালীর পরব কী তুই একলা একলাই কাটাতে চাস কালু ? লোকেরা বিদেশের আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত ঘরে আসার জন্য খবর পাঠায়, আর তুই তোর—'

পরমা বলে, 'না আনতে চাস তো তালাক দিয়ে দে। ও বেচারাই বা কদ্দিন সাপের ঝুড়ি আগলে থাকে ? বিয়ে ভেঙে দে আর তার পরে গিয়ে সাধুদের দলে ভিড়ে যা ! খুব রাখলি তুই বালা ভাইয়ের নাম বটে।'

একলা হাতে কালু ফসল কাটার কাজ করতে করতে, আঁটি বেঁধে ফসল গোলায় জড়ো করে, বলদ দিয়ে শস্য মাড়াই করিয়ে দানা আলাদা করে আর রাতদিন এইভাবে খিচখিচের পর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। বউকে নিয়ে আসার ইচ্ছে তার ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও সে অপেক্ষা করছিল, 'রাজু এখনো কেন কিছু বলছে না ? আমি একা এভাবে কষ্ট সহ্য করে চলেছি আর ও চুপ করে দেখছে কেবল, কিছু একটা তো বলতে পারে ! ··· ঠিক তো ! আমার ব্যাপারে ওর কী গরজ ? আর কথাটা তো সত্যি, এখন আর ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ?'

অনেক রাত অবধি খাটিয়ায় জেগে পড়ে থাকতে থাকতে কালুর কাকার কথা মনে পড়ে যায়, আপন মনে সে বলে, 'ঠিক আছে ঠাকুর, তা হলে সাধুই হয়ে যাই, সমস্ত ভাবনা-চিন্তার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সব দুঃখের ঐ একই মাদুলী ! ঐ শিবমন্দিরের সাধুর মতো ভগবানের নামে ভিক্ষে চেয়ে খাওয়া আর ধুনি জ্বেলে পড়ে থাকা। কোনো ভাবনাচিন্তা থাকবে না।' দেখতে দেখতে কালুর চোখের সামনে ঐ অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলের শিবমন্দিরের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। মন্দিরের বাইরে চিমটেটা খাড়া করে গাঁথা, আর নিজে কেবলমাত্র একটা ল্যাঙট পরে-সারা গায়ে ছাই মেখে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখে গাঁজার নেশার ঢুলুনি ··· আর মনে দায়দায়িত্ব-শূন্য অপার আনন্দ উথলে উঠছে, 'আবার কী ! ভলাই বা কে এখন

আর রাজুড়ীই বা কে ?'

কালু মনে মনে হিসেব কষে, ঘরদোর গোরু-মোষ আর ক্ষেত-খামারের এমনভাবে বিলিব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে থাকে যেন সত্যি সত্যিই সে সাধু হতে যাচ্ছে—

কিন্তু শেষে সে নিজেই হেসে ফেলে, 'ভাবনা যে কোথায় যায় ! তুর পাগলা, বালা প্যাটেলের ছেলে সাধু হয়ে গেলে তো পৃথিবী উল্টে যাবে। বাবার কথা কি ভুলে গেছি নাকি ? মানুষের জীবন তো তলোয়ার খেলা ! যে খেলতে জানে সে জিতে গেল আর যে খেলতে পারে না সে তো বেঁচে থেকেও মরে থাকে।'

'আমি তো তলোয়ারের অনেক খেলাই দেখাতে পারি কিন্তু দেখাবার আর সুযোগ হল কোথায় ?' কালু কিছুটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার নিজের মনে বলে, 'তা হলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে রাজুড়ীকেই ঘরে নিয়ে আসি !'

সঙ্গে সঙ্গেই মাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায় আর সে ক্ষেপে ওঠে, 'কী আর করি ? মৃত্যুশয্যায় মাকে কথা দিয়েছিলাম তাই, নইলে দেখিয়ে দিতাম বাহাদুরি। গাঁয়ের মোড়লরা হয়তো সমাজ থেকে বার করে দিত কিন্তু একবার তো জন্মের শোধ জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করে নিতে পারতাম !' তার বিকৃত মন চিন্তায় মেতে ওঠে।

সেই চিন্তার কথা আর বলবারই বা কী আছে ! রাজু যেন তার পাশেই শুয়ে রয়েছে আর তার কল্পনা ভেসে চলতে থাকে— জল-ভরা কলসী নিয়ে রাজু বঙ্কিম গতিতে নৃত্যের ছন্দে আসছে। সে নিজে গভীর প্রেমে জলের ঘড়া তার মাথা থেকে নামিয়ে নিচ্ছে— ও হাসতে থাকে এবং তার মনের মতো খাবার তৈরি করে খাওয়ায় তাকে— মাঠে এসে সে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কাজ করে। একসঙ্গে ফসল কাটতে কাটতে কে বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারে তার বাজি ধরে তারা। কখনো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে রাজু তার কোলে শুয়ে পড়ে, কখনো বা সেই বিশাল বটগাছের তলায় সে নিজে রাজুর

কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে। রাজ উকুন খুঁজে বার করতে করতে তার লম্বা চুলে বিলি কাটতে থাকে…

কালু যেন একটা পাঁচমনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। পাশ ফিরে শুতে শুতে আপন মনে বলে, 'রাজু… আর রাজু! এ জীবনে আনন্দ করতে দেবার ইচ্ছে থাকলে ভগবান কি আর দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতেন? আরে ছিঃ ছিঃ! মাকে কথা দিয়ে তুই কিনা— এ-সব কথা চিন্তা করাও পাপ। মা কী আর মিথ্যে মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে! তুই নিজেই দুটো বউওলা লোকেদের অবস্থা একবার দেখ-না নিজের চোখে!'

আর তখনি যেন কালুর অন্তরাত্মা আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সেই গভীর রাতে আশপাশ অঞ্চলে দুটো বউওলাদের ঘরে দৃষ্টি ফেলে ঘুরে বেড়াতে থাকে, দরজায় কান পেতে শুনতে থাকে: কারো বাড়িতে এই গভীর রাতে এক সতীন প্রদীপ জ্বেলে দ্বিতীয় সতীনের এবং সেই সাথে স্বামীর লাজ লজ্জা উজ্জ্বল করছে তো অন্য কোথাও শেয়াল কুকুরের খেয়োখেয়ি চলছে এমন অবস্থা। কোনো জায়গায় স্বামীরই পাত্তা নেই তো অন্য জায়গায় হয়তো কৃষ্ণলীলা চলছে, এক-সাথে দুই সতীনের মাঝেই পুরুষ হাজির!

কালু অস্থির হয়ে ওঠে, 'না, ভাই না। কথায় বলে একটা হাতি পুষবে আর একটা বউ রাখবে… আর এ কথাটাও মিথ্যে নয় যে মেয়েরা ইচ্ছে হল তো ঠিকঠাক রইল কিন্তু বিগড়োলে নিজের বাপকেও পরোয়া করে না। না, না বাবা, রাজু ঐ সংসারে যদি মন বসাতে না পারে তো অন্য কোথাও যেন— আরে, ওই নানিয়ার কাছেই বা যেতে দোষ কী? নইলে আমি তো শিবের নামে দিব্যি করছি এক সাথে দুটো বউ কখনো করব না! মরতে তো একদিন হবেই সকলকে। তা সে মৃত্যু যদি আজকে আসে তো তাতেও রাজী। তবু মাকে দেওয়া কথা আমি ফেলতে পারব না। সে আমাকে পালন করতেই হবে। আর নিজের সত্য যদি রক্ষা করতে না পারলে তো সে মানুষ নাকি?'

নতুন নতুন জীবনের চিন্তা করতে করতে, কল্পনায় সে জীবন গড়ে তোলে। আবার তা ভেঙে ফেলতে ফেলতে রাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কালুর কোনো খেয়ালই থাকে না ইতিমধ্যে কাসম মিঞার মুরগী ডেকে ওঠে, 'কোঁ-কোঁর— কোঁ।'

'যাচ্চলে।' মুরগী ডেকে উঠল! কালু সচকিত হয়ে ওঠে। সে জীবনের যে চিত্রটা শেষ কল্পনা করে নিতে থাকে তা হল, 'কোনো কিছু নয় কালু, রাজুকে ভালোবাসতেও হবে না আর তাকে স্বপ্নও দেখতে হবে না। এ সমস্তই মিথ্যে চেষ্টা! না হলে— কর্মফলে যা লেখা ছিল এবং মরার সময় মা যে জালাটা (ভলী) হাতে সঁপে দিয়ে গেছে তাই ঠিক আছে এটাই মেনে নাও না? খারাপ হোক আর ভালো হোক ওই ঠিক আছে— আর খারাপই বা কোথায়? সকলেই কি জীবনে এক-একটা করে রাজু পেয়েছে নাকি? তবুও তারা ভালোভাবেই বেঁচেবর্তে রয়েছে তো!'

মুরগী যেন কালুর জন্যেই ডেকে চলেছিল। সেইসঙ্গে সামনের বাড়িতে নাথার বউ জাঁতা পিষতে আরম্ভ করে আর রামার বাড়িতে মাখন তোলার কাঠি ঘোরানোর শব্দ হতে থাকে, 'ঘুঁ···ম ঘুঁ···ম'

এখন ঘুম থেকে ওঠার ইচ্ছে কালুর ছিল না। কিন্তু না উঠে উপায় ছিল না। ফোঁটা কাটার মতোও একরত্তি আটা পেষা ছিল না তার। সে ক্লান্ত-পরাজিত মনকে সান্ত্বনা দেয়, আজকের মতো দুটো রুটির আটা পিষে দে। তার পরে তো পেষবার লোক আসছেই। খাট থেকে উঠতে উঠতে সে বিড়বিড় করে বলে, 'এই পরিশ্রমের ক্লান্তির পর বিশ্রাম নিতেই হবে দেখছি।'

কিন্তু পরক্ষণেই কেউ যেন বিরোধিতা করে, 'পরিশ্রমের জন্যে এ ক্লান্তি বলো আর নিজের খেয়ালের জন্যেই বলো, বিশ্রামের জন্যে ওটাই ঠিক ব্যবস্থা। তুই যে এত রাজু, রাজু, করছিস সে না-হয় আজ দুদিন শ্বশুরবাড়ি গেছে কিন্তু তিন বছর তো এখানেই ছিল! কই কখনো কি একবার এসে বলেছে যে, দাও আমি পিষে দিচ্ছি? আর ও (ভলী) যেই আসবে নিজের অদৃষ্টকে গাল পাড়তে থাকলেও

জাঁতা ঘোরাতে বসবে··· তাই খেয়ালের জন্যেই বলো আর পরিশ্রমের জন্যেই বলো এই ক্লান্তির পর এখন যে ব্যবস্থা করতে চলেছ সেটাই তোমার বিশ্রামের ঠিক ব্যবস্থা।'

আর কালু অদূরেই সেই বিশ্রামের চিন্তায় ও আশায় হাঁটু মুড়ে বসে জাঁতা ঘোরাতে থাকে। শুধু শুধু নিজের খেয়ালের দোষে এতদিন কষ্ট ভোগ করতে হল বলে সে আপসোস করতে থাকে, 'বরাতে তো যা লেখা ছিল তাই জুটেছে, তবুও এইভাবে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে··· ! গোড়া থেকেই তো খুশিমতো এই বিশ্রাম নিতে পারত। মিছিমিছি এই দুর্ভোগ ! এই ঠিক ! সে এসে এবার জাঁতা পেষার হাত থেকে মুক্তি দেবে, অন্য কেউ নয়।'

॥ উনিশ ॥

লাগ ভেলকি লাগ লাগ

কালু যখন বিয়ে করতে এসেছিল তখন শ্বশুরবাড়িতে খুব একটা আদরযত্ন পায় নি। পনেরো ঘরের বসত নিয়ে গাঁয়ের এই বস্তি, তার সব ঘর থেকে যুবতী মেয়ে এবং বউয়েরা বরযাত্রী হয়ে কালুদের গাঁয়েতেই বিয়ের জন্যে গিয়েছিল। অন্য ঝড়তিপড়তিরা এখানে বিয়েতে ভাগ নিয়েছিল বটে তবে তা না নেবার মতোই। একে তো বিয়ের দিন হঠাৎ ঠিক হয়েছিল তাই, জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করাতে ব্যস্ত ছিল সকলে আর দ্বিতীয়ত, কনেরা গরিব ঘর আর বরও গরিব তাই কারো মনেই তেমন কোনো ফুর্তি ছিল না। কালুদের পক্ষ থেকেও ছেলের 'আইবুড়ো দশা' কাটানোর জন্য যেটুকু উদ্যোগ করা দরকার সেটুকুই ছিল।

গত বছর স্ত্রীকে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল সে সময়েও কন্যাপক্ষের বেশি খরচখরচা করার উপায় ছিল না। সঙ্গে পাঁচজন লোক নিয়ে এসেছিল সে। বাড়ির পুরুষ মানুষেরা উৎসাহ দেখালে তবেই না স্ত্রীরা সাহস দেখিয়ে এগিয়ে আসতে পারে? তাই সেই সময়েও কালুর শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে হাসি মস্করা অথবা গালিগালাজ ভরা তর্জা গান ইত্যাদি শোনবার বা তার রস উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয় নি।

এবারেও তার শাশুড়ী খুবই ঠাণ্ডা গলায় তাকে শীতল অভ্যর্থনা জানায়। বাড়িতে বারান্দা ছিল না। তাই উঠোনেই খাটিয়া পেতে দেয়। বুড়ো পরমা সঙ্গে ছিল বলেই বোধহয় তাতে কিছু বিছানাপত্র পাতা ছিল। না হলে শুধু কালু একলা এলে অবস্থা অনেকটা সেই রকমের হত যে, যমরাজ এসেছে তো প্রাণটুকু নিয়ে যাক— আদর-যত্ন আবার কেন? আর এ ক্ষেত্রে তো জামাই মহারাজ এত আদর-ভালোবাসায় বড়ো করে তোলা পেটের নাড়ীটাকেই যেন টেনে নিয়ে

যাচ্ছে। কালু এখানে এসে পৌঁছনোর আগে থেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কখন যে সূর্য ডুববে আর কবে যে সকাল হবে। তার ইচ্ছে ছিল সকালের খাওয়া-দাওয়াটা সে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েই স্ত্রীকে নিয়ে খাবে।

ধানের গোলা থেকে কালুর শ্বশুর একবারটির জন্যে এসে হুঁকো সেজে দিয়ে আবার গোলাতেই ফিরে যায়। কিন্তু কালুর তখন হুঁকো খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। দিনের এই পড়তি সময়টুকু যে কারো বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করে কাটিয়ে আসবে তারও কোনো উপায় নেই। সব বাড়িরই তখন দরজা বন্ধ। বাচ্চা বুড়ো আর গোরু-মোষের বাছুর ছাড়া গাঁ এখন জনমানবশূন্য। রাজু আর ভলী না জানি কোথায় কাজে গেছে—

দিন অস্ত যেতে না যেতেই লতানে গাছে ছাওয়া উঠোন হলদে-আকাশী ফুলে ভরে যায়। ক্রমশ শূন্য গাঁয়ে সাড়া জেগে উঠতে থাকে— হৈ-চৈ হাসি-ঠাট্টা বাড়তে থাকে। কারো বাড়ির দরজা ঘর্‌র্‌র্‌র করে খুলল তো কারো বাড়ির উঠোন থেকে চিৎকার শোনা গেল— 'বাছুর যে এখনো ওখানে বাঁধা রয়েছে— গাই এসেই তো বাঁটের দুধ খাইয়ে দেবে যে।' আবার কেউ রাস্তা থেকেই হাঁক দিতে দিতে আসছিল— 'মা, কোথায় গেল শিগগির এসো, বোঝার ভারে মরে গেলুম একেবারে যে মা— মা— আঁ।' মাথায় হয়তো একটা দুমনী বোঝা আর কোমড়ে দেড় বছরের বাচ্চা। হাঁক না পেড়ে করবে কি? লোকেদের পেছনে পেছনে গাই গোরু-মোষগুলো ডাকতে ডাকতে আসছিল। গাঁয়ের রাস্তায় ঢুকেই হয়তো তাদের বাছুরদের কথা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে। বলদদের পিঠে তুলে দেওয়া লাঙলগুলোও এসে পৌঁছয়।

এদিকে গোরু-মোষ হাঁক পাড়তে থাকে তো ওধারে ক্ষুধার্ত বাছুরেরা; সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত মানুষগুলো বিরক্ত হয়ে বলদদের গাল দিতে আর পিটতে শুরু করে। অন্য ধারে আফিমের নেশায় ঝিমোতে ঝিমোতে দেলানায় বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বাচ্চাগুলো

ক্ষিদের চোটে এক নাগাড়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়— আর এই মুহূর্তের হৈ-হট্টগোল যেন সারাদিনের শান্তির শোধ উঠিয়ে নেয়।

কালুর খুড়-শ্বশুর, রাজুর স্বামী লাঙলের সাথে সাথেই এসে পৌঁছয় বাড়িতে। পেছনে ভলী আর রাজু ঘাসের বোঝা মাথায় আসে। ভলী কালুকে দেখে ভেংচী কাটে আর পরমা কাকাকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানে ; রাজু হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, 'আসুন, বসুন কাকা, আপনারা তুজনেই।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে বোন', বুড়ো বলে। কালুও 'হ্যাঁ' বলে। রাজু আর ভলী তুজনে বাড়িতে ঢুকেই তক্ষুনি হাড়ি আর ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে আসে। সামনের সোজা রাস্তা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলে যেতে থাকা এই যুবতীদের পেছনের দিকে কালু চেয়ে থাকে, পরস্পরকে তুলনা করতে থাকে।

রাজু বাড়ির বউ, সবে নতুন শ্বশুরবাড়ি এসেছে তাই তার গায়ে নতুন কাপড়জামা ছিল। ভলীর এটা বাপের বাড়ি তাই তার গায়ে পুরোনো কাপড়। জামাকাপড়ের যদি পাল্টাপাল্টি করে দেওয়া হয় তা হলেও কালুর বিশ্বাস রাজুকে মুখের দিক দিয়ে দেখলে ভালো তো লাগবেই এমনি পেছনের দিক দিয়েও সুন্দর মনে হবে। সেগুন গাছের গুঁড়ির মতো সরল ও ঋজু চেহারার রাজুর চলায় চমক ছিল, ছন্দ ছিল। মেদবহুল ভারী চেহারায় ভলী থপ্ থপ্ করে হাঁটছিল।

সামনে রাস্তার মোড় আসতে তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। কালু সেদিকেই ঠায় চেয়ে থাকে যেন ফেরার সময় তাদের ওই রাস্তার মোড় থেকে ধরে নিতে পারে।

তার মাথার মধ্যে তখন তুজনকে নানাভাবে তুলনা করার চিন্তা কাজ করে চলছিল। একজনের মুখ গোল মতন, কপাল ছোটো, গলার আওয়াজও কিছুটা কর্কশ। ওদিকে দ্বিতীয় জনের গলায় যেন ময়ূর বসানো রয়েছে! মুখটা সামান্য লম্বাটে, উজ্জ্বল আয়ত চোখ আর পলাশ ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর নাক।…

অল্প কিছুক্ষণ বাদে তাদের দুজনকে জল ভরে আনতে দেখা গেল রাস্তার মোড়ে। কালু সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আরো তুলনা করতে থাকে। অবশ্য লজ্জা-শরমের জন্যে দুজনের মুখই সম্পূর্ণ ঢাকা ছিল কাপড়ে। ভলী পরমা খুড়োর জন্যে ঘোমটা দিয়েছিল মাথায় আর রাজু পাড়ার বয়স্কদের জন্যে। কালুর চিন্তা দেহকে আশ্রয় করে। রাজুর যৌবন যেন কাপড় ভেদ করে ফুটে উঠছিল আর ভলীর যৌবন সুষমার কিছুই বুঝতে পারছিল না কালু, যেমন গভীর জলে স্রোত থাকলেও ওপর থেকে তার প্রবাহ ধরতে পারা যায় না।

কালু অজ্ঞাতে নিশ্বাস ফেলে। নিজের মনে সে বলে, 'তফাত হবে না কেন? রাজু আমার থেকে দু-তিন বছরের ছোটো আর ও তো আমার চেয়ে দু-তিন এবং রাজুর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়ো।···

কালুর খুড়-শ্বশুর, রাজুর স্বামী, হুঁকো সেজে এনে খাটিয়ায় এসে বসে। আর অমনি কালু রাজু আর তার স্বামীর তুলনা করতে শুরু করে দেয়।

একে তো রোগা দুর্বল চেহারা তাও আবার খালি গায়ে এসে বসেছিল, সেইসঙ্গে আবার বার বার কাসির দমক আসছিল। পরমা কাকা তো শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে, 'আপনি না স্বীকার করলেও আমার মনে হয় আপনার শরীরটা বোধ হয় খারাপ যাচ্ছে একটু। এই ফুস্কুরিগুলো কাউকে দেখিয়েছিলেন নাকি?'

কালুর কাছে তুলনা করার আর-কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সে মনে মনে জ্বলতে থাকে: এর থেকে রাজুড়ীর সতীন নিয়ে সংসার করা ষাটগুণ ভালো ছিল!

রাজু আবার বাড়ির বাইরে আসে। আঁচলের আড়ালে হাতে কিছু লুকিয়ে রাখা ছিল তার। কালু বুঝতে পারে, ঘিয়ের খালি কৌটো, কোথাও ঘি জোগাড় করতে যাচ্ছে। তার মন আক্ষেপে ভরে যায়, রোজ যে দুবার করে ঘি খেত তাকে আজ অতিথিদের

জন্যেও ঘি আনতে ছুটতে হচ্ছে। তা হলে আর বাড়ির লোকের ও বউয়ের বরাতে ঘি জোটার কথাই ওঠে কী করে? রাজুর স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সে মনে মনে বলে, 'কোথাও কখনো নেমন্তন্ন বাড়িতে ছাড়া জীবনে বোধ হয় ঘি দেখে নি কোনোদিন। তার ওপরে আবার এই চাষার খাটুনি! দেহ বেচারী ভেঙে পড়বে না তো আর কি করবে?'

ঘি নিয়ে বাড়ি ফিরে রাজু আবার বেরোয়, কালুর চিন্তা হয়, হয়তো বাড়িতে গমও নেই।

কিন্তু এবার তার আন্দাজ ভুল হল। ভুল হত না যদি ও বাড়িতে জাঁতা ঘোরানোর শব্দের খেয়াল করত। তার খেয়াল হল রাজুকে চার-পাঁচজন যুবতীর সঙ্গে খালি হাতে ফিরতে দেখে। তখনই সে বুঝতে পারে যে খাবার তৈরি করার গম তো জাঁতায় পেষা হচ্ছে।

রাজু তা হলে এ যুবতীদের আবার কেন ডেকে নিয়ে এল? কালু এর কিছুই বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ বাদে আরো দু-চার জন যুবতী এসে পৌঁছয়। তাদের সকলকে দরজার কাছে ইতস্তত করতে, উঁকি-ঝুঁকি দিতে, একে অন্যের গায়ে ধাক্কা মারতে দেখে কালু বুঝতে পারে ছড়া কাটার গান গাইবার প্রস্তুতি চলছে। আর গান শুনতেও পাওয়া গেল,

'কালু তারে তে কড়ীও ক্যোংথী? বার বাপোনা!'

(ও কালু, বারো ছেলের বাপ তুই, তোর কাছে এই কানের দুল এল কোথা থেকে?)

কালুর অন্তরাত্মা খুশিতে পদ্মফুলের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে। আর হবে না কেন? দশমীর চাদনী রাত, তাও আবার শরতের! কখনো দুধের মতো শুভ্র জ্যোৎস্না ঝিকমিকিয়ে ওঠে। কখনো মেঘের আড়াল থেকে উপচে পড়ে আলোর ছটা। আর বাতাসও সেই জ্যোৎস্নার মতো কখনো জোরে বইছিল কখনো আবার ফুরফুর করে ভেসে আসছিল।

কিন্তু সব-কিছুর ভেতর কালুর অন্তরে সব থেকে বেশি আনন্দের

ঢেউ তুলেছিল— সে হল রাজু। গাঁয়ের যুবতীরা বেশ ভালোই গাইছিল কিন্তু সে তো গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির গায়িকা রাজু ছিল বলে তবেই না ?

কালুও ইয়ার্কি না করে থাকতে পারে না, 'আরে একটু ভালো করে চেয়ে দেখো দেখি, আমার কানে আবার ভুল পেলে কোথায় ?'

দরজার কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীদের আড়াল থেকে কেউ বলে ওঠে, 'জামা, জামা বলো, তোমরা আমার গান পুরোটুকু শোনবার জন্যেও অপেক্ষা করছ না যে !'

দ্বিতীয় বারে গানের লাইন ঠিক করে নিয়ে গাওয়া হল—

'কালু তারে তে কেডিয়ুং ক্যাংথী, বার বাপোনা ?
তারী যা দরজী ডানে গৈংতী, বার বাপোনা !
তল্যো গৈংতী পণ রাতবাসী রৈংতী, বার বাপোনা !
তল্যো এম করী কেংডিয়ুং লবী, বার বাপোনা !'

(ও কালু, তোর কাছে এই জামাটা এল কী করে ? বারো ছেলের বাপ তুই, তোর মা দর্জির বাড়ি গিয়েছিল নাকি ? গিয়েছিল এবং সারারাত সেখানেই ছিল। আরে ছুর। এ কেমনতর জামা পরে এসেছিস তুই, বারো ছেলেমেয়ের বাপ তুই।)

সত্যি বলতে কী কালু তখন গান ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা ভাবছিল, রাজু এই ছড়া ভালোবেসে গাইছে না ঈর্ষাতে।

কালু এতটা ছেলেমানুষ নয় যে বুঝতে পারবে না। সে জানত গানের মধ্যে দিয়ে এইভাবে গালি দেওয়া আনন্দ প্রকাশেরই লক্ষণ। এ ধরনের কটূক্তি ও বিদ্রূপ শোনার জন্যে পালাপার্বণে বা শুভকাজের সময় যুবকেরা যুবতীদের কাছে ঘুরঘুর করে, তাদের ঠাট্টা করে, বিরক্ত করে, মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং যুবতীদের মুখ দিয়ে নিজের সম্বন্ধে ছড়া কাটাতে পারলে অন্যদের কাছে তা বুক ফুলিয়ে জাহির করে বেড়ায়।

'কিন্তু এ সময়ে এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মানেটা কী ?' কালুর ধারণায় রাজুর মনের অবস্থাও আজ তারই মতো হওয়া উচিত।

তাদের এমন সহজ সরল ভাগ্য বিপরীত হয়ে গেল এজন্য ওর আজ মনে দুঃখ হওয়া উচিত— যুবতীদের নতুন নতুন গান হাসি-ঠাট্টা তার বেদনাটা থেকে থেকে জাগিয়ে তুলছে।

'মারা বাড়া নে পছবাড়ে রে উংটডী ঝোলা খায়…'

(আমার পেছনের দিকের বাগানে একটা মাদী উঠে দোল খাচ্ছে…)

'পেছনের দালানে চান করার জল দেওয়া হয়েছে, পরমা কাকা।' রাজু দরজা থেকে মুখ বার করে জানায়।

'তুই চান করে আয় কালিয়ে।' বুড়ো পরমা, বলতে হয় এই হিসেবে কথাটা বলে।

'তা কখনো হয়? আপনি আগে চান করে আসুন, যান!' কালু বলে।

বুড়ো চান করতে উঠে যেতেই গাঁয়ের লোকেরা যারা দেখা করতে এসেছিল তারাও একে একে চলে যায়, ফলে রাজুর লজ্জা-সংকোচ দূর হয় এবং কালুরও দ্বিধা সরে যায়।

'এই ভাবে গাল পেড়ে কী লাভ হয় তোমাদের?' কালু কথা শুরু করে।

যুবতীদের মধ্যে থেকে একজনের গলা শুনতে পাওয়া গেল। রাজু দলের মধ্যে ছিল কিন্তু এটা তার গলা নয়, 'বাঃ আমাদের এমন হাজার টাকার থেকেও দামী ভলী বোনকে নিয়ে যাচ্ছেন তার বদলে এটুকু ছড়া না কাটলে চলে?'

কালুর জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, 'বদলে লাখ টাকাতেই, যার তুলনা মেলে না সেই রাজুকে ছেড়ে দিতে হয়েছে!' কিন্তু এ কথা এখন বলার কোনোই অর্থ হয় না, আর উচিতও নয়; সে কেবল বলে, 'গালি দেবার বদলে এমনি কথাবার্তা তো বলতে পারো। আর যা বলতে হয় তা সোজাসুজি বলে দাও না?'

রাজু তাদের বলে, 'তা হলে ঐ গানটা শোনাও— বুদ্ধিমানের বোনটা'—অমনি মেয়েরা শুরু করে,

'সমজুনে সানে সমজাবুং
গধেব গুডদা— পাটু জো…'

(বোঝদার লোককে ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিই, গাধাকে চড়-লাথিতে…)

'তা হলে এবারে খুশি তো?' এই বলে রাজু ঘরের ভেতরে চলে যায়। কাপড়ে কুঁচি ঠিক করতে করতে পরমা কালুকে উঠিয়ে দেয়, 'যা চান করে আয়, বালতিতে জল আছে।'

কালু তো এর অপেক্ষাতেই ছিল… কিন্তু পেছনের উঠোনে গিয়ে রাজুকে কোথাও দেখতে পায় না। চানের পাথরের ওপরে রাখা ভিজে গামছা পরতে পরতে সে মাথায় ফন্দি আঁটে। গরম জলের বালতির পাশে ঠাণ্ডা জলের কলসীটা রাখা ছিল। সেটা সে দেখতেই পায় না। হাঁক পারে, 'ঠাণ্ডা জল চাই একটু।'

কিন্তু বড়োই মন্দ ভাগ্য! কোথায় রাজুকে আশা করেছিল, বদলে ভলী এসে হাজির হয়। এখন আর— না, চাই না— কী করে বলে? বালতির ঠাণ্ডা জল প্রয়োজনের বেশিই ছিল, কিন্তু এখন দরকার নেই বললে ভলীর বকুনি শুনতে হবে, 'তবে আবার আদিখ্যেতা করছিলে কেন?'

এক ঘটির মতো জল ঢালতে না ঢালতেই কালু 'ব্যস, ব্যস' করে ওঠে কিন্তু কাজের মধ্যে দিয়ে যার তেজ দেখানো অভ্যেস সে ধীরে ধীরে কি জল ঢালবে? জল খানিকটা বেশি পড়ে যায়।

ঠিক সেই সময়েই রাজু দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে, 'ঠাণ্ডা জল দিয়েছিস তো?'

কালুর চানের জলই শুধু নয়, কালু নিজেই একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যায়। সে বুঝে উঠতে পারে না। রাজু যে একটু আগে গানটা গাওয়ালো সেটা তার কথার জবাব দেবার জন্য নাকি এমনি এমনি? আর এই ঠাণ্ডা জল দেবার প্রশ্ন? সত্যি সত্যিই কি ও আমার বাসনার ওপর ঠাণ্ডা জল ঢালতে বলছে? নাকি এও এমনি এমনিই জানতে চাইছে?

কিন্তু এমনি এমনি কথার কথা হলে খুড়ী-ভাইঝিতে দরজার আড়ালে কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলবে কেন? কালু তার এই কুড়ি বছরের জীবনে এমন ভাবে কখনো লজ্জা পায় নি। সে

বলে, 'দরকার হলে আমিও গিয়ে হাসতে পারি, যাব নাকি সাহায্য করতে ?'

'তুমি যদি হাসতে পারতে তা হলে তো আর কিছুর প্রয়োজনই ছিল না'— রাজু বলে ওঠে।

এ কথার মধ্যেও কালু গভীর রহস্যের সন্ধান পায়, কিন্তু সে নিজেকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করে 'না, না, ও এত বুদ্ধিমতী। কথাবার্তায় এত সুচতুর। কখনোই এরকম হতে পারে না।' মনের মধ্যে অন্য দিকে আপত্তি দেখা দেয়, 'তুই কতটুকুই বা জানিস ? শ্বশুরবাড়িতে আসতে না আসতে যখন এতটা বদলে গেছে তা হলে গত আট-দশ বছরে তো অনেক বদলে যাবে। বিয়ের পর থেকে তো তুই ওর সঙ্গে কথাই বলিস নি, তুই জানবি কি করে যে ওর বুদ্ধি নেই কি আছে ?'

কালু মনে মনে আহত হয়— এ-বিষয়ে ওকে একবার জিজ্ঞেস করতেই হবে, 'তুই তিনবার কথা বলেছিস, তিনবারই আমার কাছে রহস্য বলে মনে হয়েছে। আসলে ঠিক কী তুই বলতে চাইছিস আমাকে ?'

সেই সাথে, 'নানিয়া রাজুড়ীকে ঘরে নেবে,' এখন যখন আড়িটা কেটেছে এ কথাটাও জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। অনেক কথাই তো বলবার রয়েছে··· কিন্তু সুযোগ পেলে তবে তো বলবে ?

খাওয়া-দাওয়ার পর সে শ্বশুরকে ধানের গোলা থেকে খড় নামানোর কাজে সাহায্য করার জন্যে গেল। রাত হতে যখন ফিরে আসে তখন সারা গাঁ, পাড়ার সব বাড়িতেই শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। উঠোনে পাতা তার খাটিয়া এবং খাটিয়ায় পাতা বিছানা বরফের মতো ঠাণ্ডা মনে হয়। আগুনের ধুনিটা পর্যন্ত বুড়ো পরমার সাথে মাথা গুঁজে ঢুলছিল, শুয়ে পড়তে চাইছিল।

ভোর রাত অবধি কালুর ঠিকমতো ঘুম হয় না। কে জানে কেন বারবার সে চমকে চমকে জেগে উঠছিল। যেন কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল ! দরজা খোলার ঘর্‌র্‌র্ আওয়াজ হচ্ছিল কোথাও !

একবার যেন মনে হল কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল— চতুর্থ বারে যখন ঘুম ভাঙে তখন সত্যিই কেউ তার কোঁচা ধরে টানছিল, কিন্তু ? ফিরে দেখে যে ফোকলা দাঁত বুড়ো, পরমা খুড়ো !

'এই ছোকরা, ওঠ এবার ! দেখ চেয়ে কত সকাল হয়ে গেছে ।'

কালুর মুখের দীপ্তি প্রদীপের মতোই দপ করে নিবে যায়। ঝিম মেরে বসে থাকে সে স্তব্ধ হয়ে—

রাজু এসে দাঁতন দিয়ে যেতে যেন তার নাড়ীর স্পন্দন আর বোধশক্তি ফিরে পায় সে ।

বুড়ো পরমা না থাকলে জামাইয়ের খাতিরে আফিম খাবার ব্যবস্থা হত হয়তো। অবশ্য এত লোক জমা না হলে কী হত বলা মুশকিল ।

আফিমের বিলি ব্যবস্থা সম্প্রতি চালু হয়েছিল। কিন্তু এত কড়াকড়ি কিছু ছিল না তখন। আরে সরকারের নিজের লোক খোদ নটবরসিং হাবিলদার আফিম বিক্রির চোরা ব্যাবসা করত। কালুর শ্বশুরের নামে সেই দু-তোলা আফিম ধার দেয়। গাঁয়ের একজন বুড়ো লোক একটা বাটিতে সেটা গুলতে থাকে ।

উঠোনে চারধারে চারটে খাটিয়া চৌকো করে পাতা আর মাঝখানে ধুনিতে আগুন গনগন করে জ্বলছে। পনেরো-কুড়ি জন লোকের মধ্যে পাঁচ-সাতটা হুঁকো হাতে হাতে ঘুরছিল। অন্যধারে কুড়ি-পঁচিশটি ছেলে খেলা করছিল। কিন্তু অর্ধেক মন খেলার দিকে আর বাকি অর্ধেক মন অন্য-কিছুর লোভে ঘুরছিল। আফিমের ব্যাপারে ওদের কোনো উৎসাহ ছিল না। আফিম দেবার পর খাবার জিনিস যেটা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছিল তার ওপরে যথেষ্ট লোভ ছিল।

কালুর ওখানে ভালো লাগছিল না। সে ঘরের মধ্যে চলে আসে। রাজু তখন ঘর মুছছিল, তাকে বলে, 'মুড়ি কিংবা চালভাজা যদি কিছু থাকে তো দাও। ছোলা যদি না থাকে—'

'তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমাদের অতিথি-অভ্যর্থনার যেমন রীতি সেইমতো ঠিক করব।' রাজু হাসতে হাসতে বলে— 'অতিথির

মতো ভালোমানুষ সেজে বাইরে বোসো তো গিয়ে।'

'তুমি যখন অতিথি নও তখন আমিই বা অতিথি হতে যাব কেন? এটা আমার যেমন শ্বশুরবাড়ি তেমনি তোমারও।'

'ঠিক আছে তা হলে এক ব্যাপারই হোক, এখানেই থাকো তুমি,' রাজুর বড়োজা গোয়ালঘরের অন্ধকার কোণায় জ্বালানী কাঠ পাতা জড়ো করছিল। রাজু কালুকে খোঁচা দেবার জন্য বলে, 'কী বল দিদি, ভগ্নীর জন্যে এই গোয়ালঘরটা খালি করে দেবে নাকি?'

'এখানে ও কী করে থাকবে বোন।' শ্বাশুড়ী বেশ ভেবে ভেবে উত্তর দেয়— জিজ্ঞেস কর দেখি দশ বছর যে বিয়ে হয়েছে তা এখানে কবার এসেছে?'

কালুর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'আপনি সেভাবে আদর-আপ্যায়ন করলে আসবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই হত।' কিন্তু সে সময়ে অন্য কথা বলে, 'বলুন কবে আপনি ডেকেছেন আর আমি আসি নি?'

'এতে ডাকাডাকি করার কী আছে?'

'কেন নেই? আমি আর কী করে জানব বলুন কবে আপনার দরকারী কাজ পড়বে আর আমাকে প্রয়োজন হবে?'

শাশুড়ী আশ্চর্য হয়ে যায়, 'জামাইয়ের এত বুদ্ধি হল কোত্থেকে?' বলে বসে 'আমার নিজের কাজের মানুষটাকেই যখন নিয়ে যাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছ বাবা, তখন আমাকে আর কী সাহায্যটা তুমি করবে?'

রাজুর ভাবনা হয় যে শাশুড়ী জামাই না এই কথার ওপরে ঝগড়া শুরু করে দেয়। কালুকে বলে, 'বাইরে ভুট্টা দিয়েছি সেঁকে নিয়ে খাওগে যাও—' কিন্তু তখুনি খেয়াল হয় কেবল ওর জন্যেই ভুট্টা এসেছিল। ওর কি আর সেঁকার কথা। ওর তো খাটে বসে বসে খাবার কথা। সে তাড়াতাড়ি কথাটা বদলে দিয়ে বলে, 'বাইরে গিয়ে বসো, আমি সেঁকে পাঠাচ্ছি, খাবে।'

শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়ার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে আজ কালুর ছিল না, বরং সে অনুগত হতে চাইছিল। তাই সে রাজুর কথা কানেই তোলে না।

শাশুড়ীকে বলে, 'সংসারের রীতিই যে তাই, মেয়েকে তো জামাইয়ের ঘর করতে পাঠাতেই হবে।'

ভলী মাথায় জলের দু-তিনটে ঘড়া নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। উঠোনে বসে থাকা পুরুষেরা কেউ তার দিকে খেয়াল করে নি, করলেও মাথার থেকে জলের কলসী নামাবার কথা ভাবে নি। ভলীও বাড়ির ভেতরে এসেই আওয়াজ দেয়, 'নাও মাথার থেকে জলের ঘড়া কে আছ, নাবিয়ে নাও ?'

কালু দরজার পাশেই ছিল। গোয়ালঘরের দিকের ছোটো চাতালে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। রাজু অন্যধারে ঝুড়িতে কাঠ ভরছিল, বলে, 'একটু ধরে নামিয়ে দাও না কলসীটা।'

কালু সংকটে পড়ে যায়। নিজের বাড়িতেই সে কখনো ভলীর মাথা থেকে জলের কলসী নামিয়ে নেয় নি। তা ছাড়া বাড়িতে ভলীর মাথা থেকে ঘড়া নামানোর দরকার পড়ে নি কখনো। জল ভরতে যারা যায় প্রায় সকল যুবতীরাই নিজেরা কলসী মাথা থেকে নামাতে পারে। কিন্তু ভলী অন্যের নাবিয়ে দেবার জন্যেই যেন তিন-তিনটে করে পাত্র নিয়ে জল আনতে যায়, দুটো মাথায় আর একটা কাঁখে।

আজ কালুর ঘড়া না নামিয়ে কোনো উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে শাশুড়ী রাজুকে সম্বোধন করে বলে, 'তুইই হাতের উল্টো দিক দিয়ে ধরে নামিয়ে নে না। ও মাতব্বর ছোকরা যখন নিজের বাড়িতেই কোনোদিন নামিয়ে দেয় না, এখানে কেন নামাবে ?'

কালু কোনো কথা বলে না। জলের কলসী নামিয়ে দরজার কাছেই রেখে সোজা বেরিয়ে চলে আসে।

শাশুড়ীর রাগ দেখানোর অনেক কারণ ছিল, কালুকে এক চোট দেখে নেবে বলেই, 'জামাই নিজে এলে তবে মেয়ে পাঠাব' এ কথা মনে রেখেছিল। সব-কিছু করার পরেও ভলীকে পাঠাত না, 'আমি একা তিনটে বাচ্চার দেখাশোনা করব, ঘরের কাজ করব তো ক্ষেতের কাজকর্ম কী করে করে উঠব ?'

রাজু জাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে তাকেও এই কারণ দেখিয়ে না করে দেয়। রাজু ভাবনায় পড়ে যায়। সে নিজে এখন শ্বশুরবাড়িতে বরাবরের জন্যে থাকবে বলে স্থির করে নিয়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল বাপের বাড়িতে তার নিজের বউদির সঙ্গে বনে না। তার জন্যেই মা আর বউদিতে প্রায়ই ঝগড়া হত। তার দাদাকেই গ্রাহ্য করে না বউদি। সেখানে শাশুড়ীর কথা আর শুনবে কেন ? তা ছাড়া রাজু নানিয়ার সংসারে গিয়ে উঠবে এ কথাটা কে যেন রটিয়ে দিয়েছিল এবং তাই নিয়েই একদিন মা ও বউদির মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে যায়। কেউ না বলে দিলেও রাজু বুঝতে পারে বাপের বাড়ির পালকীর থেকেও শ্বশুরবাড়ির শূল লক্ষগুণ ভালো।

তবুও রাজু 'আমি তো রয়েছি' এ কথা বলে না, বরং 'আপনার কাজের অসুবিধে হলে না-হয় ওকে আনিয়ে নেবেন !' এবং আরো বলে, 'কিন্তু এখন তো ওকে পাঠিয়ে দিন !'

তবুও হয়তো বড়োজা পাঠাতে রাজী হত না কিন্তু দেখে যে তার নিজের মেয়ে যাবার জন্যে বিশেষ আপত্তি করছে না। কোনো বাহানা দেখায় না সে, 'পায়েতে চুড়ি পরে রয়েছি তার বদলে বালা নিয়ে এসো তা হলে যাব।' হাতেও চুড়ি খুবই কম ছিল কিন্তু সে-বিষয়েও কোনো উচ্চবাচ্য করে না বা দাবি জানায় না।

মা বুঝতে পারে, 'মেয়েকে এখানে ঘাসের দানার রুটি খেতে হচ্ছে ওখানে শ্বশুরবাড়িতে ভুট্টা খেতে পাবে। এখানে দুধ তো চোখেই দেখতে পায় না সেখানে দুধেলা মোষ রয়েছে।' কে জানে কেন মেয়ের ওপর টানটা একটু কম হয়ে যায়। মনকে প্রবোধ দিতে থাকে, 'যাকগে ওখানেই সুখী থাকবে। আর আমার তো ছেলের সাহায্য পাবার সুবিধে রয়েছে।'

কিন্তু মেয়েকে বিদায় দেবার সময় মার মান পড়ে যায়। জামাইকে ডেকে পাঠিয়ে উপদেশ দেয়, 'তুই যদি মনে করে থাকিস যে গরিব ঘরের মেয়ে বলে যেমন-তেমন করে হেলাছেদ্দা করে রাখব তা হলে সেটি হবে না বলে দিলাম— !'

'আমিই বা কম গরিব কোথায় ?' কালু বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলে।

'তবুও তোর পরমাজীর মতো এমন বড়োলোক কাকা রয়েছে, আমাদের তো তাও—'

বুড়ো পরমা কথার মধ্যেই বলে ওঠে, 'সবার উনুনই মাটি দিয়ে তৈরি বেয়ান। সর্ষের দানার মধ্যে আবার বড়ো-ছোটো কোন্‌টা ? আর হেলাছেদ্দা করে রাখবেই বা কেন ? নিজের বাড়িতে তো আর বড়োলোক, গরিব বলে আলাপ কেউ জমায় না তা হলে ?'

'তা নয়, আমি শুনেছিলাম কিনা' শাশুড়ী বলে, কিন্তু এবার যদি কোনো-কিছু আমার কানে এসে পৌঁছয় তা হলে আর কখনো মেয়ে পাঠাব না। সে পঞ্চায়েত তখন যা করে করুকগে। আমি পয়সা দেখে তো মেয়েকে বিয়ে দিই নি, জাত মান দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম।'

'সে তো ঠিকই, এবারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন' এই বলে বুড়ো পরমা উঠে দাঁড়ায়। কালুর হাতের ওপর ভর দিয়ে ফুলজীর কাছ থেকে চেয়ে আনা ঘোড়ায় চেপে বসে।

'তুই তা হলে আয় আস্তে আস্তে। আমি সামনে পেথা মোড়লের বাড়িতে বসে থাকব।' এই বলে বুড়ো ঘোড়াকে রওনা করে দেয়।

এখানে আসবার সময়ের কালু এবং এখনকার কালুতে আকাশ-পাতাল তফাত। কালু এখানে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাকে যেন পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল। বাড়ি ফেরার জন্যে সে ছটফট করছিল। কিন্তু আজ এ সময়ে এই গ্রাম এই বাড়ি ছেড়ে যাবার দুঃখ প্রিয়জন-বিয়োগের বেদনার মতোই লাগতে থাকে। এসেছিল যখন, 'এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না হলেই ভালো হত', মনে এমন একটা ভাব ছিল। কিন্তু এখন যাবার সময় এ বাড়ির ব্যথা-বেদনাকে নিজের মনে করেই যাচ্ছে। শ্বশুরকে সে তাই বলে, 'সামনে এই দেওয়ালী এসে পড়লে এখানে দু-চারদিন থেকে গোলার কাজকর্ম সব করে দিয়ে যেতাম। কিন্তু আগে আবার কখনো এমন কাজের চাপ পড়লে ডেকে পাঠাবেন, এসে যাব আমি।' এগোতে এগোতে ভলীর সঙ্গে আলাপরত রাজুকে জিজ্ঞেস করে, 'কোদরকে কিছু বলতে হবে নাকি ?'

রাজু ওদের পেছনে পেছনে আসতে থাকে, 'বলে দিয়ো যে আমি ভালো আছি, আমাকে এখন যেন নিয়ে যেতে না আসে। দেওয়ালী আমি এবারে এখানেই কাটাব।'

'নিয়ে যেতে না আসে' শুনেই কালু চমকে উঠেছিল— সত্যিই কি তা হলে ও ঘর-সংসার পেতে স্থির হয়ে বসতে চায়?··· নাকি এইভাবে শুরুতে সকলের বিশ্বাসভাজন হবার পর এখান থেকে সোজা নানিয়ার বাড়িতে গিয়ে উঠবে? ভাইয়ের বাড়ি থেকে কুল ত্যাগ করলে পঞ্চায়েত পাছে কোদরের ঘাড়ে দণ্ড চাপায়— এও হতে পারে হয়তো।

রাজু নানার বাড়িতে গিয়ে উঠুক আর চোরের বাড়িতেই যাক্ তা নিয়ে আগে কালুর কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন তার ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই রয়েছে। আপন খুড়শাশুড়ী ভ্রষ্টা হয়ে যাবে, তার শ্বশুর-শাশুড়ীর দুঃখ কষ্ট আরো বেড়ে যাবে, 'নানিয়ে আগে আমাকে অপমান তো করেছেই এখন আমার শ্বশুরবাড়ির পর্যন্ত অপমান করতে হাত বাড়িয়েছে।' তার নিজের বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। যাকগে, মাঝে মাঝে তবু শ্বশুরবাড়িতে আসত দেখা করার জন্যে তাও শেষ পর্যন্ত শূন্য হতে চলেছে।

কালুর ইচ্ছে হচ্ছিল রাজুকে সাবধান করে দেয়—'সে সময় আমি ছোটো ছিলাম, কিন্তু এখন যদি উল্টোপাল্টা কিছু হয় তো পেথা মোড়লের বাপের দাঁত পর্যন্ত ভেঙে দেব··· ।'

কালু দেখে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতোই প্রতি পল রাজুর রূপ যৌবনশ্রী বিকশিত হয়ে উঠছে।

এ গাঁয়ের সীমা পেরিয়ে অন্য গাঁয়ে প্রবেশ করার আগে রাজু তাকে বাধা দেয়, 'একটু দাঁড়াও না।'

রাজু ভলীর থেকে একটু তফাতে থাকলে কালু ঐ নানা-সম্পর্কিত কথাটা জিজ্ঞেস করে নিত, কিন্তু সে উপায় আর কোথায়? ভলী একেবারে ছায়ার মতো রাজুর সঙ্গে সঙ্গে লেগে রয়েছে।

'শোনো', রাজু তাকে সম্বোধন করে বলে, 'তুমি বুঝদার লোক,

তোমার কাছে আমি ছেলেমানুষ। তবুও বলতে হচ্ছে বলে কিছু মনে কোরো না। একটা গোরু যদি নিয়ে আসি তা হলে তাকেও অন্য গোরুদের সাথে চরাতে নিয়ে গেলে গাঁয়ের আর-পাঁচটা গোরুর সঙ্গে একসাথে উঠতে-বসতে শেখাতে হয়। গোয়ালে রাখার সময় অন্য গোরু-বাছুরদের সঙ্গে যাতে ঠিক ভাবে থাকতে পারে সেই ভাবে হিসেব করে দড়ি বাঁধতে হয়। সেখানে এ তো মানুষ! নিজের বাড়ির মোষেই যদি গুঁতোয় তো আর কী বলার আছে!'

'তুই আমাকে মোষ বললি!' কালু হাসতে হাসতে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করে।

কালুর চোখের তারায় এই 'তুই' সম্বোধনের মধ্যে রাজু অনেক দিনের ফেলে আসা অতীত জীবনের পরিচিত ছবি দেখতে পায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে এটা না দেখার ভান করে। হেসে বলে, 'না, মোষ বলছি না, কিন্তু বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার পর আমাদের মনের অবস্থা যে কী হয় তা তোমরা পুরুষেরা বুঝবে কী করে, তার ওপরে তোমার মতো আবার রাগি-জেদী পুরুষ হলে তো আর কথাই নেই।'

ভলী কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ছিল, তার দিকে ইশারা করে কালু বলে, 'জিজ্ঞেস করে দেখ কখনো ওকে বকাবকি করেছি কিনা—'

'আমি সব-কিছুই শুনেছি। সাধুর মতো সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলে বকাবকির থেকেও অনেক বেশি খারাপ লাগে।' রাজু হাসে, 'নাও, এবার রওনা হও। নইলে আবার দেরি হয়ে যাবে; পাঁচ ক্রোশ রাস্তা প্রায় যেতে হবে তোমাদের।'

বিব্রত চিন্তিত কালু আগে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। রাজু ভলীর কাছে গেল, 'তোমাকে আর কী বলব বোন? সব-কিছুই ঠিক আছে কিন্তু রাগারাগি করার অভ্যেসটা ছাড়তে হবে। আমি জানি তোমার মনে কোনো প্যাঁচ নেই। তুমি তো আমার থেকে বড়ো। তোমাকে আর কী বলব? কেবল এটুকু বলতে চাই স্ত্রী যদি স্বামীর মন জয় করতে পারে তো জানবে সে সারা পৃথিবী সব দেবদেবী অবতার

জয় করেছে··· নাও এগোও তাড়াতাড়ি, নইলে পেছনে পড়ে যাবে।'

ভলী অশ্রুপূর্ণ চোখে কাকীর কাছ থেকে বিদায় নেয়।

কালুর পেছনে ওদের কোনো খেয়ালই ছিল না। সে নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে এগোতে থাকে। রাজুর কথাই সে ভাবছিল। কিন্তু অনেক চিন্তাই উঁকি দিচ্ছিল তাতে। এই মুহূর্তে রাজুকে যদি তার বুদ্ধি আর চাতুরীর অন্তহীন সাগর মনে হয় তো পরক্ষণেই অকালে লুণ্ঠিত-যৌবনা দুঃখিনী বলে মনে হয়— কখনো আজেবাজে বকবক করা বাচাল লাগে তো অন্য সময়ে অমিত শক্তিময়ী দেবীর মতো মনে হয়। নিজেকে ওর সামনে নিতান্তই ছেলেমানুষ বলে মনে হতে থাকে।

কালু কিছুতেই বুঝতে পারে না একদিন যে গম-ভুট্টার আটা খেত, দুধ ঘি দিয়ে মুখ ধুত, কোনো সুপুরুষ স্বামীর ঘর-দালান আলো করতে পারে এমন সুন্দরীর স্ত্রীদের থেকেও বেশি সুন্দর রাজু এখানে ঘাসের দানার রুটি দইয়ের ঘোল দিয়ে খায়। হাড্ডিসার একটা কাঠামোর স্ত্রী হিসেবে যে রয়েছে সে কি অনিচ্ছায় নিরুপায় হয়ে অথবা দুঃখ বলে তার কি কোনো অনুভূতিই নেই? কাল থেকে নিয়ে এপর্যন্ত রাজুর কথা-বলায়, ওর আসা-যাওয়া, ঘর-সংসারের কাজেকর্মের ব্যস্ততা ইত্যাদি সব-কিছুই কালু ভেবে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু তার দুঃখের কোনো প্রকাশ দেখতে পায় না।

কিন্তু এটাও কালুর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। রাজুকে দুঃখ সইতে হোক এটা তার পছন্দ নয়। যেমন ওর এভাবে আনন্দে থাকাটাও সে মানিয়ে নিতে পারে না···

পাঁচ ক্রোশ পথের সবটা কালুর ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল। গ্রামের কাছে পৌঁছে সে সম্বিত ফিরে পায়। অন্তরে উল্কাপাতের অস্থিরতা ও মাথায় উত্তপ্ত চিন্তার ঘুরপাক। কিছুটা বিরক্ত হয়ে সে আপন-মনে বলে, 'এর চেয়ে আমাদের আড়িই অনেক ভালো ছিল। ও এ-সব কথাবার্তা বলাতেই না এই চিন্তার সূত্রপাত? কোনো কথাবার্তা না বললে ও শ্বশুরবাড়ি রইল কি চোরের বাড়ি রইল তাতে

আমার কোনো চিন্তা থাকত না।' আর হাসতে গিয়ে অন্তরে যেন জ্বলন্ত আগুনের ছেঁকা লেগেছে এভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'ছিঃ ছিঃ হেসেছ কি পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছো ভাই!... ভানুমতীর খেল দেখাবার সময় জাদুকর, যেমন 'লাগ ভেলকি লাগ লাগ' করে, অবাস্তব খেলা দেখায়, তোর ভাবভঙ্গীও সেই রকম লাগছে, কালিয়া।'

॥ কুড়ি ॥

কালু ও নানার ঝগড়া

দেওয়ালীতে কালু ঘের-দেওয়া জামার বদলে পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়ে পাঁচ-বোতামওলা গলাবন্ধ কোট সেলাই করিয়ে নিয়ে এল। কোদরের জন্যেও একটা কোট তৈরি করিয়ে আনে। কেউ নিন্দে করলে যাতে দু-জনে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতে পারে।

আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। বুড়ো পরমার তখন বাণপ্রস্থে যাবার মতো অথর্ব অবস্থা। মোড়লের কাজকর্ম রণছোড় দেখাশোনা করছিল তাই তার বাড়িতেই দেওয়ালীর মজলিস বসে। প্রত্যেকেই কালু আর কোদরের 'জামা' দেখতে থাকে। অনেকেই প্রশংসা করল। নিজেরাও ঐ ধরনের জামা সেলাই করাবে বলে ঠিক করে আবার কিছু লোকের জামাটা মোটেই ভালো লাগে না। তাদের মধ্যে মোড়লের ছোটো ভাই নানা চূড়ান্ত টিটকিরি কাটে, 'দর্জিদের মতো পোশাক পরে আমাদেরও বাহার দেখে বেড়াতে হবে নাকি। পঞ্চায়েতের কেউ দেখলে সমাজ থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।' আর কোদরকে উপদেশ দেয়—

'তুমি কালুর রাস্তায় পা বাড়িয়ে এ-সব কী শুরু করেছ? আজ পরেছ না-হয় ঠিক আছে, আর কোনোদিন পরো না, আর সামাজিক কোনো আসর-অনুষ্ঠানে পরে যেয়ো না।'

কোদরের পাশে কালু বসে থাকলে ঠিক শুনিয়ে দিত, 'যা যাঃ মোড়লগিরি ফলাতে হবে না। আসিস দেখি পঞ্চায়েতে এ-কথা বলতে।' কিন্তু সে সময়ে যে সেখানে ছিল না, অন্য ধারে বাচ্চাদের দেওয়ালীর মিষ্টি বিলি করছিল—

'ঠিক আছে', বলে কোদর গান গাইয়েদের দলে যোগ দেয়। নানা গান গাওয়ার দিকে গেল না বাজনা বাজানোর দিকেও না। তার অস্থির ও অন্যমনস্ক ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কারোর জন্যে

অপেক্ষা করছে।

কোদরকে নিজের দলে টানার খুবই ইচ্ছে ছিল নানার। চেষ্টাও প্রচুর করেছিল সে। বর্ষায় একসাথে ভাগ করে লাঙল চালানো, গোরু-বলদ চরিয়ে আনা অথবা ফসল কাটার সময় সাহায্য করেছিল।

উদ্দেশ্য এ-সবের একটাই ছিল— এ-সব করে কোদরকে নিজের দলে টানা। ওর বউকে তো নিজের দলে আগেই নিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু কোদর এমন ভাব দেখায় যেন এ-সবের কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সুবিধে হলে তার সাথে একসাথে ভাগ করে লাঙল চষে আসত আবার কাছাকাছি কালু চাষের কাজে লেগে থাকলে তার কাছে গিয়ে হুঁকো খেয়ে আসত।

নানা বুঝতে পারে যে কোদর কালুর সঙ্গ ছাড়বে না আর রাজু তার বউদির উপদেশ শুনতে রাজী নয়। সে ঘটক লাগিয়ে রাজুকে হাত করার চেষ্টা করে।

ঘটকের কথামতো আজ এই দেওয়ালীর দিনেতেই সুযোগ-সুবিধে সব থেকে বেশি। কিন্তু দেখে যে রাজু তার বাপের বাড়িই এল না এবার। তা হলে আর নিজের সংসারে তুলবে কাকে? তবুও সে টাকা দুই খরচ করে ঘটকের মারফৎ রাজুর শ্বশুরবাড়িতে লোক পাঠায়··· নানার কাছে দেওয়ালীর উৎসবটাই যেন মাটি হয়ে গেল।

পয়সার গরমের থেকেও নানার গুমর বেশি ছিল। আর সত্যি বলতে কি সে কালুর থেকে দেখতে শুনতে অনেক ভালো ছিল। কালুর গড়নটা মাঝারি ধরনের মোটাসোটা। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। নানা লম্বা দোহারা আর ফর্সা। তা ছাড়া গান দোঁহা গাইতে সে ওস্তাদ। মাঠে লাঙল চালাতে চালাতে গলা ছেড়ে গান গাওয়া তার অভ্যেস। কিন্তু কালু গান গাইত ক্বচিৎ-কখনো। প্রাণে বিশেষ-কোনো পুলক জাগলে তবেই সে গান গায়। না হলে বেশির ভাগ সময়ই কিছু-না-কিছু কাজে লেগে থাকে। যেমন মিষ্টি তৈরি করা, ভাগ করে পরিবেশন করা, ঝগড়াঝাঁটি ফয়সালা করে দেওয়া, গোরু-

বলদদের দাম ঠিক করা বা তাদের অসুখ-বিসুখ হলে তাদের পরিচর্যা করা ইত্যাদি।

নিজের এই রূপের গর্ব থেকেই নানার বিশ্বাস ছিল যে রাজু তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যাবে, কালিয়ার থেকে তাকেই বেশি পছন্দ করবে। সেই চড় খাবার পরেও সে রাজুর সঙ্গে দু-একবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে দেখেছে। রাজু সে-সব কথা শোনার পর কিছু মন্তব্য না করে চলে গিয়ে তাকে উপেক্ষাই করে গেছে।

রাজুর এই নীরব থাকাটাই নানা অর্ধেক সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে কথাবার্তা চালানোর জন্যে ঘটক লাগায়। তাদের আর কী দোষ দেওয়া যাবে? ঘটকের মনেও আশা ছিল রাজু পরমা মোড়লের অমন সুপুরুষ ছেলে নানার সংসারে এসে উঠতে আপত্তি করবে না। মাঝখান থেকে ফাঁকতালে সে কিছু টাকা কামিয়ে নেবে কথাটা পাড়ার জন্য। সুযোগটা যেন একেবারে মুফতে পাওয়া।

কিন্তু ঘটকের প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা খুব সহজ বলে মনে হল না। রাজু কেবল আপত্তিই করে না, প্রস্তাব শুনে বরং একচোট ধমকে দেয় তাদের। সেইসঙ্গে তাদের ভয়ও দেখায় পঞ্চায়েতে নালিশ করবে বলে, 'আমাকে এভাবে ভুল পথে যাবার বুদ্ধি আর কখনো দিতে এলে, পঞ্চায়েতে নালিশ না করেছি তো কি বলেছি।'

ঘটক উভয়সংকটে পড়ে যায়। ওদিকে নানাও যদি 'আমাকে কিস্তিমাৎ করব বলে খুব যে তরপে গেলে' ব'লে যদি মারতে তেড়ে আসে? যদি বলে যে, 'মিছিমিছি আমার মতলবটা বানচাল করে দিলি', সেই ভয়ে সে সাপও মরে না লাঠিও ভাঙে না গোছের করে ঝুলিয়ে রাখে ব্যাপারটা।

'কথা ঠিকই ছিল। রাজু এই দেওয়ালীতেই আসত কিন্তু কালু ভলীকে নিয়ে আসার পর থেকেই মতটা পাল্টে গেছে।'

নানা কথাটাকে সত্যি বলে ধরে নেয়, 'তা হলে কালুরই কাজ এটা··· নিজের স্ত্রীকে আনার সময় ওর কানে ফুস-মন্তর করে এসেছে।' নানা ভীষণ চটে যায়। কালু তাকে মিষ্টি পরিবেশন

করতে এলে কালুকে সে না বলে থাকতে পারে না, 'কিরে বেটা, কী বলেছিস তুই ?'

কালু কিছুক্ষণের জন্যে হকচকিয়ে যায়। অন্যকে দেবার জন্যে তোলা মিষ্টি হাতেই থেকে যায়, 'কেন, কী হল ভাই ?'

'যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু…' কথার থেকেও তার মাথা-নাড়া, পা-ঠোকা, চোখ-পাকানো এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে রাগ ফুটে বেরোতে থাকে। সে বলে ওঠে, 'কিন্তু মনে থাকে যেন বেটা আঁটকুড়ে তোকে শেষ না করে দিয়েছি তো কি বলেছি।'

কালু কতক্ষণ আর রাগ শান্ত করে রাখবে ? ছুটো কারণে সে ক্রমশ রেগে উঠছিল। এক তো কানে শোনা যায় না এমন অকথ্য গালিগালাজ পাড়ছিল এবং দ্বিতীয়ত কেন কী ব্যাপার তা বলছিল না নানা। কালু গোঁফে-তা-দিয়ে-থাকা নানার জামার কলার হঠাৎ চেপে ধরে, 'এ-সব কেন বলছিস রে কুকুরের বাচ্চা ?'

নানা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জামার কলার ছাড়িয়ে সে কালুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালুর হাতের মিষ্টির থালাটা লোকেদের মাথার ওপর দিয়ে সামনে ঠোকর খেয়ে পড়ে, ঝন্ ঝন্ ঝন্ন্ন্ন্…

যারা আফিমের নেশা করেছিল তারা তো চুপ করে বসেই ছিল। এখন এই থালার শব্দে যারা গান গাইছিল তারাও চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ তো তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'কী ব্যাপার ?' কারা ঝগড়া করছে ? কালিয়া আর নানিয়া সে তো বুঝলাম, কিন্তু দোষ কার বেশি ?'

সত্যি বলতে গেলে বলতে হয় এই বাড়ির ওপর কালুর বহুদিনের বহু বছরের রাগ ছিল। সেই রাগকে প্রশমিত করার যে ছু-একটা সুযোগ এসেছিল তা সে মালী ও রণছোড়ের ওপর। কিন্তু আজ ওর সাত জন্মের শত্রু নিজেই হাতের সামনে এসেছে।

কালু ঘাড় থেকে হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, 'অনেকদিন থেকেই বড্ড বার বেড়েছিস দেখছিলাম, স্রেফ বুড়োর কথা চিন্তা করে কিছু করি নি। আজ তুই নিজেই—' নানাকে সে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

অন্যলোকেরা ধরে ফেলল তাই রক্ষে নইলে রামা যা বলেছিল তাই হত, 'ব্যস্, হয়েছিল আর কি, এখনই লাউয়ের মতো ফটাস করে ফেটে দশসের ঘিলু বেরিয়ে যেত।'

দালান ভর্তি প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ কালুকে ধরে রাখে তো কেউ রণছোড়কে সামলায়। হাজার হোক নানা তার ভাই তো বটে।

অধিকাংশ লোকের মনেই কিন্তু ইচ্ছে ছিল যে ঝগড়াটা জমুক ভালো করে। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে, 'অনেকদিন ধরে কালুর বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করেছে, জ্বালাতন করেছে। আজ সুদে আসলে তার প্রতিশোধ নিয়ে নে।' তাদের ভরসা ছিল যতই ফোকলা দাঁতে মালী আর রণছোড়ের স্ত্রী দরজার আড়াল থেকে গালি দিক আর বুড়ো পরমা দুপক্ষকে আলাদা করার চেষ্টা করতে করতে নিজের ছেলের দলে যোগ দিলেও কালু আজ কিছুতেই দমবে না। আর যদিও দরকার হবে না কিন্তু তেমন অবস্থা দাঁড়ালে বেচাত, কাসম, কোদর শংকরদা এরা কি আর চুপ করে থাকবে নাকি?

কালু নানাকে উল্টে ফেলে ঘুষি লাগায়, রণছোড়কে সাবধান করে দেয় 'নিজের মান-ইজ্জত বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে দূরে সরে যাও না হলে—' আর 'ছেড়ে দে আমাকে, জোর দেখাচ্ছে!' বলতে নানার দিকে তাকিয়ে অন্যদের বলে, 'ছেড়ে দাও ওকে, আসতে দাও, আমি আজ ওর সব ইচ্ছে পূরণ করে দেব।' তাকে যারা ধরেছিল কালু তাদেরও ধমক লাগায়, 'ছেড়ে দাও আমাকে, দেখছ না, বাপ তুলে গালাগাল দিচ্ছে, তোমাদের আর কি?' এই বলে একটানে সে পাগলা ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। লোকেরা আবার তাকে ধরে ফেলার আগেই নানার গালি দিতে থাকা মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি মারে। 'এটা আমার মায়ের জন্যে', আর দরজার দিকে ফিরে বলে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন বুড়ি, তোকেও শেষ করে দেব! একটাও দাঁত যদি তোর মুখে রাখি তো—'

রামা আবার বলে ওঠে, 'আরে তোর অনেক আগেই ভগবান বুড়ির সব দাঁত ভেঙে দিয়েছেন রে, কালিয়া।' আশপাশের লোকেরা হেসে ফেলে, অন্য কিছু লোকে রামার ওপর বিরক্তও হয়। নানার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে দেখে লোকেদের বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়, 'সর্বনাশ করেছে, কালিয়া।' বেচাত, কোদর প্রভৃতিরা দৌড়ে এসে কালুকে জড়িয়ে ধরে। গালাগাল দিতে থাকা নানাকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দেয়।

গোরুর গাড়ি থেকে বাঁশের ডাণ্ডা খুলে নিয়ে তেড়ে আসা রণছোড়কেও লোকেরা ধরে ফেলে। নাথাকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্য একধারে নিয়ে যায় আর কালুকে সবাই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করতে থাকে।

রণছোড় নালিশ ঠুকতে বেরোয়। শংকর ও বেচাতের কাকা প্রভৃতিরা তাকে বাধা দিতে আসে, 'কার দোষ না-হয় পরে দেখা যাবে— কিন্তু ওরা মারামারিটা করল কেন?' শংকর জিজ্ঞেস করে।

'আমি জানি, নাকি আমার বাপ জানে ওরা কেন মারামারি করল।' রণছোড় উত্তর দেয়।

'তা হলে নালিশ করার পর যদি দেখা যায় যে দোষ নানারই, তখন?'

'দোষ যদি থাকেও তা বলে এমনিভাবে মারবে নাকি, চাষী কাকা?' রণছোড় চটে যায়, 'এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।' রণছোড় এগোবার জন্যে পা বাড়ায়।

রামার ইচ্ছে হয়েছিল যে বলে, 'যাও··· তা হলে। থানার থেকে জমাদার এসে কালিয়াকে পাঁচ ঘা লাঠিপেটা করবে, আর পাঁচসের ঘি খেয়ে যাবে।' অবশ্য পাঁচ ঘা লাঠির চোট সহ্য করা সোজা ব্যাপার নয় তাই সে বলে, 'ভাই ভায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে না গেলে আর কে যাবে?' কিন্তু এ ইঙ্গিতেও রণছোড় ফিরে আসে না। শেষে কাসমও মধ্যস্থতা করতে আসে, 'তা মোড়ল, এই ভাবে নালিশ করে দুনিয়ার সবাইকে লাথি লাগাতে চাও কেন?

এতে তো শত্রুতা বেড়েই যাবে, ভাই ভাইকে খুন করতে যাবে তার কি আর কোনো শেষ হবে ; তাই বলছিলাম ভুলে যাও সব। তোমার তো দিলটা বড়ো রাখা উচিত ; আমরা কালুকে এ-ব্যাপারে কিছুই বলব না। সত্যি যদি জানতে চাও তো বলি, সব দোষ নানার একার। আমি নিজে সেখানে ওদের কাছে বসে ছিলাম। এমনি এমনিই হঠাৎ ও কালিয়াকে গালাগাল দেয়। আর মাননীয় মশাই, এতদিন দুজন বুড়ো না-হয় সব-কিছু সহ্য করে নিয়েছে বলে অন্যে তো সইবে না!' কাসমের চোখে রাগ ফুটে উঠতে থাকে, 'সেই ব্রাহ্মণের কথা আমার আজও মনে আছে— এই শত্রুতা যদি বাড়াও তো একদিন তোমাদের সবাই এক এক করে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু।'

রণছোড় খানিকটা ধাতস্থ হয়— 'ঠিক আছে, আপনারা যদি এর বিচার করেন তো ভালো নইলে দুদিন পরেও আমি নালিশ করবই করব। একবার তো এই হতভাগা কালিয়ার গায়ের ছাল তুলিয়ে ছাড়ি তারপর যা হবার হবে।'

অভ্যেস মতো রামার মুখে এসে গিয়েছিল, 'আর তারপরে কী হবে? দিন পাঁচ-সাতের চিকিৎসায় তো কালিয়ার গায়ের ঘা শুকিয়ে যাবে তারপরে যে সে তোমাদের হাত-পা ভেঙে ছাড়বে—

সারা গাঁয়েই এই লড়াইয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ে। বাচ্চারাও বাজী পোড়ানো ভুলে 'কালু কাকা এমনিভাবে এক ঘা লাগাতেই নানা কাকা চিৎপটাঙ হয়ে এমনি করে পড়ল', বলাবলি করতে শুরু করে।

সেদিন আর দেওয়ালীর আসর জমিয়ে কোথাও বসে না কিন্তু রাত্তিরে একে একে সকলে কালুর বাড়িতে জড়ো হলে দেওয়ালীর মিষ্টি অবশ্য সবার বরাতে জুটে যায়। রামাই প্রথমে বলে, 'কালু ভাই, তুই আজ আমাদের সকলের মিষ্টি খাওয়া মাটি করেছিস যখন, এবার তুই মিষ্টি তৈরি করে খাওয়া।'

'তা তুই তৈরি কর-না, কে বারণ করছে।' কালু বলে।

'তা হলে আমার জায়গায় গান কে গাইবে?'

'সে কাজ আমি করব, নে তুই লেগে যা!' কালু রামার জায়গায় গিয়ে বসল। কোদর ও বেচাতের গাওয়া গানের কলি দুটি শংকর আর ভগার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে গাইল :

'হুড়য়া··· রাণাংনী বাজী রে ছত্রিশ শরণাই ও,
পেলা গুজরঁানাং ঢমক্যাং রে··· ঢোল!'

(ও টিঁয়া, দেখো আমাদের রাণার ছত্রিশ সানাই বাজছে আর গুর্জরের (প্রতিহারী) বাজছে কেবল ঢোল।)

গানের লাইনটা গাওয়া শেষ হতেই ভগা কালুকে বলে, 'এ গানটা তো আপনার আর নানা কাকার ব্যাপারের সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে, কালু কাকা।'

'কি করে?'

'কি করে আবার'— বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু তখনই অন্য খাটে বসে থাকা কোদরের কথা খেয়ালে আসে। তাই রহস্য করে বলে, 'বুঝতে পারছেন না কেন! আপনার আর নানা কাকার লড়াই তো নায়িকা নিয়েই, নয় কি?'

ভগা বলতে তবেই কথাটা মাথায় আসে কালুর। ভগার এই ইঙ্গিতে সে খুশিই হয়ে ওঠে। আর ব্যাপারটা তো একরকম তাইই, 'নায়িকার জন্যে একদিক থেকে রাণা আসছে তো অন্য দিক দিয়ে কালুর মতোই গরিব ভোজ-প্রতিহারী···'

গানের দ্বিতীয় কলি গাইবার সময় কালুর গলার স্বর পালটে যায়। সে ভাবালু হয়ে ওঠে যেন কিছুটা :

'রাণো পহোঁচ্চো রে গামনা ঝাঁপামাং
পেলো গুজরো সীমড়ি জায়।'

(রাণা গাঁয়ের তোরণের কাছে এসে পোঁচেছে আর গুর্জর গাঁয়ের সীমানার কাছে আছে।)

কেন জানি না কালুর হৃদয়ে আজ এক বিচিত্র প্রকারের বেদনা জেগে ওঠে। এমন ধারা আগে কখনো তার বোধ হয় নি। আজই যেন তার জীবনে কোন্ এক বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে··· সমস্তই যেন

অপার শূন্য··· আর সে নিঃসঙ্গ একলা।

গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে থেকেও তার চোখে ঘুম আসতে চায় না। কখনো যদিও-বা ঘুম আসে তো তার মধ্যেই 'বেলু (নায়িকা) আর রাজু, নানা ও রাণা, সে নিজে এবং রাণা, সে আর ভোজ প্রতিহারী প্রভৃতিরা একের পর এক মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। আপন মনে বলে সে, 'এ তো দেখছি রাণা আর ভোজের মতোই আমি আর নানা স্বপ্নেতেই লড়াই করতে শুরু করেছি।'

তামাকের নেশার জন্যে কিংবা অনেকক্ষণ জেগে থাকার জন্যে হোক ঘুম তো এক সময়ে এসে যায় আর সেইসঙ্গে আসে অন্য স্বপ্ন, তবে সে স্বপ্নও রাজুকে নিয়েই···

ভোরবেলা স্ত্রীর ডাকে যখন ঘুম ভাঙে তখনো যেন তার দুচোখ কিছু খুঁজতে থাকে— কিছু যেন তার হারিয়ে গেছে। সে কথা মনে পড়তে হেসে ফেলে সে। পাশে আটকে থাকা কাছা টেনে নিয়ে খাটিয়া থেকে নেমে বিড়বিড় করে বলে, 'ভোর রাতের স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তা হলে তো সারা জীবনভরই নানার সঙ্গে ঝগড়া লড়াই করতে হবে···' কালুর হৃদয় যেন আনন্দে নেচে ওঠে··· প্রশান্তিতে ভরে যায়।

॥ একুশ ॥

সারা গাঁ যখন খেলায় মত্ত, কালু আপন চিন্তায় মগ্ন

সূর্যোদয়ের পরে কালুর সেদিন ঘুম ভাঙল। গাঁয়ের অন্য প্রান্তে ঠাকুরদাদের বাড়িতে মুরগী ডাকছিল। কাসম ঘাঁচীর মুরগী তো সাত সকালেই নিম গাছে উঠে সারা গাঁয়ের সকলকে নতুন বছরের অভিনন্দন জানাতে থাকে, কোঁ— কোঁর— কোঁ— ওঁ— ওঁ।

নতুন বছরের আগমনে পৃথিবী যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকেরা বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার করে ময়লা আবর্জনা সব ফুটোফাটা হাড়ি-কলসীতে ভরে গাঁয়ের বাইরে ফেলে আসে। সেইসঙ্গে মনের মালিন্যও। যে বুড়ো জগা পনেরো দিন অন্তর একবার চান করে সেও আজ জল আনিয়ে চান করে নেয়। বাচ্চাদেরও কেবল আজ একবার বলাতেই কাজ হয়। তারা চান করে নতুন জামা-কাপড় পরে বাজী ফাটাতে আর নিজেদের খেলায় মেতে যায়, 'কালু কাকা, ও ফলাঁ কাকী…'

রামার ছেলেমেয়েরা কালুকে ডাকতে আসে কিন্তু কালু সাড়া দেয় না। তার এখনও চান করা হয় নি। চান করার আগে সাড়া দিলে বাচ্চারা তাকে, 'যান তা হলে গাঁয়ের গাধা চরিয়ে আসুন!' বলবে সকলে।

এমনিতে যারা চান করে নিয়েছে তাদেরকেও ছেলেরা গাধা চরাতে পাঠাচ্ছিল।

কালু দাঁতন করতে বসেছে এমন সময় গাঁয়ের নাপিত এবাড়ি-সে-বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে আছে আসে, 'ও বৌদি, কই জল এনে দিন। চলুন কালু ভাই আমি চান করিয়ে দিচ্ছি।'

'তুই খুশি মনেই অন্য বাড়িতে যা শিবা। তুই যে এসেছিস তাতেই চান করানো হয়ে গেছে।'

'তা কখনও হয় কালু ভাই? আপনাদের যদি আজ সেবা—'

শিবা হেসে কথাটা পাল্টে দেয়, 'তা ছাড়া আপনার পিঠে বোধহয় কালশিটে পড়ে থাকবে।'

'কেন ?' তার পরেই কালুর মনে পড়ে যায়, 'ঠিক বলেছিস। আমিও তাই ভাবছিলাম আমার গায়ে হাত-পায়ে ব্যথা করছে কেন—'

'ব্যথা হবে না কেন ?' শিবা কথা থামিয়ে বলে, 'আপনি তো নানাকে পিটতে ব্যস্ত ছিলেন আর পেছনে দাঁড়িয়ে রণছোড় মোড়ল আপনাকে কম লাথি ঘুঁষি মেরেছে নাকি ?'

'তাই নাকি ?'

'আপনি বলেই ভাই সহ্য করতে পেরেছেন। এরকম মার খেলে আমি তো একেবারে খাটে চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকতাম।'

শিবার বারণ সত্ত্বেও কালু ভলীকে ডেকে রাত্তিরের বেঁচে থাকা মিষ্টি দেওয়ায়।

মিষ্টি খেতে খেতে শিবা কালকের মারামারির বিশদ আলোচনা চালিয়ে যায়। কালু দাঁতন করতে করতে সায় দিয়ে চলে।

ইতিমধ্যে ভলী গরম জল নিয়ে আসে। কালু কাপড় ছেড়ে নেয়। শিবা গরম জল আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে চান করার মতো তৈরি করে নেয়, 'নিন্, বসুন দেখি।'

শিবা চান করানোর সময় কালুর গা হাত পা রগড়াতে রগড়াতে বলতে থাকে, 'ওহো, এখানে তো কালশিটে পড়েছে দেখছি··· আহাহা কনুয়ের কাছে এখানটা দেখুন দেখি, আহাহা··· আহাহা।'

'ঠিক আছে ! তাড়াতাড়ি কর নইলে তোর আবার দেরি হয়ে যাবে।'

'হাঁ, এখনো প্রায় আর্ধেক গা বাকি রয়েছে', কালুর গায়ে গরম জল ঢালতে ঢালতে শিবা বলে। কালুর হাতে ধুতি দিয়ে বলে, 'আপনি কাপড় ছেড়ে নিন, আমি চললাম।'

'আরে তামাক খেয়ে তো যা', কালু বলে। কিন্তু ততক্ষণে শিবা উঠোন্ পেরিয়ে গেছে, 'তামাক খেয়ে শিবা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছে

না!' সামনে পরমা মোড়লের বাড়িতে পৌঁছে বলে, 'কোরা মার্কিনের আট হাতি ধুতি চাই একটা··· তারপরে সে আপনি যেমন বুঝবেন।' বুড়ো মোড়লকে ডাকে, 'খুড়ো গেলেন কোথায় নাথা ভাই? কংকু বউদি, জল দাও দেখি···'

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পায়ে পায়ে ভোর হয় রাত। সকালে আসে দিগন্তে আবীর ছড়িয়ে। চারিদিক রাঙিয়ে দিয়ে, মেঘের পাহাড় ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে আঁচল ভরতে ভরতে—

বউয়েরা গোরু-বাছুর বাইরে বার করতে শুরু করে। পুরুষেরা গতরাত্রে কুঁচফল গুঁড়ো করে তৈরি করে রাখা রঙ দিয়ে তাদের মাথার শিং রাঙিয়ে দেয়। কালু তার গোরু-বলদের গায়ে বিঁড়ের ছাপ এঁকে দেয়।

গোরু-বলদের শিং রঙ করার থেকেও ভোর রাতের স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসে অনেক বেশি; স্বপ্নে অবশ্য বিশেষ কিছু ঘটনা ছিল না; ভলীর গর্ভে কোনো সন্তান হয় না তার, রামা, ভগা প্রভৃতিরা যেন রাজুকে তার দেওয়া কাপড় পরিয়ে দিচ্ছে (দ্বিতীয় বিবাহের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ)। রাজুও ইতিমধ্যে যেন বিধবা হয়েছে।

কালুর এক মন এই স্বপ্নকে দৈববাণীর সম সত্য বলে ভাবে, কিন্তু অন্য মন তাতে বিরোধ বাধায়; 'আরে, এ তো শুধুই স্বপ্ন।' এই বলে ভাবনাকে মন থেকে দূর করে দেয়।

একটা বুড়ো গোরুর গায়ে ছাপ দিতে দিতে তার মনের মধ্যে হঠাৎ চিন্তার এক ঢেউ খেলে যায়; 'আমার এই গবরী যদি আজ তোরণে পৌঁছতে[১] পারে তা হলে আমার স্বপ্ন সত্যি বলে জানব, না হলে নয়।'

১। নতুন বছরের দিন বিকেলবেলায় গাঁয়ের প্রধান প্রবেশ-পথের ওপর তোরণ তৈরি করা হয়। তার নীচে দাঁড়িয়ে কাঁসি বাজানোর সংকেত দিয়ে গোরু মোষ ইত্যাদির দল দৌড় করানো হয়। যে গোরু স্বাভাবিক ভাবে সকলের আগে দৌড়ে এসে তোরণের তলা দিয়ে পেরিয়ে যায় তাকেই 'তোরণ বিজয়ী' বলা হয়ে থাকে।

এই গোরুর তোরণে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও স্বপ্নের মতোই অনিশ্চিত ব্যাপার ছিল। গবরী যেমন সহজে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যায় তেমনিই বুড়ো সে, বরং বার্ধক্যই বেশি বলে মনে হয়। কালু গবরীর চমক বাড়ানোর জন্যে তার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়।

'ব্যস সব মিটে গেল। ফলাফল যা হবার তা আজ সন্ধেবেলা জানতে পারা যাবে।'

'যে গোরুটা আমাদের একবার মাত্র বিইয়েছে সেটার আজ গলায় ঘণ্টা বাঁধলে ভালো হত', ভলী বলে।

'এই বুড়িটা যদি তোরণে পৌঁছতে পারে তবেই তো বাহাদুরী হবে', কালু ব্যাহত ভলীকে হলেও নিজের মনকেই যেন জবাব দেয়।

রামা তো হাসতে হাসতে বলে, 'কী ব্যাপার ভাই কালু, বুড়ী গোরুর গলায় ঘণ্টি বাঁধলে যে!' কিন্তু কালু তাকেও সেই একই জবাব দেয়, 'এই ঠিক আছে, সত্যি-মিথ্যের যাচাই এমনি এমনি হয় নাকি?'

'আরে রাখো দেখি, মিথ্যেকে সত্যি জানাতে গেলেই তা কখনো সত্যি হয় নাকি? তা সে তুমি ঘণ্টিই বাঁধো আর ঘণ্টির বাবাকেই বাঁধো-না কেন।'

'আর তোরণে যদি পৌঁছে যায় তা হলে সত্যি বলে মেনে নেবে তো?'

রামা বেচারী আর কী করে জানবে যে কালুর আজকের সত্যি-মিথ্যে কিছুটা আলাদা ধরনের।

'ঠিক আছে, তাই সই। আরে এখনি তো' গোরুর রেস[২] শুরু হলেই বুঝতে পারা যাবে!'

শুধু রামা কেন গোরুর রেস শুরু হতে গাঁয়ের সকলেই যেন

২। নববর্ষের শুভদিনে গোরু-বলদ-মোষদের গাঁয়ের বাইরে বড়ো মাঠে জড়ো করে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে কাঁসি বাজিয়ে কয়েকবার এক সাথে দৌড় করানো হয়। সন্ধ্যায় 'তোরণ পৌঁছানো' প্রতিযোগিতার এটা পূর্ব-প্রস্তুতি বা রিহার্সাল বলা যেতে পারে।

কালুর খামখেয়ালীতে হাসতে থাকে। কালুর নিজের মনেও ভাবনা জাগে, 'স্বপ্ন শেষ অবধি হয়তো মিথ্যেই প্রতিপন্ন হবে।'

তবু ভালো বলতে হবে যে কোদর গাঁয়ে ছিল না। রাজুকে নিয়ে আসার জন্যে তার মা তাকে রাজুর শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিল। সে উপস্থিত থাকলে কালুকে একেবারেই নিরাশ করে দিত!

'ঠি···ক আছে। স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তো গবরীই শেষ পর্যন্ত তোরণে পৌঁছে যাবে।' কালু নিজের মনে বলে।

গাঁয়ের প্রায় চার-পাঁচশো গোরু-বলদ দৌড়ের জন্যে বিরাট ময়দানে জমায়েত হয়েছিল। গোরুর রেস দেখতে গাঁয়ের সব যুবক-যুবতী আর বাচ্চারা উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়েছে। মানা গয়লা পুব দিকের টিলায় লাঠির ওপরে ভর দিয়ে শান্ত মনে গোরুর দলকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

যুবকেরা খিচুড়ীর থেকে ডাল বাছার মতো দলের থেকে মোষেদের আলাদা করে নেয়। সারা ময়দান এখন যেন বকের সাদা ডানার মতো ঝটপট করছিল।

দেওয়ালীর পরব শুরু হবার ক্ষণ থেকে গোরুদের চোখ বড়ো হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। আর এখন রঙ লাগানোর পর থেকে তো তাদের চোখ বলের মতো গোল হয়ে ঘুরতে থাকে।

কালুর গায়ে হাতে বেশ ব্যথা ছিল তবুও সে কাছা বেঁধে তৈরি হয়। এক কিশোর বালকের হাত থেকে কাঁসাটা চেয়ে নেয়, দে, আমাকে একবার দে তো।'

সকলেই বুঝে যায় কালু হিম্মৎ দেখাতে এগিয়ে এসেছে।

মানা গয়লাকে কালু বলে, মানা খুড়ো··· যত যাই হোক, আজ আমার গরবীকে সন্ধ্যায় 'তোরণ বিজয়ী' হতেই হবে। আপনি এ-ব্যাপারে আমার কাছ থেকে একটা কাপড় পেতে পারেন, যদি মনে করেন তো।'

কিন্তু মানা গয়লার ধুতি পাবার ব্যবস্থা তো ব্রাহ্মণেরা আগেই ঠিক করে দিয়েছে। কারুর না কারুর গোরু তো 'তোরণ বিজয়ী'

হবেই, তার মালিককে একটা ধুতি না দিলে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। তাই মানা গয়লা বলে, 'আজকে ধুতি তো কপালে লেখাই আছে রে কালু। তবে হ্যাঁ, ধুতিতে ধুতিতে তফাতও হতে পারে বৈকি !'

'আমার ধুতি দিয়ে কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে জল বেঁধে নিয়ে যেতে পারবেন।'

মানা গয়লা খুশি হয়ে ওঠে, 'তাহলে ধরে নাও গে যাও যে তোমার বুড়ো গবরী 'তোরণ বিজয়ী' হয়েছে।

এর পরে মানা গয়লা কালুকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়ে আগের দিকে পাঠিয়ে দেয়। বলে, 'দেখো বাপু কালু, তোমরা সব ঠিকমতো খেয়াল রেখো। গোরুর সাথে ছুটতে গিয়ে কেউ গোরুর পায়ের তলায় পড়ে না যেন··· ।

'কখনো পড়েছে নাকি যে এ বছরে··· ? আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

কালুর সঙ্গে শংকরদা, ভগা আর বেচাতের ছোটো ভাই এসে যোগ দেয়। তিন জনেই কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে কাঁসি বাজাতে শুরু করে। ক্রমশ ছুটে এগিয়ে আসতে থাকা গোরুদের গতিবেগ বাড়ানোর জন্যে চিৎকার করে ডাকতে থাকে তাদের—'হী···য়ো···হী য়ো ··· ।'

সর্দার গয়লা দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া গোরুরা কাঁসির শব্দে মুখ ঘুরে দাঁড়ায় 'হী··· য়ো' ডাকের প্রতি খেয়াল হতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। পায়ে পায়ে এগোতে থাকে··· মাঠের মাঝ বরাবর এসে দৌড়তে শুরু করে। গয়লাদের থেকে তাদের দূরত্ব ক্রমশ কম হতে থাকে, এক পাকের মতো দূর··· পাঁচ হাত মাত্র ··· এক হাত···

ভগার পা মাটিতে পড়ে কি না পড়ে এভাবে সে দৌড়ে মাঠের অন্য দিকে গিয়ে পৌঁছয়। পাশের দিকে মোড় বেঁকে টিলার ওপরে উঠে পড়ে আর গোরুরা সোজা গাঁয়ের দিকে ছুটতে থাকে··· ।

কিন্তু তত্তক্ষণে লাঠি হাতে অন্য যুবকেরা তাদের সামনে গিয়ে

পড়ে। গোরুরা থেমে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের ডাকার আওয়াজ শুনতে পায়—

'হী··· য়ো! হী··· য়ো মা'। গোরুদের কান হরিণের কানের মতো সজাগ হয়ে ওঠে যেন।

অল্পক্ষণ যেন তারা সেই কাঁসির আওয়াজের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দূর থেকে ভেসে-আসা শব্দ চিনতে চেষ্টা করে। কুড়ি বছরেরও পরিচিত মানা গয়লার চীৎকার টিলার ওপর থেকে উঠছিল, 'হী··· য়ো··· হী··· য়ো!'

রামা কালুকে বলে, 'তুই কাঁসি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলি বলেই গবরী আগের বারে সকলের থেকে এগিয়ে ছিল। কিন্তু এবারে যদি আগে বেরিয়ে আসতে পারে তা হলে বুঝব ঘন্টি বাঁধা সার্থক হয়েছে।'

'তা হলে মানছো তো? ঠিক আছে, দেখা যাক্ কি হয়!' কালু অন্যদের রামার কথাটা বলে শোনায়; শুধু তাই নয়, বিকেলে 'তোরণ বিজয়ী' হবে কি না হবে তার জন্যে পথ চেয়ে বসে না থেকে সে নিজের মনকে বোঝাতে থাকে, তোরণটোরণ জয় করার আর দরকার নেই— অন্যদেরও সেই কথা বলে, 'এবারে যদি গবরী অন্য গোরুদের ফেলে এগিয়ে আসে তা হলে 'তোরণ বিজয়ের' সমান কৃতিত্ব বলে ধরা হবে তো?'

প্রত্যেকে স্বীকার করে সে কথা, 'হ্যাঁ, এবার যদি তোর গবরী এদিক থেকে ওদিকে সকলের আগে যেতে পারে তবে বিকেলের 'তোরণ বিজয়ে'র বরাবর মেনে নেওয়া হবে, বুঝলি?' রামা সকলের হয়ে বলে দেয়।

কিন্তু এই-সব কথাবার্তা ঠিক করার আগেই ক্ষেপে-ওঠা গবরী আর্ধেক গোরুর দল পার করে এগিয়ে আসে। ওপর থেকে মানা গয়লা তার নাম ধরে ডাকতে থাকে, 'হী···য়ো! গবরী হী···য়ো···'

গবরী নিজের নাম শুনতে পেয়ে পৃথিবী তোলপাড় করে ছুটে আসে। কিন্তু অন্য গোরুরা কিছু কম যায় না···

ঘোড়দৌড়ের সময় দর্শকদের লক্ষ্য আট-দশটা ঘোড়ার ওপরে থাকে কিন্তু আজ এই গোরুর রেসে সারা গাঁয়ের দৃষ্টি বিঁড়ের ছাপ দিয়ে সাজানো গবরীর ওপরে ছিল। কালু তো নিশ্বাস ফেলতে ভুলে যায়, প্রাণ যেন চোখে এসে পৌঁচেছে, 'তা হলে স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্যি হবে— রাজু এ জন্মেই এ জীবনেই আসবে বলে মনে হচ্ছে,' কিন্তু হায় রে বরাত! গবরী আগেও কখনো আসতে পারে নি, আজও পৌঁছতে পারে না।

রামা এবং অন্যেরা অবশ্য প্রশংসাই করে, 'যাই হোক, গবরীকে কিন্তু ধন্য বলতে হবে। এত গোরুর ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা সোজা কথা নয়।'

পরের বারে পেছিয়ে থাকা গবরী সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। রামাকে স্বীকার করতেই হয়, 'কালু এত বোকা নয় যে শুধু শুধু বুড়ো গোরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধবে।' লোকেরাও নিজেদের কান মলে দেয়, 'আমরা আগে হাসছিলাম, কিন্তু গবরী তো আশ্চর্য খেল দেখালে ভাই।'

কালু এই পাঁচজনের কথাবার্তাকেই সত্যি বলে মেনে নিয়ে নিজের স্বপ্নটাও সত্যি হিসেবে ধরে নেয়। সে খুশি হয়ে ওঠে··· কিন্তু খেয়াল হতেই হেসে ফেলে। নিজের মনে বলে, 'ভুর, পাগলের মতো কি সব সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে চলেছি!'

শেষ বারের সময় মানা-গয়লা 'হী··· য়ো··· হী··· য়ো' করতে করতে গভীর জঙ্গলে ভরা টিলার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তার পেছনে পেছনে গোরুর দলও। অল্প কিছুক্ষণ বাদে সমস্ত বনাঞ্চলে যেন বকের সাদা ডানা ঝটপট করতে দেখা যায়···

॥ বাইশ ॥

রহস্যের মধ্যে রহস্য

লোকেরা গ্রামের দিকে ফিরতে থাকে। সবার পেছনে নতুন জামা জলুসে যৌবন উদ্ভাসিত করে স্ত্রীরা চার-পাঁচজনের দল তৈরি করে গান গাইতে গাইতে আসছিল :

'মাতা আজনাঁ ভড়কেলাঁ ক্যারে আবশো ?
মাটী সাঁজনী বেলাএ বাটী জোজো রে
থনগন করতা আবশুঁ...'

(হে মাতা, আজকের এই আনন্দ-উৎসবের পর আবার কবে আসবে ? সন্ধের পর আমার পথ চেয়ে থেকো, আমি নাচতে নাচতে এসে যাব...)

স্ত্রীদের থেকে কিছু এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেরা নিজেদের গানে মেতে ছিল—

'ভোজনাঁ চোর পোঁ'চ্যা রে সামী মালী এ
পেলী বেলানাঁ ওড়ণোমাঁ য়...'

(ভোজার গোরু ওপারে পৌঁছে গেছে, ওরে, প্রথম বারের দৌড়েতেই...)

সকলের আগে প্রথম সারিতে বাচ্চারা ফুল তোলা কুঁচি দেওয়া জামা একে অন্যের সাথে তুলনা করতে করতে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে পটকা ফাটাতে ফাটাতে যাচ্ছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল তাদের।

কিন্তু কালু না যুবকদের দলে ছিল, না বাচ্চাদের সাথে। সে একলা একলা আপন মনে আসছিল। কে জানে কেন কাল রাতের ঘটনার পর এই ছড়ার গানটা কাপড়ে চোরকাটা আটকে থাকার মতো তার চিন্তায় খোঁচা দিচ্ছিল, আর সে নিজে ও রাজু সেইভাবেই তো গোরু-বাছুর চরাতো, নয় কি ?

'তারী ধানী নে মারা দালিয়া
বেলু ভেগা ভেলষীএ আজ।'

(তোর খই আর আমার ছোলা, ও বেলু (নায়িকা) এক সাথে মেলাব আজ!)

গানের এই খই আর ছোলার কথা তার জীবনে পুরোপুরি সত্যি। কালুর চোখের সামনে নদীতটের সেই বটগাছ, গাছের নীচে তাদের সেই বসবার জায়গা, ভুট্টার থেকে খই ভেজে ভাগ করে খাওয়া, বটগাছের ঝুড়ি ধরে দোলা আর গান গাওয়া··· সেই পুরোনো দিনের সমস্ত ছেলেবেলেটাই ভেসে ওঠে।

খেয়াল হতেই সে নিজের ওপরেই চটে যায়, 'আজ দুদিন ধরে আমার কী যে হয়েছে কে জানে? হাসবার চেষ্টা করতে করতে সে আপন মনে বলে, 'ঘুমোলে নাহয় স্বপ্ন দেখা যেতে পারে, কিন্তু এ যে জেগে জেগেই দেখছি?'

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হতে থাকলেও কালু শংকরদার বাড়ির বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাকে সেখানে যেতেই হয় কারণ গাঁয়ের মোড়লেরা যে সেখানে আজ বিচারে বসবে। কালু ও রামা নিজেরাই তাই চেয়েছিল। কিন্তু এই গান যে আজ কালুর পেছনে লেগেছে তার কি হবে? ভীতু লোকে যেমন ভয়ের চোটে নিরুপায় হয়ে একসময়ে মেনে নিতে বাধ্য হয় কালুও তেমনি নিজেকে ঘটনার হাতে ছেড়ে দেয়, সে নিজেও এরপরে গান গাইতে শুরু করে:

'তারী ওড়নী নে মারাঁ কালিয়াঁ
বেলু গোরিয়ো ঘুমড়ীএ আজ···

(চল বেলু, তোর ওড়নী আর আমার পাগড়ী ঘুরোতে ঘুরোতে আজ বাছুরদের খেলাই···)

কালুর মন ক্রমশ খুশি হয়ে উঠছিল। এই জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ সে যেন নতুন করে উপভোগ করতে থাকে। কিন্তু শংকরদা সে সময়ে তাকে ডেকে বলে, 'তুইও এভাবে গান গাইতে থাকলে

তো চলবে না কালু। সব-কিছু তৈরি রয়েছে, তুই মিষ্টিটা বানাবি চল!'

কালুকে উঠতেই হয়। ঘরের ভেতরে গিয়ে ভগার বউকে ধরে, 'ও রতন বউ, তুই নিয়ে আয় দেখি সব-কিছু। আগে দু-চারটে কাঠ নিয়ে আয়··· ঘি আর গুড় আন। আর আটা পেষা আছে তো? নাকি সারা রাত তাতেই কাটবে আজ!···' এইভাবে কালু ভগার বউয়ের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে মিষ্টি তৈরি করতে লেগে যায়।

বাইরে সে সময়ে চটে থাকা রণছোড় মোড়ল আর তার ভাইকে রাজী করিয়ে মজলিসে নিয়ে আসার আলোচনা চলছিল। বুড়ো পরমা কাল সন্ধে থেকেই বিছানায় পড়ে ছিল নইলে বেচাত কাকা যেমন বলছিল, 'বুড়ো হলে তো একবার ডেকে পাঠালেই এসে যেত কিন্তু এরা তো ভাই সব নতুন যুগের মানুষ। জেদ ধরে যে বসে আছে তো বসেই আছে। রণছোড় তো এদিকে বুড়ো গাধা হতে চলল কিন্তু এখনো বুদ্ধি হল না এতটুকু।'

'তা হলে কালিয়েকে পাঠান ডেকে আনার জন্য।' একজন বুড়ো রাস্তা বাতলায়। অন্য দু-চার জনে সায় দিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আসবে কি বল?'

বেচাত না বলে আর থাকতে পারে না, 'এ কি কালুর নিজের বাড়ির কোনো কাজ যে সে রাজী করাতে ছুটবে?'

'ঠিক কথা তো।' দু-চার জনে এ কথাতেও সায় দেয়। ঘরের মধ্যে উঁচু মাচায় বসেছিল রামা, সে মৌকা পেয়ে বলে, 'তা হলে এক কাজ করুন-না কেন— রণছোড় মোড়লের ল্যাজেতে কালুকে বেঁধে দিন, তা হলে সব মিটে যায়!'

'আরে ভাই, তোমরা সকলেই যদি এভাবে কথা বলো তবে আজ এই উৎসবের দিনে মোড়লকে চটিয়ে রাখতে চাও নাকি? আসল কথা বলতে গেলে বলতে হয় তোমরা সকলেই এক সুরে কথা বলছ বলেই মোড়লের বাড়ি থেকে কেউ আসতে চায় না।' সেই আগের

বুড়ো বলে।

ঠিক কথা! বিচার করার ইচ্ছে নেই কারুর ওদিকে…'

কাসম ঘাঁচীর হাসি পেয়ে যায়, 'আপনিও বা এ কী ধরনের কথা বলছেন? যার নালিশ করার সে এখানে এলে তবেই তো বিচার করা যাবে, নাকি ঘরে বসে থাকলেই বিচার হবে—?' অন্য লোকেদের বলে, 'আপনাদের এত প্রেম যখন তখন যান ডেকে নিয়ে আসুন। তার পরে ঠিক বিচার হয় কিনা দেখুন।'

দু-চার জনের রোখ চেপে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সেই বুড়োও উঠে পড়ে এবং সকলে মিলে রণছোড় মোড়লকে প্রায় টেনে নিয়ে আসে। সেই বুড়ো শংকরদার উঠোনে পা দিয়ে বলে ওঠে, 'নাও ধরে এনেছি, এবার বিচার করো। কেমন বিচার হয় দেখি একবার।'

রামা যেন পথ চেয়ে বসে ছিল, হ্যাঁ, এবার বিচার শুরু হবে বৈকি?' মাচার থেকে নেমে চৌকাঠে এসে বসে, "এবার তা হলে সেই ভেংমা ডামরকে ডেকে পাঠান।"

'কেন, ভেংমাকে এখানে আবার কিসের দরকার?' রণছোড় বলে।

'ছেলেমানুষ, বুঝলে, নিতান্তই ছেলেমানুষ! এখন বোঝায় একে কী দরকার।' রামা চটে যায়।

রামার যেন কোনো কাজ—তার সাধারণ কথাবার্তাকেও লোকে ঠাট্টাইয়ার্কি বলে মনে করে। তাই তটস্থ হয়ে ওঠা লোকেদের পক্ষ থেকে কাসম ঘাঁচি বলে, 'তুই কথাটা ঠিক বুঝতে পারিস নি। ভেংমাকে তোর কিসের দরকার এখন?'

'ঐ ভেংমাই গভীর রহস্য, কাসমচাচা' রামা দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আমি লিখে দিচ্ছি রণছোড় মোড়ল কিছুতেই ভেংমাকে ডেকে পাঠাবে না।'

'ভাই, এ-সব কথা বাদ দিন, আমার বিচারের আর প্রয়োজন নেই। আপনাদের যার যা ইচ্ছে তাই করুন, তা হলে যথেষ্ট বিচার করা হয়ে যাবে!'

'দেখুন মোড়ল, আপনি গাঁয়ের লোকদের নামে মিথ্যে অপবাদ দেবেন না। তা হলে কিন্তু আমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে বলে দিচ্ছি।'

'তা দাও-না বলে, কী এমন বড়ো কথা এটা' দু-চার জনে বলে ওঠে। সকলের কাছেই গাঁয়ের সীমানায় বসবাসকারী, ভেংমা রহস্যজনক ব্যক্তি হয়ে ওঠে, 'কি ব্যাপারটা কি?'

মোড়লের নিজের পক্ষের লোকেরাও কুতুহলী হয়ে ওঠে। রণছোড়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে, 'ডাকব নাকি ভেংমাকে? দেখাই যাক-না কী ব্যাপার।'

মোড়ল তাদের কথার মধ্যে বলে ওঠে, 'দূর ভাই, মরুকগে যাক ও-সব কথা! আমি বিচার করাতে চাই না। নানিয়ার নাক ভেঙেছে তার হয়েছেটা কি, অন্য কেউ তো আর ভাঙতে আসে নি? ভাই ভাইকে মেরেছে। এমন তো আকছারই হচ্ছে?'

কাসমঘাঁচী খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'এবার থেকে এমনি উদার দিলের পরিচয় দিয়ো মোড়ল।'

ওদিকে দু-পক্ষের লোকেরাই, গ্রামের প্রায় তিনের চার ভাগ লোকে অবাক হয়ে যায়। শংকরদা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, 'এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ল সবার সামনে নালিশ করছিল, ঘরের থেকে নানিয়াকে বাইরে টেনে এনে তার ভাঙা নাক দেখাচ্ছিল, নড়ে যাওয়া দাঁত দেখিয়ে গদগদ স্বরে বলছিল, 'গাঁয়ের লোকেরা এর কোনো বিচার করছে না, বলছিল যে, শংকর ভাই, তুইও অন্যদের সঙ্গে এক গাড়িতে বসে গেলি…' আর এখন কিনা জানাচ্ছে 'ভাই ভাইকে মেরেছে তাতে হয়েছেটা কি।' একে তা হলে কি বুঝব? মনে মনে ভেবেছিলাম কালুকে কিছু সাজা দিয়ে মোড়লকে খুশি করব কিন্তু এখন তো দেখছি মোড়ল নিজেই…'

কালুও সব কথাই শুনছিল। তারও ইচ্ছে ছিল যে ভেংমাকে যেন ডেকে আনা না হয়, তা হলে রাজুর নামও এসে পড়বে—আর সকলে অপমানিত হবে। যদিও সমস্ত দোষই নানার ছিল কিন্তু

কালুর স্থির বিশ্বাস ছিল লোকে নানার এই ব্যাপারে খুব বেশি দোষের চোখে দেখবে না…এবং তার ওপরেই দোষ চাপাবে, এই-সব কথা ভাবছিল। এখন রণছোড়ের 'ভাই ভাইকেই তো মেরেছে' এই-ধরনের বেফাঁস কথা শুনে রহস্যের আভাস দেখতে পায়। রহস্যের কিনারা খুঁজতে গিয়ে তার মিষ্টির পাক শক্ত হয়ে ওঠে কিন্তু রহস্যের কিছুই ধরতে পারে না।…

শেষে বিকেলে গাঁয়ের সকলে 'তোরণ বিজয়ের' খেলা দেখতে আসার সময় রহস্যের জট খুলতে দেখা গেল। ফাল্গুন মাসে ফুলে ফুলে ভরে থাকা পলাশ গাছ যেমন বনের সব গাছের ভেতরে উজ্জ্বল, তেমনি গাঁয়ের সব স্ত্রীলোকদের মধ্যে রাজুকেই প্রকট দেখা যায়। কালুর ভাবনা হয়, 'চুপচাপ আজ রাত্তিরে রাজুকে কাপড় পরাতে চায় বলেই হয়তো রণছোড় মোড়ল বিচারের জন্যে বিশেষ জোর করে না….বুড়ীও সেই জন্যে রাজুকে আনতে লোক পাঠিয়েছিল। নইলে দূরে বিয়ে হয়েছে বলে নতুন বছরের দিন তো অনেক মেয়েই আসে না। এ তো আর আমার ঘরের থেকে খবর যায় নি।…., পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোদরকে তার আজ শত্রু বলে মনে হতে থাকে।

কালু মনে মনে এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে 'হী…য়ো…হী…য়ো….গবরী' করতে করতে দৌড়োতে থাকা মানা গয়লা কিংবা থালায় মুগের ডালে তিড়িং মিড়িং নাচার মতো ভঙ্গিতে গোরুদের দৌড়নো, কোনো কিছুই সে দেখতে পায় না। সেদিকে নজর থাকলে তবেই না দেখতে পাবে ? সে তখন 'রাজুর সঙ্গে কখন দেখা করব… কোথায় দেখা করব…কি করব না ?…এ-সব কথা বলা উচিত হবে কিনা' ইত্যাদি চিন্তাতে ডুবে ছিল। ধান-দূর্বা দিয়ে আজ যে গোরুদের পুজো করতে হয় তাও সে মনোযোগ না দিয়ে অন্যদের অনুকরণ করেই সারে।

কালুর গোরু 'তোরণ বিজয়ী' হয়েছে বলে পঞ্চায়েৎ ঘোষণা করে। রামা ভগৎ প্রভৃতিরা তাকে অভিনন্দন জানায়। কাসম

ঘাঁচী তাকে 'খুবই সুলক্ষণ ভাই' সামনের বছর তোমার ভাগ্য বেশ ভালো যাবে' ইত্যাদি বলে কিন্তু সে-সব কথায় কালু কান দেয় না, সে ভান করে যেন সব-কিছুই শুনছে··· ।

মহাকালের অগণিত বৃত্তাকার চক্রে পৃথিবী যেন আর-এক চক্র যোজনা করে। অস্তগামী সূর্যদেবকে আজ ধরিত্রী যেন গোধূলির রূপ ধারণ করে পুজা করতে থাকে, আজকের দিনকে বিদায় জানাতে থাকে···

গোরুদের পেছনে ঘরে ফেরার পথে গ্রামের লোকেরা বিশেষ করে যুবতীরা গান গাইতে শুরু করে। সম্মিলিত গানের মধ্যে রাজুর গলা কোকিলের মধুর স্বরের মতোই অন্য সকলের থেকে আলাদা ভেসে আসে। অন্যমনস্ক কালুর ভাবনাকেও রাজুর এই নতুন গান নিবিষ্ট করে তোলে।

'দন তো দোড় তো জায়, মনখো মাণ্যো নীর রেলোল !'

(দিন যেন দৌড়তে দৌড়তে চলে যাচ্ছে, জীবনকে ভোগ করা হল না এখনো)

গানটা নতুন তাই গানের পরের পঙক্তিগুলি রাজু প্রথমে একলাই গাইছিল। আজকের এই রাজুকে কালুর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লাগে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বিড়বিড় করে, 'না জানি তোর কত রূপ ?' আনন্দে তার মন কানায় কানায় ভরে ওঠে, আর সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ গানের প্রত্যেক শব্দে গুঞ্জন করে গুঞ্জরিত হয়।

'সবাবো সমণে থায়, মনখো-মণ্যো নথী রে লোল !'

(স্বপ্নের মধ্যেই রাত ভোর হয়ে যায়, জীবনকে আর ভোগ করা হয় না)

কালুর মনে হতে থাকে রাজু যেন তাকেই বলছে তার কাছেই নিজের দুঃখকে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে।

'বর্ষ ব্যাজমো যায়, মানখো মণ্যো নথী রে লোল।'

(সুদ দিতে দিতেই বছর কেটে গেল, জীবনকে ভোগ করা হল না।)

গানের এই লাইনটা শুনে কালুর মনে হয়, যেন তীব্র কোনো বেদনায় হৃদয় গলায় এসে আটকে গেছে। কিন্তু হৃদয় গলায় এসে না আটকালেও কমলালেবুর কোয়ার মতো আয়ত দু'চোখে জল জমা হয়ে যায়। 'আমারও এই একই অবস্থা রাজু।' পরের বারে গান গাইবার সময় তার হৃদয়ও যেন গান গাইতে থাকে—'কাঁদিতে থাকে।'

'বর্ষো ব্যাজমা যায়, মনখো মণ্যো নথী রে লোল,
জীবড়ো ঝঞ্চনো যায়, আরে রে, মণ্যো নথী রে লোল।'

(সারা বছর সুদ দিতেই কেটে গেল, জীবনকে ভোগ করতে পারি নি; মন তীব্রভাবে কামনা করতে থাকে, তবুও হায় রে— জীবনকে ভোগ করতে পারি নি।)

'এমন অবস্থাই হবে! তোর, আমার দুজনেরই।'

কালুর পাশেই কোদর, ভগা প্রভৃতিরা গান গাইতে গাইতে আসছিল কিন্তু কালু যেন কিছুই শুনতে পায় না। গান শেষ হয়েছে মনে করে মহুয়া পাছের চত্বরের দিকে যাবার রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁচেছে, সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে কারণ তাকে সোজা ঘরে যেতে হবে। পথেই রাজুর সাথে দেখা করা দরকার। কিছুটা সন্দেহ তো মনে ছিলই, এই গানটা তাকে বেশি ভাবনায় ফেলে দেয়, 'যাই হোক-না-কেন, রাজু আজ খুশিতে ভরে উঠেছে।' আর এও যেন কম বলা হল, তাই রাজু পরের গানেতে তার শোধ তুলে নেয়;

'সহিযর এবুং নাং থায়, মনখো মানী লেজো রে লোল।'

(হে-সখী, এভাবে বৃথা কাটিয়ো না, জীবনকে ভোগ করে নাও)

দ্বিতীয় পঙক্তি শুনে কালু চমকে ওঠে;

('জাগ্যাং ত্যাথী সবার, মনখো মানী লে জো রে লোল।'

(যখনই জাগবে তখনই সকাল হবে, জীবনকে ভোগ করে নাও)

'কালু তুমি বিশ্বাস করো আর না করো কিন্তু রাজু তোমার এবং দুনিয়ার আর সবাইয়ের কথায় সম্মতি দিলেও সে যা করবে বলে মনস্থ করেছে তাই বলছে সে গানের মধ্যে। শোনো মুর্খ শোনো

সে কী বলছে!'

'কুটনো লোড় লপার, মনখো মানী লে জো রে লোল।'

(কামার তো লোহা পিটবেই, জীবনকে ভোগ কার নাও)

'এর অর্থ কিছু বুঝলে? চিন্তা ভাবনা সব-কিছু গোল্লায় যায় যাক্। তাকে তো আজ সুদর্শন নানিয়ায় কাছেই যেতে হবে, জীবনকে ভোগ করতে হবে···বলো? আর-কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? শোনো, 'দনমা বব্বোবরে (দিনে তো দু'বার)....'

রাজু এর পরে অন্য গান গাইতে থাকে কিন্তু অধীর ব্যকুল কালু 'দিনে দুবার' কথাটার সঙ্গে সে গানটাকেও মিলিয়ে নেয়, সেইসাঙ্গে সে জিভের ডগায় এসে যাওয়া কথাটা চেপে নেয়, 'এ কী বলছে ও! পাগল হয়ে গেছে নাকি অথবা....'তার ইচ্ছে হচ্ছিল রাজুর মুখে কিছু ঠুসে দেয়— গলা চেপে ধরে।

কিন্তু ততক্ষণে তার খেয়াল হয়। এ গানের কথা কিছু ভিন্ন, ভাবও আলাদা। কালু নিজেই নিজেকে শান্ত করে, 'তুই আগে পুরোটা তো শোন্ ঠিক করে?'

দ্বিতীয়বার রাজুর গান গাওয়ার সময় সে গানের কলিগুলো মন দিয়ে শোনে:

'দনমাং বব্বেবার
সাঞ্জনী-সাথে সবার।
জোবনাই কে ছে ঝপাহ! মনখো মানী লে জো
রে লোল।'

(দিনেতে দুবার করে, সকাল এবং সন্ধ্যায় যৌবন অভ্যর্থনা জানায়, জীবনকে ভোগ করে নাও)

অন্য দিন হলে কালু গানের এই লাইনগুলো শুনে খুশি হত, বলে উঠত, 'ঠিক কথা, সূর্যদেব তো দিনে দুবার সকালে ওঠার সময় ও অস্ত যাবার সময় আমাদের সতর্ক করে যায়। বলতে থাকে, পাগল! সাবধান হয়ে যাও। এমনি ভাবেই একদিন যৌবনের অভ্যর্থনার দিনও শেষ হয়ে হয়ে যাবে সুতরাং—'

কিন্তু আজ সে অন্য কিছু কথা বলে রাজুকে উপলক্ষ করেই। ....তাই তুমি আমাদের জ্ঞান দিতে শুরু করেছ। ঘুম থেকে উঠলে তবেই সকাল। কালুর বিশ্বাস হয়ে যায়, 'ও তো আজ খোলাখুলি ভাবেই বলছে, লোকে না বুঝতে চাইলে আর কি করে বুঝবে— গানের রহস্য অন্য রহস্যের থেকে কিন্তু আলাদা!...'

সেই সময়ে রামা-কোদর তাকে বলে, 'গাঁয়ের দিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই কালু?'

এই কথাতে অন্য লোকদেরও খেয়াল হয়, 'আরে তুই তো আচ্ছা লোক। বাড়িতে গেলেও আবার না এসে তোর উপায় নেই আর আমাদেরও তোকে না ডাকা ছাড়া, তোদের (রণছোড় আর কালুর) কথা বন্ধ ভাঙলে, গাঁয়ের লোকের স্বস্তি হবে?'

কাসম, শংকর এরা ওকে বকাবকি শুরু করে দেয়, 'আহা। হা হা! গাঁয়ে যেন আর কেউ লড়াই মারামারি করে না? তা ছাড়া তোরা এক বংশের ছেলে। এই নতুন বছরের দিন ভাই-ভাইয়ের সাথে দেখা না করে থাকে নাকি কেউ, কালু!'

কালুকে তাদের সঙ্গে যেতেই হয়— এমনিতে অন্তরের মধ্যে 'এক বংশের ছেলে' আর 'ভাই-ভাই' প্রভৃতি শব্দ আগুন ধরিয়ে দিতে থাকে আর কাসম, শংকর ও রণছোড়ের হঠাৎ এই মধুর ব্যবহারে সেই সন্দেহ ও তার অধীরতা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে যেতে থাকে... কিন্তু কী আর করবে সে। বংশানুক্রমে চলে আসা সামাজিক রীতি তাকে ধরে রাখে।

॥ তেইশ ॥

তোর কী ?

সেই মহুয়াগাছের নীচে গোল চত্বরে বসে থাকা বয়স্কদের রণছোড় মোড়ল ভালো করে লক্ষ করে। দুটি পরিবারের লোকদের না আসার কারণ সকলেই জানত। কিছুদিন আগে তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল, একজন রামা আর দ্বিতীয় জন অন্ধ বুড়ো জগা। কারণ সেই একই, এর গোরু ওর ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে।

মোড়ল লোক পাঠিয়ে ওদের গ্রামে ডেকে ডেকে আনায়। সেই অবসরে কালু ও রণছোড়ের মধ্যে কথা শুরু করার জন্যে অন্যেরা খোশামোদ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কালু রণছোড়ের সাথে দেখা করতে আপত্তি জানায় নি কিন্তু নানিয়ার সাথে দেখা করতে রাজী হয় না। তাদের কথায় আধাআধি রাজী হয়ে যায় কিন্তু সে দেখল যে শংকরদা, কাসম ইত্যাদি লোকেরা নানার সাথেও দেখা করতে হবে এই জেদ ধরে মোড়লের পক্ষে গিয়ে বসে পড়েছে। কালু বুঝতে পারে এরা কিছুটা ঘাবড়ে গেছে— সে তখন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে, 'আমি খুশি হয়ে তার সঙ্গে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে পারব না…তা হলে আপনারাই বলুন। মন যেখানে চাইছে না সেখানে মিছামিছি আলিঙ্গন করে কী লাভ ?'

তারা অবশ্য বলে, 'আরে ভাই মন থাকল কি না থাকল সেটা কোনো কথা নয়, তুই খালি একবার বুকে জড়িয়ে ধর, তা হলেই হবে।' কিন্তু কালু রাজী হয় না। কাঁধে কাঁধ মেলালে কি আর মনের মিল হয় কখনো ? সে পরিষ্কার অস্বীকার করে, 'আপনারা মিথ্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন। নানিয়ার সঙ্গে আর যাই করি-না কেন, ওর সঙ্গে আজ কোলাকুলি করব না।'

'কেন, কিসের জন্যে ?' কাসম জিজ্ঞেস করে।

কালু এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? অবশ্য মনে মনে তার উত্তর তৈরি ছিল, 'কেন আবার, নানিয়ার সঙ্গে আমার ঝগড়ার মিটমাট করিয়ে দিয়ে আপনারা আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইছেন এবং তার পরে আপনারা রাজুকে নানিয়ার দেওয়া কাপড় পরিয়ে দিতে চান··· 'কিন্তু এ কথা বললেই এর পরে কথা উঠবেই, 'তা রাজুকে অন্যে যদি কাপড় পরাতে (দ্বিতীয় বিবাহ) চায় তো তাতে তোর কী?' এ প্রশ্নের কোনো উত্তর কালু দিতে পারবে না। আর সত্যি কথা যদি বলে দেয় যে, 'মানলে তো, অনেক কিছুই আছে— আর না মানো যদি তা হলে কিছুই নেই।' কিন্তু এ জবাব দিলে লোকেরা ওকে পাগল ভেবে বসবে, তাই সে তার শেষ জবাব শুনিয়ে দেয়, 'ঠিক আছে আপনারা যদি এভাবে পেড়াপীড়ি করেন তো আমি এখান থেকে উঠে চলে যাব।'

কালু চটে উঠেছে দেখে অন্যেরা তাকে ছেড়ে দেয়। আশপাশের অন্যদেরও দু-চার কথাতে বুঝিয়ে দিতেই সকলে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে ঠিক পিঁপড়ের সারির মতো লাইন দিয়ে একে অন্যেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর মুখে নমস্কার বলতে থাকে, মনে হয় যেন এক সাথে অনেক ভ্রমর গুঞ্জন করছে···

কিন্তু কালুর মন এতই অশান্ত ছিল যে, সে কাসম ঘাঁচীকে 'সেলাম' না বলে 'নমস্কার' বলে বসে···

দেশমাতা, পবনপুত্র হনুমান ও গাঁয়ের ইষ্ট দেবতার বন্দনা শেষ হতেই ও বেরিয়ে আসে। অন্যেরা গ্রামে ফেরার পথে গান ধরে :

'জীয়ো জাগো তো রাপণাং বেসাড়জো।
পেলা মুযলানা ছেলা ঝবার।'

(যতদিন বেঁচে থাকবে আনন্দের আসর বসিয়ো, মৃত্যুপথযাত্রীর এটাই শেষ বাসনা!)

কিন্তু এই চরণ দুটো শেষ হতে না হতে কালু অন্যদের থেকে প্রায় দুটো ক্ষেতেরও বেশি এগিয়ে যায়। সকলে গাঁয়ে এসে পৌঁছনোর আগেই রাজুর সঙ্গে দেখা করার এই একমাত্র উপযুক্ত

তার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। রাজুর আবার বিয়ে করার কথাটায় কোনো সত্য আছে নাকি আমিই কেবল একা সে কথা ভেবে চলেছি ?··· তার কাছে অবশ্য এ কথার কোনো প্রমাণ ছিল না। কেউ এসে তাকে খবরটা দিয়ে যায় নি, তবুও কালুর অন্তর যেন বলে ওঠে, 'লিখে রাখো যদি মিথ্যে হয় তো কী বলেছি। রণছোড়ের বাড়ির লোকেরা বুড়িকে নিজেদের দলে টেনে নিয়ে কোদরকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে এনেছে আর আজকে রাত্রেই রাজুকে যদি ওরা রাজী করিয়ে না ফেলে তো কী বলেছি··· কোদরকে তো এ বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করবে না! তার যদি অত জ্ঞান-গম্যি থাকত তা হলে তো আর ভাবনার কিছু ছিল না!'

কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।··· 'রাজু কি রাজী হয়ে যাবে ?.... তাকে কোনোই দোষ দেওয়া যাবে না যদি সে রাজী হয়!··· না আছে তার স্বামী-সুখ, না আছে খাওয়াদাওয়ার কোনো সুখ। কার মুখ চেয়ে সে দিন কাটাবে ? একটা ছেলেপুলে'— মনের ভাবনা বিকৃত পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে, 'নিজের কথা ভাবছিস না কেন ? তুই আর ও তো একসঙ্গে বিয়ে করেছিস, তোরই যখন এখনো ছেলেমেয়ে হল না তখন ওর কী করে হবে ? আর নানিয়ার বউ আজ পাঁচ বছর হল শ্বশুরবাড়ি এসেছে। ছেলেমেয়ে না হওয়ার জন্যে নানিয়া আজ যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তো কেউ দুষবে না তাকে...' কালু মাথা নেড়ে বলে 'না ভাই না! আমি পাঁচ বছর কি দশবছরেও যদি দোলনায় শুতে কেউ না আসে তবু দ্বিতীয় বউয়ের কথা চিন্তা করব না। নানিয়া করতে চায় তো বেশ করুকগে যাক্।' কিন্তু সাথে সাথেই সে বলে ওঠে, 'তবে রাজুকে নয়। রাজুও যদি দ্বিতীয় বিয়ে করতেই চায়— সমাজে অন্য লোকের তো কোনো অভাব নেই, বিয়ে করার মতো অনেকেই রয়েছে। কিন্তু এখানে আমার বুকের ওপরে নাকের ডগায় নানিয়া কখনোই নয়··· একবার ও আমার সারা জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছে তার ওপরে

যদি রাজুর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ হয় তো তা হলে আমার বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠবে !'

কালু এমন বিচলিত হয়ে ওঠে যেন রাজু এখনই অন্যের হয়ে যাচ্ছে— গাঁয়ে ঢুকেই সে ঠিক করে ফেলে যে রামা টামা কাউকে পাঠালে চলবে না। সে নিজেই দেখা করবে। 'এখন লুকোনো চুরোনোর কিছুই নেই। এখন আমি আর নানিয়া খোলাখুলি লড়াই করতে মাঠে নেমে পড়েছি। বিয়ের সময় আমি অবুঝ ছিলাম কিন্তু এখন যদি নানিয়া রাজুকে নিয়ে যায় তা হলে নাক কাটা গিয়েও তো নিষ্কৃতি হবে না। আমার বুকের মধ্যে সারা জীবন তুষের আগুন জ্বলতে থাকবে !'.... কালু তার জীবন নিয়ে খেলতে তৈরি হয়ে যায়, 'যদি রাজুকে বোঝালেও সে না বোঝে তো শেষ পর্যন্ত তাকেই শেষ করব, এতে কোনো ভুল নেই। আগে তাকে খতম করব তারপর নিজেকে। নানিয়াকেও জীবন্ত ছেড়ে দেব না...'

কালু রাজুর ঘরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে মাঝ পথ থেকে ফিরে এল। 'ওখানে কথা বলবার ঠিক সুযোগ পাওয়া যাবে না।' সে নিজের বাড়ি চলে আসে। তার স্ত্রী নতুন বছরের জন্যে ঘরদোর প্রদীপ দিয়ে সাজাচ্ছিল, তাকে বলে, 'এক কাজ কর, রাজুকে একটু ডেকে নিয়ে আয় না !'

ভলী এর কারণ বুঝে নিয়েছিল। সকালে ভেংমার নাম উঠতেই গ্রামের সকলে জানতে পেরেছিল, আগের দিনের কালু-নানার লড়াইয়ের রহস্য সবাই জানতে পেরে গিয়েছিল। নানা রাজুকে নিয়ে সংসার পাততে চায় কিন্তু কালু মাঝখানে বাগড়া দিতে আসছে। তবুও ভলী জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

'কাজ আছে। তুই গিয়ে ডেকে তো আন, পরে কারণ বলব। আর দেখ, বুড়ী যেন জানতে না পারে এমন ভাবে ডাকবি। বলিস, যেন একবারটির জন্যে চলে আসে। কোদরের বউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।'

ভলী যাবার পর হুকো ভরতে ভরতে কালুর হৃদয় ধুক্‌ধুক্‌ করছে

লাগল, 'ও আসবে, না আসবে না ? আর মনে কর যদি না আসে তো ?....

তবুও ওকে নানিয়ার কাপড় পরতে দেব না।... দরকার হলে বেচাতের সাহায্য নেব, উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসব—'

উঠিয়ে তো নিয়ে আসবে ? তার পর ? কালুর অন্তরে কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'তারপরে আবার কি ?' ছেড়ে আসব ওকে ওর শ্বশুরবাড়িতে।'

রাজু যদি তা না মানে—উটের পিঠ থেকে যদি না নামে, তা হলে ?

দরজার পাশে ছোটো দালানে বসে হুঁকো খেতে খেতে কালু এক গভীর নিশ্বাস নেয়, 'এমন সৌভাগ্য আর কবে আমার হল যে সে নাববে না !.... তা হলে যা হবার তাই হবে, কিন্তু উটের—' কালু সেই নিবিড় অন্ধকার রাতে নিমগাছের পাতার দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে থাকে সে আগে আর রাজু পিছনে, উটের পিঠে চেপে চলেছে ; ঝোপঝাড় ভেদ করে, পাহাড় ডিঙিয়ে, নদী-নালা পার করে, পথের ধারে গ্রামকে ডাইনে বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে চলেছে···

ভলীকে আসতে দেখে কালুর হুঁশ ফিরে আসে, আপন মনে, 'কী যে ভাবছিস দেখ !' বিড়বিড় করে বলে সে হাসে। 'এখানে আসতেই অস্বীকার করেছে বোধহয়. উট থেকে না নামা কিংবা দূর দেশে চলে যাওয়া তো দূরের কথা !' সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী বলল ?'

ভলী মুখ ভার করে 'আসছে' বলে সোজা ঘরে চলে যায়।

'যাচ্ছিস কোথায়, আমাকে বলে যা সব কথা ! ওর সাথে কোথায় দেখা হল ?'

'কোথায় আবার ঘরেতে, মাঠে তো আর দেখা করতে—'

'তা তুই এত রাগ দেখাচ্ছিস কিসের জন্যে ?' কালুও রেগে যায়। তার পরেই তার খেয়াল হয়, 'কেউ কিছু বলেছে নাকি ?'

'এতে কার কী বলার আছে ?'

রাস্তার দিকে নজর পড়তেই কালু দেখতে পায় একটা ছায়া

এগিয়ে আসছে। অন্ধকারেও সে ঐ কোমর নাচিয়ে চলার ভঙ্গিটাকে চিনতে পারে, 'ঠিক আছে, তুই যা' বলে ভলীকে চলে যেতে আদেশ দেয়।

'এসো', কালু তাকে স্বাগত জানায়।

'হ্যাঁ।' বলে রাজু ঘরে যেতে উদ্যত হয়। কালু তাকে থামিয়ে দেয়, 'এখানেই বসো। আমার কিছু কথা বলার আছে।'

'তুমি খেয়ে নিলে হত না? আমি কতক্ষণ পর্যন্ত আলে জ্বেলে বসে থাকব?' ভলীর কথায় কিছুটা রাগের আঁচ টের পাওয়া যায়. কেনই বা হবে না? ভলীর ভয় ছিল— 'উপদেশ দিতে গিয়ে আবার একে নিজেরই না করে বসে। অবশ্য তার বাধাও যথেষ্ট ছিল, খুড়-শাশুড়ীকে কেউ তো আর বিয়ে করে না?'

আসলে রাজুর সাথে কালু কথা বলে, এটা ভলীর পছন্দ নয়, তা সে নিজের বাপের বাড়ির মঙ্গলের জন্য হলেও!

'আমি আসছি, তুই খেয়ে নে।' ভলীর উপস্থিতি কালুর অসহ্য লাগছিল।

রাজু ঘরে গিয়েছিল, ফিরে এসে বারান্দার পাশের থামে হেলান দিয়ে দ্বিধাহীন ভাবশূন্য মুখে বসে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দূরে পড়ে থাকা একটা দেশলাই কাঠি তুলে নেয়। দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'তাড়াতাড়ি বলো। বাড়িতে কাউকে না বলে কয়েই চলে এসেছি।'

কালু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে কী বলবে ভেবে না পেয়ে শেষে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'যে-সব কথা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি?'

'কোন্ কথা?' রাজুর হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে বুঝতে পারা যায় সব জেনেও সে না জানার ভান করছে।

'কোন্ কথা আবার? নানিয়াকে বিয়ে করার ব্যাপার, সারা গ্রামে এই একটাই কথা শোনা যাচ্ছে, নয় কি?'

রাজুর হাসি পছন্দ হয় না কালুর।

'গ্রামে সকলকে আমি তো আর বলতে যাই নি?'

'তুই তো যাস নি কিন্তু'— কালু হাসতে চেষ্টা করে, 'তবে বল-না যে এ-সব কথা সত্যি ?'

'সত্যি তো বটেই—'

এই শব্দ কটি কালুকে স্তব্ধ করে দেয়। হাস্যমুখী রাজুকে এখন ওর ডাইনী বলে মনে হয়। বলতে ইচ্ছে হয়, 'এখান থেকে উঠে যা।' তার আগে ভালো করে ব্যাপারটা জেনে নেয়, 'কী সত্যি ?'

রাজু আবার হাসে। কিন্তু এবারে তার হাসি ফ্যাকাশে রক্তশূন্য, 'লোকেরা যে-সব কথা বলছে সেই তো!'

'এ-সব কথা কি সত্যি ?' কালু প্রশ্ন করে।

এবার রাজু ছোট্ট জবাব দেয়, 'না।'

'তবে তুই কিছু না বলে যে শুনছিস ?'

রাজু হাতের চুড়ি ও কঙ্কণ ঘোরাতে থাকে।

কালু আবার বলে, 'তোর জায়গায় যদি আর কেউ হত তা হলে সারা গ্রামকে পাগল করে ছাড়ত··· কারো নামেতে মিথ্যা কথা রটানো ছেলেখেলা নয় ?'

আমার সামনে কেউ কথা বলতে এলে তবেই না···ঝগড়া করব কার সঙ্গে ?'

রাজুর এই শেষ কথাটায় কিছুটা দুঃখ এবং কিছুটা রহস্যের আভাস ছিল।

'তোকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি ?'

রাজুর দৃষ্টি তার বাঁ হাতের চুড়ির উপর নিবদ্ধ ছিল। ঘাড় হেলিয়ে শুধু 'না' বলে।

'তোর মা'ও কিছু জিজ্ঞেস করে নি ?'

প্রদীপের শিখাটা যদি কাছে থাকত, যদি সামান্য আলো এসে পড়ত তো কালু দেখতে পেত যে রাজুর চোখে জল এসে জমা হয়েছে। অবশ্য গলার স্বরে অনুভব করা যায়, 'এ-সব কথা জিজ্ঞেস করার মানে ?'

'কারণ এই'— অধৈর্য হয়ে কালু উঠানে একটু পিছিয়ে আসে।

নিজের মনে স্বগতোক্তি করে, 'যা হয়েছে তাই জানতে চাইছি কিন্তু···মিথ্যে তো নয়···সম্পর্ক আছে বলেই না ?'

রাজু যদি কালুকে প্রশ্ন করত, 'সে যাই থাকুক-না কেন জানতে আর চায় কে ?' তা হলে সত্যি সত্যিই হয়তো কালু চটে যেত কিংবা বিরক্ত হত। নিজের মনের সঙ্গে ছাড়া ও কারুর সঙ্গে তো কোনো কথা বলে নি, অতএব জানতে চাওয়ার কথা উঠলে কালু বিব্রত হবে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খুড়শাশুড়ী যখন, তখন সম্পর্ক রয়েছে বৈকি ?' রাজুর গলার স্বরে দুঃখ তিক্ততা এবং ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে।

কালু এর উত্তরে কীই-বা বলবে ? তার অন্তর বলতে থাকে, 'ভুলে যা রাজু! অনেকদিন একসঙ্গে খেলেছি আমরা···খেলতে খেলতেই তুই আমার জল তুলেছিস, খাবার তৈরি করেছিস··· খাইয়েও দিয়েছিস কখনো, আর—'সে একটা গভীর শ্বাস নেয় যেন উদ্গত কান্নাকে আবার ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মনের মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে, 'সবই বুঝতে পারি। ধরে নে যে আমাদের বরাতে এই লেখা ছিল··· যা ভুল মিথ্যে তাই সত্য বলে মানতে হবে আর এই সত্যকেও মিথ্যে বলে বুঝতে হবে। এ যেন আমাদের অন্য আর-এক জন্ম। ভুলে যা সব-কিছু। যা হয়ে গেছে তাকে যেতে যে পাগলী !....' কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে ওঠে, 'যারা আমাদের জীবন নষ্ট করল তাদের বংশ লোপ পাক, বেঁচে থাকতে থাকতেই তাদের গায়ে পোকায় ঘুণ ধরুক।' কমলার কোয়ার মতো তার দীর্ঘ চোখে থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়তে থাকে।

কাদের অভিসম্পাত দিচ্ছে কালু বা কোন্ প্রসঙ্গে এ-সব কথা বলছে, রাজু সে কথা জানতে চায় না। সেও যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন-অতিষ্ঠকারীদের ঐ একই শাপ দিতে থাকে।

'আর, তারই সংসারে গিয়ে উঠতে চাস তুই রাজু ?' কালু চোখের জল মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে।

ভেতরের ঘরে ভলীর ইচ্ছে ক'রে বাসন ফেলা কিংবা তার শব্দ করে কাজকর্ম করার দিকে তারা কেউই খেয়াল করে না। রাজু তখনো হাতের চুরি ঘোরাচ্ছিল। তার চোখ দিয়ে যে টপ টপ করে জল পড়ছিল তাতে তার কোনো হুঁশ ছিল না।

'বল্ রাজু, তোর মুখ থেকে জবাব শুনলে তবে আমি শান্তি পাব!'

রাজুকে চুপ করে থাকতে দেখে কালু আবার বলে, 'আমি জানি রাজু তুই স্বামীর কাছে কোনো সুখ পাস নি। দুবেলা পেট ভরে খাওয়াও জোটে না তোর··· আর আমাদের সমাজে স্বামীকে ত্যাগ করে অন্যের সংসারে গিয়ে ওঠাও কিছু অন্যায় নয়। এমনকি, পেথা মোড়লের নিজের মেয়েও স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে—কিন্তু এখানে আমার এই চোখের সামনে, আমার জীবন যে নষ্ট করেছে সেই নানিয়াকে তুই'—

'কিন্তু তোমাকে বলেছে কে যে আমি স্বামীকে ত্যাগ করে নানিয়াকে নিয়ে সংসার পাততে যাব?' রাজুর চোখে রোষের দীপ্তি প্রকাশ পায়।

'তুই না বললে কী হবে, লোকেরা সবাই বলছে তো? তাই আমি আজ তোর মুখ থেকে একথার জবাব শুনব বলে তোকে ডেকে এনেছি।' রাজুকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে, 'বল্, তোর মনের ইচ্ছেটা কী?'

'তুমি কি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চাইছ?'

'এতে কথা দেওয়া বা প্রতিজ্ঞার কী আছে রে রাজু? তুই ভাবছিস নানিয়ার কাছে অন্তত দুটো পয়সার সুখ আছে, কিন্তু অন্যদিকে যে ঐ খোঁয়া (নানার পত্নী) আর বুড়ি মালী দুজনে সাপের থেকেও ভয়ংকর তা ভুলে যাস নি যেন। তোর গলা দিয়ে খাবার নামতে দেবে না··· কথায় বলে না যে, দড়িতে শুকোতে দেওয়া সতীনের কাপড় পর্যন্ত ঝগড়া করে—'

কে জানে কেন শেষ কথাটা শুনেই রাজু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। 'করুক-না ঝগড়া—' বলে পেছন ফিরে সে।

কালুর মনে হয় তার কানের পাশেই হঠাৎ কেউ যেন বন্দুক ছোঁড়ে।

'কী হল তোর? উঠে পড়লি যে—' বিড়বিড় করে বলতে বলতে সেও উঠে দাঁড়ায়। তারপরে বেশ গম্ভীর ভাবে 'এভাবে চলে গেলে হবে না রাজু। আমাকে একটা কথার জবাব দিয়ে যা' বলতে বলতে সেও উঠোনে এসে দাঁড়ায়। থেমে দাঁড়িয়ে থাকা রাজুর পাশে গিয়ে সে আবার বলে, 'নিজের মনকে জবাব দে তুই পরিষ্কার করে যাতে আমিও বুঝতে পারি।'

'কী বুঝতে চাও তুমি?' এখনও রাজু কথায় রাগ ফুটে বেরোতে থাকে।

'আর কিছুই বুঝতে চাই না··· কেবল এটুকু তোকে জানিয়ে দিতে চাই যে তোকে নানিয়ার সংসার কিছুতেই করতে দেব না আমি··· তাতে যদি আমাকে সারা পৃথিবী ওলট পালট করতে হয় তাতেও রাজী আছি আমি!'

'কেন, কী করবে তুমি?' কালুর স্থির সিদ্ধান্ত রাজুকে খুশি করে।

'এখন তার কিছু বলতে পারব না।' কালু অত্যন্ত গম্ভীর।

'মেরে ফেলবে নাকি আমাকে?' রাজু আড় চোখে তাকিয়েছিল, যেন 'হ্যাঁ' কথাটা শোনার জন্যেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ! মেরেই ফেলব!' বলে কালু রাজুর সেই চিরপরিচিত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলে, 'আর কিছুও যদি না পারি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব, কিন্তু তুই নানিয়ার জন্যে জল ভরে আনছিস সে দৃশ্য আমি সইতে পারব না··· তারপরে তুই যা ভালো বুঝিস করবি।' কালু পেছন ফেরে।

'তল্লাটে ছাইয়ের কিছু কমতি নেই। যদি বল তো এখনই কারুর উনুন থেকে ঝুড়ি ভরে আনতে পারি!'

রাজুর এই ঠাট্টা কালুকে এমন অস্থির করে তোলে যে সে তার ধৈর্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছয়।

'আমাকে আর-কিছু বলতে হবে না তোকে, যা ভালো বুঝিস তাই কর তুই। আমি আর কিছুই বলব না তোকে !' কালু সোজা ঘরের দিকে ফিরতে থাকে।

আশপাশের পাড়া-পড়শীরা যাতে শুনতে পায় তেমনি উঁচু গলায় রাজু বলে, 'মন ঠাণ্ডা করে চুপচাপ শান্তিতে ঘুমোতে যাও দেখি। রাজুর এত মাথা খারাপ হয় নি যে দুটো জীবন চুকিয়ে আবার তৃতীয় আর একটা জীবন—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সে ঘুরে দাঁড়ায় ভগ্ন হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে !

আলাদা হবার পরেও দুজনেই নিজেদের মনের সাথে একই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকে। কালু জিজ্ঞেস করে 'স্বামীকে ছেড়ে যায় অথবা কাল-নাগিনী মালী-খোঁড়ীর ফাঁদে পা দেয় তাতে আমার কি যায় আসে ? অন্যের সাথে যেদিন বিয়ে হয়েছে সেদিন থেকেই ও আর তোর কেউ নয়। আজ আর দুনিয়ায় কারুর মনেও নেই যে একদিন তোদের দুজনের পাকা-দেখা হয়েছিল আর যদি মনেও থাকে তো সে পুরোনো ব্যাপার এখন চুকে বুকে গেছে। এখন তো আর ও তোর বউ নয় যে তোকে লজ্জায় মাথা নিচু করে চলতে হবে। আরে এখন আর ছিটেফোঁটাও সেই পুরোনো সম্পর্কের কিছু নেই। তা হলে ও নানিয়াকে দ্বিতীয় বিয়ে করুক কী কোন্ মুখপোড়া চোরকেই করুক-না কেন, তোর তাতে কী ?'

রাজু মনে মনে বলছিল, 'ও যদি মেরে ফেলে তো তাতে আর কি, পৃথিবীর বোঝা বরং কিছুটা কমবে। আর সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যদি বেরিয়ে চলে যায় তো তাতেই-বা তোর কী ? সংসারের মধ্যে থাকলেও তো ও আর কোনোদিন তোর জীবনে কোনো মঙ্গলেই আসবে না। তা হলে তুই ভাবছিস কেন ?'

তবুও সেই ব্যর্থ হৃদয় দুটি, 'মানলে অনেক কিছুই আছে আর না মানো যদি তো কিছুই নেই' এই বলতে বলতেও সেই 'অনেক কিছু' থাকাটাকে মনে মনে হিসাব কষতে থাকে।

॥ চব্বিশ ॥

দংশন

বাড়িতে ফিরে রাজু কান্নায় ভেঙে পড়ে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সে কাঁদতে থাকে।

'কি হোল তোর আবার ?··· বলবি তো কিছু। কেউ কি কিছু বলেছে তোকে— কি কাণ্ড দেখ দিকি। এ মেয়েটা হঠাৎ কান্না শুরু করলে কেন ?'

'কেউ হয়তো কিছু বলেছে। মেয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী তো গাঁয়ে কম নয় !' কোদরের স্ত্রী কেশর বলে।

'কি সব কথা বলছিস ? কিসের শুভাকাঙ্ক্ষী ?'

'কেন ? জামাই রয়েছে তো এখানে।'

'কার জামাই ?'

'কার আবার, আপনার—মা-মেয়ে দুজনেরই ওই একটাই তো, আবার কে ?'

বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, 'মুখ সামলে কথা বল নইলে... মা-মেয়ের দুজনেরই একই জামাই নিজের বাপের জন্মে কোথাও দেখেছিস কখনো ?'

'বাপের জন্মে তো কখনো দেখি নি— কিন্তু আপনাদের বংশে এসে দেখছি তো রয়েছে। মেয়ের যে বর ছিল তাকেই মেয়ের জামাই করালেন। এখন মাথা কুটুন গে সকলে মিলে। এখনই তো ওকে ভলী ভাইঝি ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাই জামাইয়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে থাকবে হয়তো আর জামাইও বোধ হয় ভালো-মন্দ দুটো কথা বলেছে কিছু।'

'এইজন্যেই তুই মা-মেয়ের এক জামাই বলছিস.... বাপরে বাপ, দেখালি বটে। ছেলের বউ পেছনে লাগবে না তো আর কে

লাগবে!' আর কোদরকে আসতে দেখে আবার বলে, 'ছেলের মুরদ নেই বলেই না বউয়ের কাছে আজ শুনতে হচ্ছে!' বলতে বলতে বুড়ী কাঁদতে শুরু করে।

কোদরের কাছে এই-সব ঝামেলা নতুন কিছু নয়, নিত্য দেখে দেখে তার সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এই পালা-পার্বণের দিনেও এ-সব দেখে সে আর না বলে থাকতে পারে না, 'একি হৈ-হল্লা শুরু করেছ সব···?'

'নাও তুমিও এই মেয়েদের ব্যাপারে নেমে যাও, একটা শাড়ী বার করে দেব নাকি?' বলে কেশর নিজের মনেই বলে ওঠে, 'কে জানে মিন্‌সে আসলে কোন্ জাতের?'

'আজ চুপ করে থাক্ বলছি কিন্তু।' কোদর গর্জে ওঠে।

কিন্তু কেশর তার স্বামীকে মোটেই ভয়ডর কিছুই করে না, 'এসো-না দেখি একবার ঘরেতে।' ভাঁড়ার থেকে জল নিয়ে রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে কেশর বলে।

আশপাশের প্রতিবেশীরা নতুন বছরের শুভ-কামনা জানাতে কোদরের বাড়িতে একে একে ক্রমশ জমা হচ্ছে আর তার রাগও ধীরে ধীরে চড়তে থাকে। গলার স্বরও এই রকম উঁচুতে ওঠে, 'এভাবে ফের কথা বলিস নি বলে দিচ্ছি!'

কেশরও আর চুপ করে থাকতে পারে না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদরের সামনে দাঁড়ায়। কোদরকে বলে, 'তা মা-বোনের যদি মাথায় এতটুকু বুদ্ধি থাকত তা হলে এই পার্বণের দিনে ঘরের মধ্যে কাঁদতে বসত না। তা ও মাগীদের আর ক্ষতিটা কি? নতুন বছরের দিন কিছু অশুভ হলে তো আমার বাড়িতেই হবে।'

'তোর বাড়ি। তোর বাপের কাছ থেকে এনেছিস বোধ হয়!'

'তুই তোর বোনের যেমন তত্ত্বতাবাস করেছিস আমার বাবা-মাও তেমনি আমাকে···'

'বেশি বাড়াবাড়ি করিস নি। এটা দেখেছিস তো। মুখে পোড়া

কাঠ গুঁজে দেব, বুঝলি।' কোদর দরজার পাশের উনুনটা দেখিয়ে বলে।

'পোড়া কাঠ বাড়ির অন্য উনুনেও আছে। চল-না দেখি ক গুঁজবি?' কেশর এত রেগে যায় যে উনুনের সামনে গিয়ে কোদরের মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে— 'নে গোঁজ দেখি, কে কার মুখে পোড়া কাঠ দিতে পারে' বলার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু তা সে বলে না। পরক্ষণেই বলে, 'তোর তো লজ্জাশরম বলে কিছু নেই কিন্তু আমার লজ্জা হয়।'

'তুই যে কত লজ্জাবতী তা আমার জানা আছে। যাক্ আজ আমি কিছু বলতে চাই না।'

কোদর তার চিরাচরিত এই একই শব্দ বলে ঝগড়া মিটিয়ে নেয়। তারপর মা আর বোনের দিকে ফেরে। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বুড়িকে বলে, 'তোর ওপর দুঃখের পাহাড় না-হয় ভেঙে পড়েছে বুঝলাম কিন্তু আজ যে নতুন বছর সেটা তো একটু খেয়াল রাখ। কাঁদবার জন্যে অনেক দিন পড়ে আছে সামনে।'

'তোর মতন ছেলে হয়েছে যখন তখন তো কাঁদবার দিন পড়ে থাকবেই।' বুড়ী ছেলের দিকে হাত নেড়ে বলে ওঠে, 'ডুবে মরগে যা হতভাগা অপদার্থ। তোর বদলে যদি আমার পেটে পাথরও জন্মাত একটা তা হলে লোকেদের কাপড়-কাচার উপকারে আসত।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রাজু কেঁদে যায়। সে উঠে বাইরে চলে যায়, ওদিকে বুড়ী আর ছেলেতে ধুন্ধুমার লেগে যায়। মাঝে মধ্যে কেশর এসে তাতে ইন্ধন জুগিয়ে যায় একটু করে।

এই সময়ে শংকরদা কাসম ঘাঁচী প্রভৃতিরা রোয়াকে এসে বসে। কোদর হুঁকো সাজতে লেগে যায়। বুড়ী রাজুকে নিয়ে পেছনের উঠোনে গিয়ে বসে আর কেশর বাড়ি আর উঠোনের মধ্যে দূতের কাজ করতে থাকে।

শুরুতেই সে বুড়ীকে সাবধান করে দিয়ে যায়, 'দেখুন আমি আপনাকে ফের বলে দিচ্ছি আপনার মেয়ে অভাবের সংসার বলে

যে এখান থেকে কিছু দিয়ে-থুয়ে তা ভরবার চেষ্টা করবেন সেটি হচ্ছে না। মেয়েকে যদি সুখে-শান্তিতে রাখতে চান তো আমি যা বলছি তাই করুন বরঞ্চ। রাজু বোনের কপালের লিখনই হচ্ছে নানার ঘর করা। রাজুর নাম করে তার যে গায়ে হলুদ হয়েছিল সে ব্যবস্থা এখন পুরো করুন। পঞ্চায়েতের বিচারে হয়তো কিছু জরিমানা হতে পারে সেজন্যে ভাবনার কিছু নেই। জরিমানার টাকা জমা করবে তারাই। লক্ষ্মী স্বয়ং নিজে এসে কপালে ফোঁটা দিতে আসছে, এখন যদি তুমি কপাল ধুতে চলে যাও তো তার ফল তুমিই বুঝবে, বোন।' শেষ কথাটা সে রাজুকে উপলক্ষ করে বলে।

'ফোঁটা তো দিতে এসেছে, কিন্তু কিসের ফোঁটা তা জানো কি বউদি?' রাজু স্বাভাবিক রূপ ধরে। তা ছাড়া আর উপায় কী।

'কিসের আবার? সিঁদুরের বোন।'

'ভূষো কালির, আর তা পোড়া চাটুর তলার ভূষোকালি।' রাজু কটু স্বরে ঝংকার দিয়ে বলে।

'আগে পেছনের কথা চিন্তা করলে তুমিও বুঝতে পারবে! আমি ঠিক কথাই বলছি। তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি রাজী হয়েছি। তোমার মা তো তোমাকে ভূট্টা থেকে ঘাসের দানাতে এনে নামিয়েছে, আমি সেই ঘাসের দানা থেকে গমেতে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি। তুমি রাজী হয়ে যাও, লক্ষ্মী বোন আমার।'

'সে তো ঠিকই বলছ, মেয়ে!' মা সায় দেয় এবার বউয়ের কথায়।

রাজু এদের কী করেই বা বোঝাবে।··· তবুও বলে, 'আর সতীনের যে দুঃখ ভোগ করতে হবে তার কী?'

'সতীন যদি বেশি জ্বালাতন করে তো নানিয়া তাকে বাপের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দেবে।'

'বা! বললেই হল? এই আট বছরে সে কখনো বাপের বাড়ি যায় নি। ও তো আর জন্তু-জানোয়ার নয় যে গাড়িতে বসিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে?'

'তা সে যদি না যায় তো তোমার আর কীই-বা তাতে ক্ষতি হবে? পড়ে থাকবে একধারে ঘরের কোণে। ঐ খোঁড়াকে তো…'

রাজু সামান্য হাসে।

বউদি কিছুটা আশান্বিত হয়ে ওঠে, 'যারা এখন এসেছে আমি তাদের জন্য খাবার করতে চললুম, ততক্ষণে তোমরা মা-মেয়েতে একটু ভেবে দেখো।'

রাজু সচকিত হয়ে ওঠে। খাবার করা মানে মিষ্টি তৈরি করতে যাওয়া। আর মিষ্টি তৈরি করে খাওয়ানো মানেই নানার সংসার করতে যাবার কথাটাতে স্বীকৃতি জানানো। আর এই লোকেদের তো খেতে পেলেই হল। ও ঘাবড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে যাচ্ছ?'

'অতিথির খাবার ব্যবস্থা করতে!' কেশর মৃদু হেসে জবাব দেয়।

রাজুর মনে হল বউদি একলাই সব ঠিক করে ফেলবে! তখন তাতে মা-ভাইয়ের কোনো কথাই খাটবে না; আর তাকে ধরে-বেঁধে বিদায় করবে। ও ব্যঙ্গ করে ওঠে, 'যাও দেখি, খুব হয়েছে রাঁধুনীগিরি! তুমি আমাকে বিক্রি করতে মনস্থ করেছ?'

'আমার কি দায় পড়েছে যে মেয়ে বিক্রি করতে যাব? বেচলেই তোমার ভাইয়ের সংসারে লাভটা কী হবে শুনি…'

'তার থেকে এই কাজ করো না বউদি, ঐ কাসম ঘাঁচীর ঘরেই আমাকে বিদেয় করে দাও, জীবনের শোধ সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে!' বলে রাজু রাগ দেখিয়ে মুখে শব্দ করে 'হুঁ'।

রাজুর মুখের শব্দের চেয়ে তার চোখের চাপা হাসির আভাস কোদরকে বেশি ভয় পাইয়ে দেয়। সে হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'এ কিরকম কথা বলছিস রাজু বোন!'

'তবে শুনে নাও সকলে, আমার ভাইয়ের বাড়ির সর্বনাশ হয় হোক কিংবা মাকেও যদি না খাইয়ে আজই মেরে ফেলতে চাও তো ফেলো কিন্তু আমি তোমাদের কথা শোনবার পাত্রী নই।'

'হায়-হায় রাজু বোন! তোমার ভরসায় আমি কথা দিয়ে দিয়েছি।'

'সে তুমি বুঝবে।' বলে রাজু উঠে দাঁড়ায়। মাকে উদ্দেশ করে ব'লে বউদিকে সাবধান করে দেয়, 'আর তোকেও বলে দিচ্ছি মা, আমার সামনে আর কখনো এমন করে বললে আর কিছু বলব না, কিন্তু তোর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব।'

'একটু দাঁড়িয়ে, কথা তো শুনে যাও বোন, এমনভাবে চললে কোথায়?'

'ঘরে যাচ্ছি আমি।'

'হায়-হায়! তা হলে আমি এই-সব গণ্যমান্য লোকদের কী জবাব দেব এখন?'

'আমি নিজে জবাব দিয়ে দিচ্ছি' বলে রাজু এগিয়ে যায়। পেছনে চাপা গলায় বউদি তাকে ডাকতে থাকে, 'ও রাজু বোন, শোনো একবার এদিকে, ফিরে এসো…'

রাজু বাইরের ঘরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শংকরদাকে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে আজ এসেছেন কেন শংকর কাকা?'

শংকরদা বেচারা হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে যায়, 'আমরা তো বোন—'

রাজুর এই আচমকা প্রশ্নের চেয়ে তার ঋজু উদ্ধত চেহারা শংকর-দাকে বেশি ঘাবড়ে দেয়, 'আমরা তো সকলে এমনিই এই নতুন বছরের জন্যে দেখা করতে এসেছি।'

কিন্তু কাসম সাহস করে উত্তর দেয়, 'তুই তো সবই জানিস মা, তবু কেন আমাদের জিজ্ঞেস করছিস? আমরা তোর মঙ্গলের জন্যেই—'

'আপনার কথা আমি ঠিক জানি না কিন্তু—' রাজু বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'শংকর কাকা তো একবার আমার মঙ্গলের ব্যাপারে যুক্ত ছিল তিনি যে আজ আবার…' রাজু গভীর শ্বাস নেয়। শংকরদাকে এবার সে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'সত্যি করে বলুন তো শংকর কাকা,

মোড়লের সঙ্গে, সে সময়ের ঝগড়া মেটানোর জন্যে আসেন নি তো আজ?' একটু থেকে আবার বলে, 'আমি তো আপনার সামনে নেহাতই ছেলেমানুষ তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি—সুবিধেমতো একবার এই ডালে আবার পরক্ষণের অন্য ডালে বদল করা মানুষের শোভা পায় না !.... আর মোড়লের সাথে ঝগড়া তো...'

'আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কোথায় বোন! আমি ভেবেছিলাম এতে তুই সুখী হবি আর নানিয়ারও সুবিধে হবে।'

'তা করুন-না তার সুবিধে! রাজু ছাড়া কি আর আমাদের জাতের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো মেয়ে নেই? আর এখন তো পেথা মোড়লের মেয়ে সবাইকে ডিঙিয়ে স্বামীকে ছেড়ে অন্যের সংসারে ওঠার ব্যাপারে নালিশের পথও রাখে নি আর। আমি তাতে দোষের কিছু ধরতে চাই না কিন্তু এটুকু তো ভেবে দেখবেন, যে আমাদের—' খেয়াল হতেই রাজু শেষ শব্দটা বদলে দেয়, 'আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে তার বাড়িতেই—' এরপরে নিজের মনেই সে বলতে থাকে, 'এ জীবনে সেই কামড়ের জ্বালা কোনোদিন কি ভুলতে পারব?' শংকরদা কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে উল্টো-পাল্টা বলতে শুরু করে—

'কিন্তু তোর তো— তোর যখন বিয়ে হয়েছিল তখনই পঞ্চায়েত ঠিক করেছিল যে তুই যদি সংসার করে বসতে পারিস তো ভালোই নইলে পঞ্চায়েত অন্য ঘর আর বর সমাজ দেখেই রেখেছে, তাতে তোর—'

রাজু কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'যেখানেই যাব সেই দাসীবৃত্তি তো করতেই হবে শংকর কাকা। আর পেটটা গম দিয়ে যেমন ভরানো যায় তেমনি ঘাসের দানা দিয়ে তো যায়, তাই আমার চিন্তা আপনাকে মোটেও করতে হবে না। আমার মায়ের সঙ্গে যদি নতুন বছরের জন্যে দেখা করতে এসে থাকেন তো দেখা করে ফিরে যান।' শেষ কথা বলতে বলতে রাজু পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

কাসম ঘাঁচী বলে ওঠে, 'কিন্তু একবার শোন্ তো কথাটা বেটি

ভালো করে। এ তো দেখছি নানিয়ার দু-দুবার নাক কাটা যাওয়ার মতো অবস্থা হল, আর আমরাই-বা তাকে কী জবাব দেব—'

'বলে দেবেন', রাজু ফিরে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বলবেন যে রাজু বলেছে আট বছর আগে দেওয়া গায়ের হলুদ যদি আজও না উঠে থাকে তা হলে গায়ে ঝামা ঘষলেও ঠিক উঠে যাবে। আর এও বলবেন যে নাক তো কেউ কাল দেওয়ালীর দিনই ভেঙে দিয়েছে। এটুকুই বলবেন গিয়ে, যান।'

বাড়ির ভেতরের দিকে ফিরে বউদিকেও শুনিয়ে দেয়, 'তুমি যদি আজকের রাতটা এখানে কাটাতে দাও তো ভালোই নইলে গাঁয়ে অন্য কারোর বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকব।'

'তা পড়ে থাকো-না এখানে বোন। সারা জীবন পড়ে থাকো। তাতে আমার বাপের আর কী লোকসান হবে?' ব'লে বউ রাগ করে রান্নাঘরে গিয়ে বসে।

রাজু তার মাকেও বেশ মেজাজ দেখিয়েই শুনিয়ে দেয়, 'এককে ভেঙে দুটো জীবন তো করিয়েছ। তুমি ফের যদি তৃতীয় জীবনের কথা আবার—' আর কথাটা শেষ করতে পারে না।

মা বেচারি এর আর কি জবাব দেবে?

কান্নায় মেশানো কিন্তু রাগত স্বরে বলা রাজুর এই কথা শংকরদা আর কাসমও শোনে, তারা চলে যাবার জন্যে উঠে পড়ে।

শংকরদা নানাকে খবরটা দিতে আর যায় না। এখান থেকেই সোজা নিজের বাড়ি রওনা হয়। কাসমেরও যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু খবরটা দিতে কাউকে যেতে তো হবে? না হলে নানা তো, 'এই খবর আসবে.... এই আসবে' করে সারা রাত অপেক্ষায় জেগে কাটাবে।

কিন্তু নানার চিন্তার থেকেও বেশি সে নিজের কথাই ভাবছিল— অনুতাপ হচ্ছিল তার, 'মেয়েটা আমাদের জুতো মারলে, আমরা তারই যোগ্য। এই সেদিন আমরা কালুর পক্ষে ছিলাম আর আজ আমরাই নানিয়ার দলেতে... মোড়ল আর তার বুড়ী মা একটু

মিনতি করতেই ভালো-মন্দ ভূত-ভবিষ্যৎ সব ভুলে বসলাম, কিন্তু মেয়েটা ঠিকই বলেছে যে এটা মানুষের গৌরবের কথা নয়।'

মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে, অপেক্ষারত নানা, রণছোড় আর বুড়ীকে খবরটা দিতে গিয়ে বলে, 'কিছুই হল না ভাই। আপনাদের বরাতে এ মেয়ে নেই— তা সে মেয়ের ওজনের সমান টাকা ঢাললেও কিছু হবে না।'

'কী লজ্জার কথা কাসম ভাই! এ কী খবর আনলি তুই? সারা গাঁয়ে রটে গেছে কথাটা! হতচ্ছাড়ী আমার দ্বিতীয়বার নাক....'

কাসমের বুড়ীর 'হতচ্ছাড়ী' কথাটা খারাপ লাগে শুনতে, সে হেসে বলে, 'কিন্তু সেই 'হতচ্ছাড়ী' কী বলেছে জানেন আপনি?.... বলছিল যে নাক তো কাল দেওয়ালীর দিনই কেউ ভেঙে দিয়েছে, নানার নাকই এখন রইল কোথায় যে কাটা পড়বে?'

'শুনলে তো? এবার খুশি তো?' বলতে বলতে রণছোড় উঠে চলে যায়। আর নানা এবং বুড়ী এমন গালিগালাজ পাড়তে লাগল যেন কাটা ঘায়ে লঙ্কার গুড়ো দিয়েছে কেউ, বিশেষ করে কালুর তো···

কাসম এই-সব দেখে নিজের মনে ভাবতে থাকে। মাঝে মধ্যে তাদের দু-একটা ফোরন কেটে তাদের জ্বলুনি আরো বাড়িয়ে দেয়। আর তারপরেই এক সময়—

'আমার পেটের ছেলে যদি হোস তো দিব্যি কর আজ যে ঐ অপয়া কালিয়ার এই শত্রুতার প্রতিশোধ না তুলে তুই ছাড়বি না!'

অন্ধ রাগে নানিয়া তখন পশুরও অধম হয়ে গেছে, সে প্রতিজ্ঞা করে, 'ঐ কালিয়ার যদি জন্ম ভুলিয়ে না দিয়েছি তো জানবি যে আমি তোর পেটে পাথর জন্মেছিলুম একটা!'

বিস্মিত হতবাক্ কাসম তাদের ওপর রেগে ওঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'ধ্যেৎ তোর ছোটোলোকের বংশ সব।' এই বলে সে বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসে, 'এই অভদ্র ছোটোলোকের বাড়িতে অমন দেবীর মতো মেয়ে কখনো কি শান্তি পেত?'

তার কানের মধ্যে দিয়ে যেন বন্দুকের গুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে এমনি বিমূঢ়ভাবে সে বাড়ির পথে ফিরতে ফিরতে নিজের মনে বিড় বিড় করে বকে, 'দূর দূর, এই লোকেদের সঙ্গে থাকতে হলে তো— বেচারি মেয়েটা যা বলছিল ঠিক তাই হত ! ওর তৃতীয় জীবনটাও নষ্ট হয়ে যেত। দূর দূর !.... এমন উলটো কামড় দেওয়ার আর ইতরোমি করা মানুষ-জন্মের ঘেন্নার বিষয় !'

॥ পঁচিশ ॥

দুঃখ কোথায় ?

জেদের বশে নানা আটদিনের মধ্যেই অন্য মেয়ে বিয়ে করে দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে নিয়ে আসে। বিশ্বসংসারে সকলের ভাবনা-চিন্তা দূর করে।

কালু এতে খুশিই হয় খুব। খুশি হবার অনেক কারণ ছিল; রাজুকে নিয়ে বুকের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা ছিল সেটা দূর হোল— কেউ যে ফুঁসলে তাকে বার করে আনবে সে ভয়ও ভেঙে গেল; দ্বিতীয়ত, তার নিজের কথাই খেটেছে শেষ পর্যন্ত। তৃতীয়ত, দুটো বউয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়ে নানা একদিন না একদিন, কালুর আন্দাজমতো পনেরো দিনের মধ্যেই ঠেলা বুঝে যাবে। নানিয়ার সঙ্গে থাকলে বুড়ী মালীর অবস্থা ঠিক ধোপার কুকুরের মতোই হয়ে দাঁড়াত....

এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে কালুর দুঃখও হতে থাকে। 'বেচারী বুড়ীকে মরবার সময় দুঃখের মধ্যে কাটাতে হবে। নাথা তো আগেই আলাদা হয়ে গেছে আর রণছোড়ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেছে। নানিয়ার খোঁড়া বউয়ের সঙ্গে বুড়ীর শত্রুতার সম্পর্ক, আর নতুন যে এসেছে সে সুখ ভোগ করার জন্যেই এসেছে, বুড়ীর মেজাজ সহ্য করতে আসে নি!'

শেষ পর্যন্ত কালু ভাবে যে, 'ওদের এমন হওয়াই উচিত, বুড়ী তো নিজেই খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছে' এইভাবে সে মনকে মানিয়ে নেয়। তা ছাড়া রাজুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ায় কালুর হৃদয় থেকে যেন অনেক মন বোঝা নেমে যায়। এখন শুধু একটাই কাজ করার রয়েছে। রাজুকে যথাসম্ভব সাহায্য করে তাকে সুখী দেখা।

তার নিজের শ্বশুরবাড়ি— রাজুর ঘরসংসার যদি কাছেপিঠে হত তা হলে কালু দু-বাড়ির কাজ একাই সামলে নিত। পাঁচ ক্রোশ দূরে

শ্বশুরবাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার জন্যে, না, সে নিজের ক্ষেতে শীতের চাষবাস আর ধানের গোলার কাজ ইত্যাদি ব্যস্তভাবে শেষ করতে চাইছিল? একদিন নিজের স্ত্রীকে সে বললে, 'এই চারদিনেতে দুটো মাঠেতে এক-একবার, লাঙল চালানোর পর একবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। তুই বলদের জন্য এক বোঝা করে ঘাস বেশি নিয়ে আয় না!' কালু দুধেতে আটা গরম করতে বলে।

ভলী ঘিয়ের কড়া জাল দিচ্ছিল, সে চটে যায়, 'কী করে যে বল এ কথা বুঝতে পারি না। বাড়িতে এত কাজ পড়ে রয়েছে আর এখন সব ফেলে চললে তুমি।'

'আমাদের সুবিধে রয়েছে বলেই না যাচ্ছি। মিহিদানার মতো মিহি করে ক্ষেত চষে রেখেছি। আমাদের ক্ষেতের মতো ভালো করে তৈরি করা জমি গ্রামের কারু আছে বলতে পারিস?' এই বলে কালু চোখ নাচিয়ে উনুনের থেকে কড়া নামিয়ে বলে, 'নে, বাটি নিয়ে আয়।'

বাটি নিয়ে এসে ভলী বলে, 'রোজগারের খেয়াল থাকলে ঘরেতেই অনেক কাজ করার রয়েছে...মুদীর ঘোড়ার ডাক তো উঠোনে লেগেই আছে, আর—'

'এখন উঠোনে এসে ডাক পড়লে আর কী করা যাবে— মাঠে তিল তো এখন কাঁচা রয়েছে। কেটে ঘরে তুলতে পারলে তবেই না কিছু দিতে পারা যাবে। নে, ঘি নিয়ে আয় দেখি— আরে আর-একটু পড়তে দে! অন্তত গলাটা ভেজে তেমন তো একটু ঢাল।' কালু হেসে বলে।

'আর বোন যে আধমনী ঘিয়ের কেনেস্তারা রেখে গেছে তার কী হবে? সেটা মোষের গোবর দিয়ে ভরবে?' ভলী রেগে উত্তর দেয়।

'সে ভরে নেবে তখন। না ভরলে নাহয় কাঁদবে বসে। ওর বাবা মোষ রেখে যায় নি যে সবটা দিতে হবে।'

'ওর বাবার নয় কেন? টাকা তো তোমার বাবা ঘরেতে পুঁতে রেখেছিল, তাই বোধ হয় বার করে খরচা করছিলে।'

কালুর মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কী আর করবে? ঘুরতে ফিরতে কত আর ঝগড়া করতে পারে, উল্টে বরং সে হাসে, 'শেঠ জানে যে জাব খেতে না পেলে মোষ দুধ দেয় না।'

'তা হলে তো এ-সব মোষকে খাওয়াতে হয়!'

'আরে পাগলি, আমিও মোষেরই মতন। তুই জানিস না বুঝি? আমাদের জাতে সম্বন্ধ করার সময় মেয়েপক্ষের লোকেরা উঠানে গোরু-বলদ আছে আগে তাই দেখে— আমাদের সম্পদ তো ওটাই। আর বেনিয়ার সম্পদ হলাম আমি। ওদের খদ্দের দেখে তবে মেয়ে জোটে বুঝলি? আমার বাবা বলত যে আমাদের ভাগ্যে তো ঘি তৈরি হলে জোটে চাঁচি, আর গম বুনলে জোটে ঘাসের দানা।'

কালু কথা বলতে বলতেই খেয়ে নেয় কিন্তু ভলী তার কথা শুনতে দাঁড়ায় না। মোষের জাব তৈরি করতে থাকে।

সূর্যের আলো তখনো পুরোপুরি ফুটে ওঠে নি। গাঁয়ের পাড়া-পড়শীর লোকেরা তখনো সব ঘুম থেকে উঠছিল। কেবল অসুখের রুগী বুড়ো পরমা আটদিন থেকে জেগে বসে ছিল। কাশিতে তাকে পাশ ফিরতে পর্যন্ত দিচ্ছিল না। কালু লাঙল নিয়ে যখন বেরোয় তখন রামা দরজা খুলছিল।

'আরে কালু ভাই' রামা হাই তুলতে তুলতে বলে, 'তুই কি ঘুমকেও বশ করে বেঁধে ফেলছিস নাকি?'

'কেন?' কালু একটু থামে।

'কেন আবার, আমরা চার-পাঁচ জন লোক তবু গোলায় এখনো ধান পড়ে আছে আর ক্ষেতের অনেক কাজ সারতে বাকী। এখনো একবার লাঙল দেওয়া হল না—'

কালু রোজ যা জবাব দিয়ে থাকে তাই বলে—

'তার তো ভাই লোকজন রয়েছে আর ক্ষেতের কাজকর্ম যত লোকজন হবে তত্ত সুবিধে, আমার মতন একলা-দোকলা লোক

তাড়াতাড়ি কাজ না করলে এ জীবনের খেলাই যে সাঙ্গ হয়ে যাবে।' এই বলে কালু মহল্লার দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

প্রত্যেক ক্ষেতের ভুট্টা গাঁট বেঁধে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল। ক্ষেতের কিনারা সব কাটা হয়ে গিয়েছে। জমিতে একবার করে লাঙলও পড়েছে। কালুর ক্ষেতের ঢেলাগুলো মই দেওয়ায় পর ময়দার মতো মিহি হয়ে গিয়েছিল। কেবল গম বুনতেই যা বাকী এখন, কিন্তু বীজ বোনার সময় আসতে তখনো কিছু দেরি— ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করলে তবে।

কালু শীতল চাঁদনী রাতে কাজ করে গোলায় পড়ে থাকা খড়ের আঁটি থেকে ধান মড়াই করিয়ে সেগুলো ঘরে তুলে ফেলে এবং ভলীর রাগ করা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

সেখানে কাজ করতে কালু নিজের বাড়ির থেকে অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করে। বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না। ঘাসের দানার রুটি তাও মাঠা তুলে নেওয়া দুধ ও পেঁয়াজ দিয়ে খাওয়া জোটে কিন্তু তবুও সে এক অনাস্বাদিত স্বাদ অনুভব করে। কখনো কখনো আপন মনেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা রুটি তৈরি করতে করতে রাজুর মিষ্টি হাতের মধুরতাটুকু রুটিতে লেগে যায় কি ?···আর খাচ্ছিও কত বেশি আগের থেকে! যেন সারাজীবনের ক্ষিদে একসাথে জমা হয়েছে এসে !'

এই সব-কিছুর মূল কারণ যে রাজু সেটা কালু বুঝতে পারে। কিন্তু তার 'প্রিয়তমা' রাজুর ঘর-সংসারের কথা চিন্তা করতে বসলে তার মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। কখনো কখনো এমনও মনে হয় যে ন্যানিয়ার সাথে রাজুর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করে সে মহাপাপ করেছে। আবার কখনো এ আশঙ্কাও হয়েছে, কবে স্বামী মারা যাবে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার সুবিধে হবে, রাজু তার পথ চেয়ে বসে নেই তো ?'

একদিন কালু গাড়িতে খড় বোঝাই করছিল, রাজু খড়ের আঁটি গাড়িতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করার সময় কালু তার মনের কথাটা

জানবার চেষ্টা করে, 'আমার কাকাকে কিছু ওষুধপত্র খাওয়াচ্ছ কি ?···দিন দিন ক্রমশ যেন রোগা হয়ে যাচ্ছেন।'

'আর কী ওষুধ খাওয়াব ? আগুনের সেঁক পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তুমি ওর শরীরে লক্ষ্য কর নি দাগ ? আগুনের সেঁক দেওয়ার সময় কেউ পাশের দিকে ছেঁকা দিয়েছে কেউ কেউ তো পাঁজরের সঙ্গে চামড়াই পুড়িয়ে ছেড়েছে। ওঝারাও ঝাড়ফুঁক কিছু কম করে নি। শ্বশুরবাড়িতে আসবার সময় গাঁয়ের লোকেদের আর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আশীর্বাদীতে এক দু পয়সা করে মোট প্রায় তিন টাকা জমেছিল। তার সমস্তই ওঝার ঝাড়ফুঁকেতেই উড়ে গেছে। কানের দুল, বালা, হাতের আংটি সব ওতেই গেছে। কিন্তু তবু কিছুতেই কিছু—'

'কিন্তু আসল রোগ না জেনে আবোল তাবোল চিকিৎসা করালে কী করে আর ঠিক হবে স্বাস্থ্য ? আমার তো এটাকে শরীরের ভেতরের কোনো ব্যাধি বলে মনে হয়।'

'শরীরের ভেতরের ব্যাধি হলেই বা কী করতে পারি। আমি তো আর বৈদ্য নই— আর সে দিক দিয়ে ধরলে গাছ-গাছড়া-শেকড় ইত্যাদি কম করেও সের পাঁচেক তো পেটে গেছে বটেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে !'

রাজুর মলিন বিমর্ষ মুখ দেখে কালু মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়, 'না না ? সে ধরনের মেয়েই ও নয়, এই স্বামী আর সংসার ছেড়ে যাবার পাত্রী এ নয়, বেচারী তো নিজের তূণের সব তীর ছুঁড়ে চেষ্টা করে দেখেছে, আর কীই-বা করতে পারে ! ওঝারা ছাগল মুরগী চেয়ে নিয়ে যায় তো, সেঁক দেবার লোকেরা আফিম-মিষ্টি খেয়ে যাবে আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যাবে দেহ। জড়িবুটি শেকড় যারা দেয় তাদের সিকি আধুলি দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাদের বাড়ি খালি চক্কর দিতে থাকো কিংবা···'

গাড়ি ভর্তি হয়ে যাবার পর বিড়িতে টান দিয়ে কালু বলে, 'তুই যদি বলিস তো রাজু আমি তা হলে ঐ ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের

ওষুধ ব্যবস্থা করতে পারি। ঐ সাধুর সঙ্গে আমার…'

'আহা…হা, যদি সেরে যায় তো আমি আর কিছুই চাই না। আমার বাপের বাড়িতে এই নাক-ছাবিটা কেবল বেঁচে আছে এটাকেও বেচে দেব দরকার হলে!' রাজু খুশি হয়ে ওঠে। তার মুখে এক করুণ অসহায় ছাপ ফুটে ওঠে।

কালুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যুবতী রাজুর গায়ে গয়না বলতে আঙুলে হাল্কা ধরনের রুপোর আংটি আর নাকে চার আনা মত সোনার এক নাকছাবি। এ ছাড়া হাতে সুতোর মতো পাতলা রুপোর চুড়ি আর তোলা সাতেকের কঙ্কণ। তার সরু গলায় মনকে প্রবোধ দেওয়ার মতো আনা চারেকের রুপোর হার—কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনে বলে—'কাঁটাওলা ক্যাকটাস গাছে কখনো ডালপালা গজানো সম্ভব যদি হয় তো তবেই রাজুর দেহে কিছু গহনা উঠতে পারে!' সে তাকে বলে, 'নাকছাবি না-হয় হবে কিন্তু—'

কিন্তু রাজু সাধুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে ভীষণ পীড়াপীড়ি শুরু করে, 'এ কাজটা পড়ে থাকে তো থাক্, আমি করে নেব কিন্তু তুমি,' রাজু যেন আকুতিমিনতি করতে থাকে, 'এই কাজটা শুধু একবার করো, সাধুকে একবার ডেকে আনো।'

কালুর বলতে ইচ্ছে করছিল আর শেষে বলেও ফেলে সে কথা, 'তুই যদি রাগ না করিস তো একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোকে রাজু!'

রাজু বুঝতে পারে কী কথা আর বুঝতে পারে বলেই কী খুশি দেখায় তাকে। খুশি হবে নাই-বা কেন! তার জীবনে এধরনের প্রশ্ন করার তো আর কেউ ছিল না!

কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে যেন বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। হাসবার চেষ্টা করতে করতে সে জিজ্ঞেস করে, 'আমি রাগ করতে পারি তোমার ওপরে তাও তুমি বিশ্বাস কর?'

কালু তার নিজের মুখের হতাশার ভাবটা, 'রাগ হয়তো নয়

তবু—' এই ধরনের এলোমেলো কথা বলে হেসে লুকোবার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি সত্যি সত্যিই দয়ালজীকে সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলতে চাস্, রাজু?'

রাজুর সারা মুখে দুঃখের ঘন মেঘ এসে জমা হয়। মলিন হেসে বলে, 'তুমিও আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছ?…দুনিয়ার সবাই ভাবে যে, লোকটা মরুক সেই পথ চেয়েই রাজু বসে আছে, কিন্তু—' সে কালুর মুখের উপর তার গৌরবোজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটি মেলে ধরে বলে, 'কিন্তু কেন? কোন্ সুখের আশায় আমি তা চাইতে যাব? তোমরা সকলে ভাব যে রাজু খুবই দুঃখে আছে—' তার চেহারায় যেন একটা উদ্ধত ভাব ফুটে ওঠে। বলে, 'কিসের দুঃখ আমার? মা-বাবার মতো জা-ভাসুর রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আমার ভালোভাসার কাঙাল আর স্বামীও,' সে হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'তোমার মতো সুপুরুষ হলে হয়তো দিনে দশ-বিশটা গালিগালাজ করত কিন্তু এ তো আমার একান্ত অনুগত, প্রতিপদে আমাকে খুশি করার সুযোগ খোঁজে'…তার অলস স্বপ্নমাখা চোখ দুটি দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের মনে সে বলে, 'কিসের দুঃখ আমার?' এ সময়ে রাজুর চেহারা দেখে মনে হয় ও যেন দুঃখের দেবতাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

কালু চেয়ে চেয়ে দেখতেই থাকে রাজুকে…প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে বলে, 'তোর মতো বউ রাজু আমাদের সমাজে খুবই কম আছে… আমি তো আর একটাও দেখতে পাই না।'

'যাকগে সে কথা— তুমি ঐ সাধুকে কবে ডেকে আনবে?'

'তুই বলিস তো আজই আনতে পারি।'

'আমি তো এখনই আনার কথা বলি, দরকার হলে আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যেতে পারি।' তারপরে হাসতে হাসতে বলে, 'গরজ বড়ো বালাই, তখন কি আর-কোনো বুদ্ধির কথা মনে থাকে!'

কেমন জানি না কালুর এখন দুঃখ হতে থাকে। মনে হতে থাকে

সে যেন রাজুর থেকে ক্রমশ অনেক যোজন দূরে সরে যাচ্ছে··· অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে সে চিন্তা থাকে।

পরের দিন সে সাধুকে ডেকে আনার জন্য রওনা হয়, তাকে যেতেই হয় বাধ্য হয়ে।

সারা রাস্তা সে নিজেকে নিজে বোঝাতে থাকে, 'রাজুর দুঃখ কোথায়? একমাত্র দুঃখ ওর স্বামীর অসুস্থতা, সে যদি সেরে যায় তো—তা হলে ঠিকই ওর মতো, সুখী আর কেউই নয়। বাড়িতে বিন্দুমাত্র ঝগড়াঝাঁটি নেই···কথায় বলে যে যেখানে মনের মিল, সুখশান্তি সেখানেই।'....আর রাজুর বলা কথাই সে গুনগুন করতে থাকে, 'ঠিকই তো! মা-বাবার মতো ভাসুর-জা, নিজের পেটের ছেলের মতো ভাইপো-ভাইজি আর অনুগত স্বামী—উঠতে বসতে স্ত্রীর কথা চিন্তা করে। দয়ালজীরও এমন স্ত্রী! অনেক ভাগ্যবানের সংসারে এমন সুখ দেখা যায় না!' কালু এই সুখী পরিবারের প্রতি ঈর্ষায় গভীর নিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে বলে, 'কে সুখী তা হলে? অনেক টাকাপয়সা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে কেবল ঝগড়া-কলহ করতে থাকে সে সুখী, নাকি খাওয়া-পরার কষ্ট থাকলেও একে অন্যের স্নেহছায়ায় দিন কাটায়, হাসি-মুখে কথাবার্তা বলে, সে লোক সুখী? মাথা নাড়তে নাড়তে সে আবার বিড়বিড় করতে থাকে, 'আমার বাবা ঠিকই বলত যে পেটের জ্বালা সহ্য করা যায় কিন্তু মনের জ্বালা সহ্য করে থাকা যায় না।'

কালু ভাবতে থাকে, 'রাজুর মতো স্ত্রী যার নেই, তার সংসারে কোনো সুখ নেই। খাওয়াপরায় সুখ নেই। আর তবুও যদি বলে দুঃখ কোথায় তবে জীবনে দুঃখটা আছেই বা কোন্‌খানে?—' এমনি ভাবেই দুঃখের উৎস খুঁজতে খুঁজতে সে একা নির্জন পথ অতিক্রম করতে থাকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

পৃথিবীর বোঝা-বহনকারী

সেবারে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল— মাঠে মাঠে গম ও ছোলা গাছের ছড়াছড়ি। লোকেরা ক্ষেত থেকে তিলের ফসল কাটাই করে ঝেড়েঝুড়ে নিয়েছে। হাতে সময় থাকাতে ফুরসৎ পেয়ে ঘাসখড় ইত্যাদি খড়ের মাচায় তুলে রাখছে।

খাজনা দেবার সময় এসে যায়···জমিদারের ঘোড়ার গলার আওয়াজ মোড়লের বাড়ির দরজায় শোনা যায়। জমিদারের খুড়তুতো ভাই দীপুভা সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসেছে, 'নাও ভাই, অতিথি ঘরে এসে পৌঁছেছে, এবার আমাদের আদর-আপ্যায়ন করো।'

জমিদারের বয়স প্রায় ষাট বছর। দোহারা চেহারা। গালভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। কানের দিকে পাকিয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে, কোঠরগত মুক্তোর মতো চোখ নাচাতে নাচাতে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে হেসে আলাপ করতে থাকে। নতুন যুবকদের সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করে, 'এ কে ভাই? আচ্ছা তুমি বালাভাইয়ের ছেলে কালিয়া? ওহো শংকর, এ বুঝি তোর ছেলে? নানিয়া, তুই তো দেখছি আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছিস। পঁচিশ বছরেই যদি দুটো বউ হয় তো পঞ্চাশ বছরে আমার মতো চারটে বউ হয়ে যাবে। আয়, আয়, আমরা দুজনেই সমদুখী। একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি। একটা বিয়েওলা এই কালুরা আর কি বুঝবে? যার বুকেতে রামের বাণ লেগেছে সেই জানে তার জ্বালা।' ঘোড়ার ঘাস আনার জন্যে দীপুভা চামারের বাড়ি যাচ্ছিল। তাকেও বলে, 'দেখিস দীপুভা, চামারকে মারধোর করিস নি, তা হলে সে তার রাগ বউয়ের ওপর ঝাড়বে আর বউ ছেলেমেয়ের মা হলে তাদের ওপর ঝাড়বে আর ছেলেমেয়ের মা না হলে— আচ্ছা

বল তো কালু, বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে বউ কার ওপর রাগ ঝাড়বে ?'

কালু কী জবাব দেবে ? জমিদারের আগ্রহ দেখানোয় বলতে হয় তাকে, 'স্বামীর ওপর, বাবুজী !'

'না···না ! তুই ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ ! কতগুলো ছেলেপিলে তোর ?...একটাও না ? শংকর ? তা হলে স্ত্রী বোধ হয় নেহাৎই ভালোমানুষ—'

রামা বলে ওঠে, 'নামে আর কাজে তো ভালোমানুষ কিন্তু বোল-চালে তো—' সে হাসতে থাকে।

'বুঝেছি। মোড়ল গিন্নী আমার অচেনা নয়। হ্যাঁ! শোন তা হলে আমি বলছি তোকে, বাঁজা বউ নিজের ওপরই রাগের ঝাল মেটায়। স্বামীর ওপর রাগ করে আলাদা খাটিয়া পেতে এই ভীষণ ঠাণ্ডায় একলা···'

'কিন্তু স্বামীও ঠাণ্ডাতে···'

লোকদের কালুর জবাব পছন্দ হয় না, 'আজ্ঞে যা বলেছেন' বলা উচিত। দু-একজনে নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করে, 'তলকচন্দ্র ব্যাপারী হলে শিখিয়ে দিত কিভাবে কথা বলতে হয় ?'

তুই এখনো একেবারে বাচ্চা কালু, পুরুষ বেচারা তো পরিশ্রম করে শুকিয়ে গেছে আর স্ত্রীরা তো···'

কালু আবার প্রতিবাদ করে, 'আমাদের বউয়েরাও খুব পরিশ্রম করে···'

জমিদার মশাই খুশি হয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ···ঠিক বলেছিস তুই। জানিস কী যে বউদের আর গাধাদের একই জাতের বলে ধরা হয়। পিঠে চার মনের বোঝা থাকলেও ভ্যাঁ—ভ্যাঁ করতে করতে খুশি হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকদেরও সেই একই অবস্থা। কি বল শংকর, ঠিক বলেছি কি না ?...'

জমিদারের কথায় সকলেই একবাক্যে সায় দেয়, 'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।'

এইভাবেই গল্পগুজব করে, আফিমের সরবৎ তৈরি করিয়ে গ্লাসের

পর গ্রাস খেয়ে অথবা নিজের হাতে গ্রামের লোকদের খাইয়ে, সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করে, আর নানারকম মিষ্টি খেয়ে যাবার দিন গ্রামের এই পঞ্চাশঘর বসতির সকলের খাজনা আদায় করে। কাউকে পাঁচ মন কাউকে দশ মন এইভাবে আড়াই শো মন ফসল পৌঁছে দিতে বলে, বাকী তিন-চারজনকে 'সামনের বছর দিয়ো! তোমাদের ছেলেমেয়েদের তো আর মরতে দিতে পারি না।' ইত্যাদি বলে খাতায় তাদের নামে কয়েকটা আঁক কেটে জমিদার বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করেন। তাঁর পক্ষীরাজের মতো ঘোড়ায় মখমলের সাজ চড়ানো হয়। জীন ও রেকাব শক্ত করে বেঁধে লাগাম লাগানো হয়।

গাঁয়ের লোকেরা ফাটক পর্যন্ত এগিয়ে এসে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অতিথিকে বিদায় দেবার মতো জমিদারকে বিদায় জানায়। সকলের অভিবাদন গ্রহণ করে জমিদার ঘোড়ার পেটে পায়ের গোড়ালির চাপ দিলেন। থালায় মুগের ডালের মতো নাচতে নাচতে চলে যাওয়া ঘোড়ার দিকে গাঁয়ের লোকেরা দেখতে থাকে 'ঐ যাচ্ছে... ঐ তোরণের কাছে পৌঁচেছে, ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে যাচ্ছে—ঐ...ঐ ব্যস্!'

কালু প্রভৃতিরা ফেরার পথে বলাবলি করে, 'ওঃ কী একখানা ঘোড়া! দেওয়ালের দিকে মুখ করে ছোটালে দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে।...'

জমিদারের পক্ষীরাজ-ঘোড়া যেতেই অন্য পাওনাদারদের লোক-লস্কর ও ঘোড়া এসে উপস্থিত হয়।

হিসেবনিকেশ শুরু হয়; তিন-চার বছরের জমা-খরচ পড়ে শোনানো হয়। খাতায় আঁকজোক কেটে জমার ঘরে ঘিয়ের ডাব্বা জমা করে নেওয়া হয়।—কালু শুনিয়ে দেয়, 'সত্যি-মিথ্যে তো ভগবানই জানেন, বেনে যা বলবে তাই মানতে হবে।' ঘিয়ের পর ষোলোমন হিসেবে ওজন করে যা-কিছু ফসল উঠেছে এবং পরে উঠবে তা লেখা হয়। কারুর গয়না জমা করা হল তো

কারুর জমা রাখা গয়না কিনে নেওয়া হয়েছে লেখা হল....আর তারাও বাড়ি বাড়ি ঘুরে মিষ্টি-লাড্ডু খেয়ে গাড়ি বাক্স পেঁটরা ফসল আর ঘিতে বোঝাই করে নিজেদের পথ দেখে।

এদিকে গুলি-ডাণ্ডা খেলার মকর সংক্রান্তি এসে যায়। শীত বিদায় নিতে নিতে মাঠের সবুজ ফসল ক্রমশ তার শ্যামলিমা হারাতে থাকে। বসন্ত যেন হলুদ রঙের চাদর বিছিয়ে দেয় আর ফাল্গুনী হাওয়া যেন তাও টেনে কেড়ে নেয়....একদিকে পাকা ফসলে কাস্তের আনাগোনা চলতে থাকে অন্য দিকে দোলের ঢোল বেজে ওঠে।

লোকেরা ত্থ-চার দিনের জন্য কাস্তে-কোদাল তুলে রাখে। স্ত্রীলোকেরা গোবর আর মাটি দিয়ে ফাগ খেলে। পুরুষেরা ছড়ি নিয়ে দলে দলে জমা হয়। পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ঢোলের শব্দে, হোলী উপলক্ষে জ্বালানো আগুনে লোকেরা উন্মাদ খুশিতে মেতে ওঠে।

গম-ছোলার ফসল গোলায় তোলা হতেই আশপাশের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ বিধবারা পঙ্গপালের মতো ছেঁকে আসে; তাদের ত্থ-সের চার-সের করে শস্য খয়রাত করা হয়। প্রথানুযায়ী গ্রাম-প্রধানদের ফসলের অনুপাতে শস্য দেওয়া হয়। বেনের খাতায় লেখা অনুযায়ী ফসল তার গুদামে পৌঁছে দেওয়া হয়। আর যা অবশিষ্ট বেঁচে থাকে তাতে ছাই মিলিয়ে ভাঁড়ারে তোলা হয়। কালু কোদর প্রভৃতি গাঁয়ের তিনের চার ভাগ লোক ছাই না দিয়েই রেখে দেয়। 'সেই খেতেই তো হবে, ছাই মাখাও আর না মাখাও।'

গরমের দিন ক্রমশ বড়ো হতে শুরু করে। নির্বিকার সাধুসন্তের দল তীর্থযাত্রার পথে গাঁয়ে এসে জড়ো হয়। হাতী-উটের সাথে তাঁবু ফেলে আস্তানা গাড়ে। লোকেদের উপদেশ দেয়, 'হাতে তুলে যা দিচ্ছ তাই সঙ্গে থাকবে, এখানে যা দিচ্ছ ওপারে তাই ফিরে পাবে...পুণ্যের দ্বারাই পাপকে দূর করতে পারো, তাই—' এইভাবে রুটি খেতে থাকে আর সকলকে আশীর্বাদ করার সাথে

সাথে কপালে ছাই মাখতে থাকে। একে একে তারাও কাশী মথুরা আর বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়।

কোনো কোনো গাঁয়ে বিয়ের সানাই বেজে ওঠে। রণছোড় মোড়ল প্রভৃতিদের মতো পয়সাওলা মান্যগণ্য ঘরের বউয়েরা সিন্দুক থেকে কানের দুল, সোনার হার আর নতুন কাপড় বার করে.... কেউ সেজেগুজে আনন্দে ঘুরে বেড়ায় তো কেউ চোখেতে কাজল লাগিয়ে বসে থাকে। আর বিয়ের লগ্নের তিন-চার দিন তো যুবক-যুবতীরা যেন যৌবন-মদিরায় চুমুক দিয়ে উচ্ছল মাতাল হয়ে ওঠে— বুড়োরা বাটি বাটি আফিম গেলে কিন্তু চতুর্থ দিনের দিন মাথার পাগড়ী খুলে খুঁটিতে টাঙাতে টাঙাতে কালু বলে, 'নাও বিয়ে-থা চুকল এবার টোপর তুলে রাখো।'

ঠিক সেই সময়েই বুড়ো পরমার বারোদিন ধরে শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম বিয়ের হৈ-চৈয়ের ওপর টেক্কা দিয়ে গেল। সারা অঞ্চলের সব সমাজের লোককে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয় আর পঁচাত্তর বছরের পরিণত বয়সে মৃত্যু উপলক্ষে আড়াইমনী ঘিয়ের টিন খালি করে বুড়ো পরমার শ্রাদ্ধের উদ্ধার করতে আড়াই তিন হাজার লোক যোগ দেয়। শেঠের ভাষায়— 'মোড়ল ভাই বিশ মন ঘি পুড়িয়ে কাছায় হাত পুঁছতে পুঁছতে ওপারে রওনা হয়ে গেল!'

গরমের দিন ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে কাল বৈশাখী ঝড় দেখা দেয়। এধারে-ওধারে দু-একজন বউয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার আয়োজন হয়। কোনো কোনো গাঁয়ে গলায় ঘন্টি বাঁধা পণ্ডিতের ঘোড়া এসে পৌঁছয়, 'সুখে থাকো বাছারা, খুশিতে থাকো! তোদের বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক···তা বাপধনেরা এসো, ছেলের নামকরণ করিয়ে নাও। আপনি তো বেশ মোটা কাপড় পরেন দেখছি। এবার আমার এমন শাড়ী চাই যে কচ্ছের মরুভূমি অঞ্চলে গিয়ে মুশকিলে পড়লে যেন কাপড়ে জল বেঁধে রাখতে পারি....দুর্ভিক্ষ-দুর্দিন পড়লে তোমার চার আঁচলে ছায়ায় চার ছেলে যেন বাঁচে— সারাদিন 'জাবর কেটে কেটে' গায়ে-গতরে

তাগড়া ঘোষ দাও। নিজের গাঁয়ে পৌঁছলে যেন বাচ্চারা চিৎকার করে, 'ওরে পালা, দৌড়ে পালা, হাতীর বাচ্চা এসেছে!—এইভাবে পণ্ডিতও যার যেমন অবস্থা সেইমতো আদায়পত্র করে নিজের দেশের দিকে রওনা হয়।

পণ্ডিতের ঘোড়ার ঘন্টির রেশ মিলোতে না মিলোতেই ভঁাড়ের চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়, 'ভাং হাং হাং হা! ভাং হাং হাং হা। তা তা হতা থেই— '

কোনো গাঁয়ে ভর্তৃহরী রাজা ও পিঙ্গলা রানীর নাটক দেখায় তো অন্য গাঁয়ে 'গোপীচন' 'সঘরা-জেসংগ' ও 'জসমা ওড়নী' নাটক হয়। আবার কোথাও 'রণেক দেবী রাঘেংগার' খেলা চলে। কিন্তু লোকদের ঐ রঙ্গলা-রঙ্গলী (বহুরূপী) খেলাটাই বেশি পছন্দ হয়। চোখনাচাতে আর ভাঁড়ামি করার সুবিধেও ওতে বেশি পায় তারা। নায়িকা রঙ্গলীর অভিমান ও মাঝরাতে অভিসার, সতীনের জ্বালা ও ঝগড়া কলহ যেমন উপভোগ্য তেমনি নায়ক রঙ্গলার পরস্ত্রীর জন্য পাগল হয়ে ওঠা সকলের ভালো লাগে।

রামা প্রভৃতি কয়েকজনে বলে, 'তা সত্যি ভাই, এই রঙ্গলা-রঙ্গলীই বেশি রঙ ঢঙ করতে পারে! লোকদের তা ভালো তো লাগবেই।'

'কেন পছন্দ হবে না?' কালু বলে, 'তোর কথা আমার ভালো লাগে যেমন আমার কথা তোর তেমন লাগে। আর দেখছিস না, রঙ্গলীর গালে রঙ্গলা চুমো খাচ্ছে কিন্তু আমাদের যেন ঠোঁট ভিজে ওঠে; তাই না? আর ঐ মেয়েদের গাল তো; কেউ গিয়ে দেখে এসো মনে রঙ্গলীর বদলে চুমোর ছাপ ওদের গালেই পড়েছে।...'

ভাঁড়ের সর্দার বলে, 'সবাই বলো অম্বা মাতা কি জয়...' আর লোকেরা জয়ধ্বনি দিতেই সে আবার বলে, 'এবার লাড্ডুর ব্যবস্থা কে করবে?'

এইভাবে গাঁ থেকে গাঁয়ে লাড্ডুর ভোজ খেয়ে, প্রথম পুত্রসন্তান

জন্মের অভিনন্দন উপলক্ষে বাসনকোসন আদায় করে। নতুন বউদের কাছে শাড়ী চেয়ে ফেরার পথে আগে ছেড়ে যাওয়া গ্রামগুলোতে খেলা দেখাতে দেখাতে ভাঁড়ের আওয়াজ দেশের দিকে ফিরতে থাকে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে ; 'তা তা হতা থৈ.... ! তা তা হতা থৈ !'

কোনো কোনো গাঁয়ে এই-সব বাইরের ভূতদের হট্টগোলে সত্যিকারের ভূত— মোতিঝড়া (টাইফয়েড) এবং শেতলা মায়ের (বসন্ত) নামে সাদাসিধে মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে। তাদের আনাগোনাও দু-চারদিন চলে। পাখোয়াজ আর খঞ্জনির তালে দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে লোকে ভীষণভাবে মেতে ওঠে। কেউ হাতে চুড়ি ভেঙে ফেলে। কেউ-তো জামা ছেঁড়ে স্বেচ্ছায় মাতামাতি ক'রে— নারকে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি মানত পেয়ে বৈশাখী ঝড়ের সাথে তারাও বিদায় নেয়।

একে একে সকলেই যখন এসে যায় তখন হরিজন ভাঁড়েরা আর ভানুমতীর খেল দেখানোর লোকেরাই বা কেন বাকি থাকবে ? এ ছাড়া বাঁশি বাজিয়ে সাপের খেলা দেখাতে মাদারীরা অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণীতে পটু জ্যোতিষী রঙ্গস্বামীরাও বেড়িয়ে পড়ে। তারপরে তলোয়ার বর্শা তীর ইত্যাদি তৈরি করে দিয়ে কামার আসে, আর বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সুর করে টেনে টেনে ডেকে বেড়ানো যাদুকরই বা কম কিসে, 'কই দা....ও... গো গি....ন্নী ! রুটি আর ভাজা, তা হলে বউ আসবে তাজা।'

সবশেষে আসে কাল বৈশাখী ঝড় ! পুরোনো গাছ উপরে ফেলে অন্য গাছের ডালপালা ভেঙে, বাড়িঘরের খড়ের চালা উড়িয়ে মাচায় তুলে রাখা শুকনো ডাল ঘাস পাতা লণ্ডভণ্ড করে আর মাঠে-উঠোনে ঝোপঝাড় উড়িয়ে কাঁটা ছড়িয়ে···

কিন্তু সেও গাছের ঝরা পাতা আকাশে উঠিয়ে, ধুলোর মেঘ তৈরি করে, সূর্যের তেজ কমজোর করে দিয়ে নাচন-কোদন করতে করতে পুবের আকাশে মিলিয়ে যায়...

আষাঢ়ী বর্ষার সময় এসে যায়।

দেবা মুদীর ছেলে আর তার দলের লোকেরা মালওবা যাবার জন্যে রওনা হয়। 'মর্‌র্‌ রে মর্‌র্‌ রে' করে বলদেটানা গাড়ি হাঁকায় আর খবরের কাগজের মতো নিত্যনতুন খবর শোনাতে থাকে পথের সকলকে, 'সাহেবদের আমি নিজের চোখে দেখেছি আর রেলগাড়িতেও নিজে চেপেছি। পাঁচ আনার একটা টিকিট কেটে পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা মজা করে করে এসেছি।'

অনেকেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তবে প্রশ্ন সকলের একটাই 'ও রতনভাই, সাগরপার থেকে যে সাহেবরা এসেছে তারা অন্যদের মতো কি ভালোমানুষ ? আর ঐ যাদের 'মেম' বলে তারা কেমন ? আর ওদের গাড়ি ?....আর আমাদের একটু ভালো করে শোনাও না ভাই !'

শ্রোতাদের অদম্য আগ্রহ রতনকে মদের নেশার থেকেও বেশি মাতাল করে তোলে। সেও বেশ রঙ চড়িয়ে ফলাও করে বলে, 'সাহেবরা তো ভাই সবজান্তা লোক। দেবতাদের মতো চেহারা ! আগাগোড়া খাঁটি সিঁদুর দিয়ে তৈরি ! আর মেমেরা তো সাক্ষাৎ পরী ! আস্তে আস্তে চলে আর বাচ্চাদের মতো আধো আধো করে কথা বলে।— যেখানে পা দেয় যেন সিঁদুরের ছাপ পড়ে আর কথা বললে ফুল ঝরতে থাকে !'

কালু বলেই ফেলে, 'ঐ মেমকে দর্শন করার সুযোগ পেয়ে তুই এ জীবন সার্থক করে ফেলেছিস রতনভাই…' কিন্তু তার দ্বিতীয় প্রশ্নে কালু রতনের গর্বকে খর্ব করে ফেলে সাহেবদের রূপ-গৌরব সব মাটি হয়ে যায়, 'আচ্ছা রতনা ভাই, লোকে যে বলে সাহেবরা পায়খানায় যাবার পর জলশৌচ করে না, কথাটা সত্যি নাকি ?

রতনাকে স্বীকার করতে হয়, 'আমার কারবারী তো বলে ভাই যে কথাটা সত্যি।'

ব্যস, সাথে সাথে সমস্ত মাঠ সাহেবদের নামে থুথু করে ওঠে : থু থু থু থু…

'যাকগে ঐ ন্যোংরাদের কথা ছেড়ে দাও, আমরা গাড়ির বিষয়ে গল্প করি, তারপরে কি হল ভাই?'

'কি আর বলব ভাই! ক্ষেপা মোষের মতো ইঞ্জিন! পাঁই পাঁই করে কেবল দৌড়য়··· !'

'আমাদের জমিদারের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো তা হলে বলো!' রামা বলে ওঠে।

রতনা মুদী হেসে ওঠে, 'আরে তোর জমিদারের ঘোড়া তার ক্ষমতার কাছে কিছুই না। দৌড়নোতে তাকেও পেছনে ফেলে রাখবে কিন্তু যাত্রীদের পেটের ভাত মোটে নড়ে না।'

'খুব মেজাজী চালে চলে তা হলে।' কালু বলে ওঠে।

রতনা মুদী মুশকিলে পড়ে যায়, 'তোমাদের আমি বোঝাব কী করে?···এই খাটের বাটানের মতো লোহার লাইন পাতা আছে আর তার উপরে গাড়িটা রাখা হয়। চরকির মতো তার চাকা ঘোরে আর বানের জলের তোড়ের মতো হুড়মুড় করে চোখ বুজতে না বুজতে পাঁচ ক্রোশ দূরে পৌঁছে যায়!···'

এইভাবে সাহেবদের আর তাদের গাড়ির চমক লাগানো গল্প করতে করতে রতনা মুদীর দলবল মালবার লম্বা পথে পাড়ি দিতে থাকে।

আর এদিকে মাথার ওপর মেঘের দলের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।

রতনা মুদীর তাঁবু থেকে ফেরার পথে রামা-কালু-কোদরদের বলে, 'রতনা মুদীর বাক্স প্যাঁটরায় নুন, কাপড় ও নারিকেল ঠাসা, কিন্তু আমাদের আকাশে এই মেঘের বাক্সে শুধু মুক্তো চকচক করছে।'

'এই সবই আসল মুক্তো।' কোদর বলে, কিছুক্ষণ বাদে আবার বলে, 'সারা পৃথিবী আমাদের কাছে হাত পাততে আসে কিন্তু আমরা কেবল এই বরুণদেবের কাছে হাত পাতি। কেবল তাঁরই দয়া ভিক্ষা করি।'

'কথায় বলে যে এক চাষার পেছনে এক কোটি লোক মুখ চেয়ে

রয়েছে, সে কথাটা মিথ্যে নয় ভাই !' শংকরদা বলে।

'তবুও চাষীরা চিরদুঃখী ? তা হলে বল ভগবানের রাজত্বে এটা ন্যায় কি অন্যায় ? জন্ম থেকে অবধি খালি এক নাগাড়ে খেটে যাওয়া। কোনো রকমেই সুখ নেই ! না খাওয়া-পরায় সুখ আছে, না বউদের—'

কালুর কথার মধ্যেই রামা বলে ওঠে, 'আরে পাগল, আমাদের তো পৃথিবীর পালনকারী বলে। আমাদের সেই সাধু মহারাজ যে বলত তা কি তুই শুনিস নি ? বাপ-মা যেমন ছেলেমেয়ের জন্যে চিন্তা করে চাষা তেমনি চিন্তা করে সারা দুনিয়ার জন্যে—'

কালুর হাসি পেয়ে যায়, 'পালক নয়, বরঞ্চ বলতে পারো পৃথিবীর বোঝা-বহনকারী বলদ।' শংকরদা, কোদর প্রভৃতিদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কিছু ভুল বললাম নাকি ভাই ? গাড়ির তাকের আলমারিতে যতই ঘি, গুড় আর গম ভরে রাখা থাক্-না কেন বলদের বরাতে জোটে কেবল খড়-ভুষি ; তাই নয় কি ? আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই।'

কালুর কথা হালুয়ার গ্রাসের মতোই গলা দিয়ে নেমে যায় যেন, 'ঠিক কথাই বলেছ ভাই। এত প্রচুর গম ফলালাম কার বাপের জন্যে ? আমাদের বরাতে তো সেই ঘাসের দানা আর খুব বেশি জুটলো তো ভুট্টা।'

রামাও প্রতিবাদের কথা ভুলে যায়, আর ঐ যে মোষের দুধ তার কী হয় ? মোষ তো আমাদের, কিন্তু ঘি রাখার কৌটোটা বেনে মুদীর তো ?'

কালু বলে ওঠে, 'কথা আছে না গুড় যতই মিষ্টি হোক-না কেন, যে জ্বাল দেয়, তাতে তার কী লাভ ?'

সকলেই বুঝে ঘাড় নাড়ে, 'আমাদের কথাটা খুবই সত্যি···এই পৃথিবীর বোঝা-বহনকারী বলদ আমরা', কিন্তু কালুর মনের ওপর শুধু পৃথিবীর বোঝা নয়, তার নিজের জীবনের বোঝাও ছিল। রাজুবিহীন জীবন তো একটা বোঝারই সামিল। কেন যে সে

বেঁচে রয়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না— তবুও বেঁচে রয়েছে —বেঁচে থাকতে হচ্ছে।....

যদি কোনো আকর্ষণ থাকে তো তা হলে তা এইটুকুই যে, কাজ করে দেবার ছুতোয় শ্বশুরবাড়িতে রাজুর মুখ দেখার সুযোগ পায় সে। তুটো কথা বলতে পারে। জামাই আদর-আপ্যায়নে পেটের খিদের সাথে সাথে কিছুক্ষণের জন্যে মনের খিদেও একটু মেটে।

কিন্তু তু-চার দিন থাকার পর ঘরে ফিরে এলে সেই একই অশান্তি। সেই হাত-পা বাঁধা জীবন ও সেই একই অন্তরের দাহ!··· সে বলে ওঠে, 'ঘরে-বাইরে সারা পৃথিবীর পিঠের ওপরেই কি বইবার জন্যে তাকের আলমারি বসানো আছে!'

॥ সাতাশ ॥

অন্তরে অনুভবের বিষয়

বৈশাখের ঝড়ঝঞ্ঝা শান্ত হতে না হতেই জ্যৈষ্ঠের রোদের তেজ বাড়তে থাকে। অল্পবেলা বাড়তে না বাড়তেই মাটির থেকে তপ্তবাষ্পের তাপ উঠতে থাকে। দুপুরের সময় বাড়ির বাইরে যাবার সাহস হয় না কারোর।

গরমের দিনকে কিছুটা আলসেমির দিন বলে ধরা হয় কিন্তু এদের এখানে জ্যৈষ্ঠেতে তো আলসেমির কোনো চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। কারোর বাড়িতে খাদ (সার) তৈরির কাজ চলছিল, কারোর বাড়ির চালের টালি ফেরানো হচ্ছিল। কেউ ঘরের দেওয়ালে নতুন দরমার বেড়া তৈরি করছিল তো কেউ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত ছিল। শংকরদাদের সুখী সম্পন্ন পরিবারের লোকরাও কোমরে সুতলীর গাঁট বেঁধে মাকু ঘুরিয়ে সুতো কাটছিল।

ভলীর মতো একলা ঝাড়া হাত-পা বউয়েরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুড়ি করে খাদ তোলার কাজ ইত্যাদি শেষ করে ফেলে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের কাজ শেষ করার পর বর্ষার সময়ের জন্যে ঢেঁকীতে চাল কুটতে বসতে হয়। মাঝরাত অবধি বাড়ি বাড়ি 'ধীবং ধীবং' শব্দ উঠতে থাকে— লঙ্কা-হলুদ আর নুন পিষে রাখার কাজ চলতে থাকে।

কালু একলা মানুষ। তার ওপরে দুটো বাড়ির কাজকর্ম করতে হয়। নিজেদের এবং শ্বশুরবাড়ির সার তৈরি করা, জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা আর চালার টালি ফেরানোর দরকার। সে খানিকটা ঠিকে মজুর লাগিয়ে সারে ও কিছুটা অন্যের কাছ থেকে জিনিস ধার করে এনে কাজ চালিয়ে নেয়।

দিন দশেকের মধ্যেই সে নিজেদের সব কাজকর্ম শেষ করে

ফেলে। এগারো দিনের দিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটতেই সে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ভলীকে জানায়, 'আমি একটু শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসি, কি বল?'

ভলী এই প্রথম যাবার কথা শোনে, 'ও! তাই বলো। আমি তো ভাবছিলাম মাঠের কাজের জন্যে মজুর জোগাড় করতে বেরোচ্ছ।' গলার স্বরের থেকেও ভলীর চেহারা ও চোখে বিরক্তির ভাব বেশি ফুটে ওঠে।

'জন মজুর খুঁজতেও বেরোতে হবে পরে। ওরা খবর পাঠিয়েছে যাবার জন্যে, আর—'

ভলী চুপ করে থাকতে পারে না, বলে ওঠে, 'ওরা— ওরা বলছ কেন মিথ্যে! বলো না যে ঐ ঝুমকো দুলউলীই ডেকে—'

কিছুদিন থেকেই কালু বুঝতে পারছিল যে ওর শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা ভলীর পছন্দ নয়। কারণটা ভলী আজ নিজেই বলে শোনায়, 'ওকে একবার না দেখলে তো তোমার শান্তি হবে না! এই দিন-পনেরো—'

'যেতে দিতে ইচ্ছে না থাকলে পরিষ্কার না বলে দে না। কিন্তু এমন আবোল-তাবোল কথা বলবি না বলছি। নে যা...এই রেখে দিলাম তলোয়ার।' এই বলে কালু ভাঁড়ারের দেওয়ালে তলোয়ার টাঙিয়ে রাখে। পাশের খুঁটিতে পাগড়ী খুলে রাখতে রাখতে বলে, 'তোর বাপের বাড়ির কাজ করে দিচ্ছি তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবি কোথায়, তা নয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিস। ঠিক আছে, খুব বুঝলাম।'

বকবক করতে করতে কালু দরজার পাশে হেলান দিয়ে রাখা হুঁকোটা তুলে উনুন থেকে আগুন ধরাতে বসে। 'ঠিক কথাই তো। দুবছরের খাদ মাঠে পৌঁছলে পঁচিশ মন ফসল বেশি হবে যে, আর বাচ্চাগুলো ঘাসের দানার বদলে ভুট্টা খেতে পাবে কিনা!' হুঁকো সেজে নিয়ে সদর দরজার বাইরের চালাতে গিয়ে বসে, 'আজ যা বললে তা আগে বলে দিলেই পারতে তো! ঐ আদুরে দুলালীর জন্যে আমার প্রেম এত উথলে উঠছিল না যে সারা বছর

ডবল খাটুনি খেটে যাব।'

ভলী এই প্রথম কালুকে একটানা এতক্ষণ বলতে সুযোগ দেয়। না দিয়ে আর উপায় কি? কালুর কথা যেমন একদিক দিয়ে সত্যি তেমনি তার ভাবনাটাও মিথ্যে কিছু নয়। সে তাই ঈর্ষা ও রাগের সাথে এবারে ঠাট্টা মেশায়। চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কালুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বুকে হাত রেখে সত্যি করে বলো তো যে তোমার রাজুর ওপর কোনো টান নেই?'

অল্পক্ষণের জন্যে কালু একটু বিব্রত হয়ে পড়ে তারপরে হেসে ফেলে, 'কী পাগলের মতো যা-তা বলছিস! এমনিতে দেখলে আমার আর রাজুর মধ্যে অনেক কিছুই থাকবার কথা। দশ বছর পর্যন্ত আমাদের পাকা দেখা ঠিক ছিল, আবার যদি অন্য দিক দিয়ে দেখিস তো আমাদের মধ্যে ভাই-বোনের মতো সম্প্রীতি ছাড়া কিছুই নেই।' কিছুটা গাম্ভীর্য ও কিছুটা বেদনার সাথে বলে, 'তোর যদি বিশ্বাস না হয় তো তুই যার দিব্যি গালতে বলবি তার দিব্যি দিয়ে বলতে পারি।' ভলী একটু লজ্জা পেয়ে যায়···তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কালু বলে চলে, 'শুধু তাই নয়, আমি যদি কখনো ওর সাথে এমনি কোনো হাসি-মস্করা করে থাকি তো ঠাকুর যেন আমাকে অভিসম্পাত দেন!···আমার মায়ের দিব্যি দিলাম! এবার বিশ্বাস হল তো?'

এবারও ভলী কোনো উত্তর দিতে পারে না। সে মুখ নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে দালানের মেঝে খুঁটতে থাকে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোর? তামা তুলসী নিয়ে আয়। সকলের সামনে হাতে নিয়ে বলতে পারি। যদি না বলি তো ভগবান আমায় আজই যেন—'

ভলী চটে ওঠে। কথার মধ্যে বলে, 'এবার চুপ করো দেখি! কথা নেই বার্তা নেই খালি দিব্যির পর দিব্যি গেলে যাচ্ছ। কেউ কিছু বলেছে কি যে সত্যি নয়? নাও যাবে যদি তো ওঠো এখন। অনেক বেলা গড়িয়েছে। তার ওপর পাঁচ ক্রোশ রাস্তা যেতে হবে।'

পায়ের ওপর পা তুলে বসে সামনের মাটির দিকে চোখ রেখে কালু হুঁকো টানছিল, 'উঁ হুঁ! ও-ব্যপারে কোনো কথা নয়।'

ভলী কালুর কোলেতে পাগড়ী গুঁজে দেয়, 'কই নাও না?'

'তুই যতই মাথা কুটিস আজ আর যাচ্ছি না। যেতে হয় তো কাল যাব কিন্তু আজ আর নয়।'

'তা হলে উঠে ক্ষেতের মজুরের সন্ধানে যাও, অন্তত সে ঝঞ্ঝাট মিটুক।'

'যাচ্ছি, তুই যা দেখি।'

কালুর গম্ভীর বিষণ্ন চেহারা দেখেই হোক, কি অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ভলী আর জেদ করে না; দেওয়ালের গায়ে তলোয়ারটা হেলান দিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে চলে যায়। অবশ্য মধুর আবেশ মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলতে থাকে— এ কেমন বদরাগী মানুষ ভাই!···কিছুই জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই দেখছি···'

কালুরও এভাবে পায়ের ওপর পা তুলে ঘরে বসে থাকার অভ্যেস ছিল না। পাগড়ী বেঁধে নিয়ে কাঁধে তলোয়ার ফেলে সে নদীর দিকে রওনা হয়।

সারা রাস্তায় একটাই চিন্তা একই প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল— 'কিন্তু ওকে (ভলীকে) কে বলল যে আমার সঙ্গে রাজুর কিছু ব্যাপার আছে— আমি সেজন্যেই বারবার শ্বশুরবাড়ি দৌড়ই?··· তা ছাড়া আমার আর রাজুর মধ্যে তেমন আছেটাই বা কী? কিন্তু তা সত্ত্বেও ভলী জিজ্ঞেস করল কী করে যে, বুকে হাত রেখে বলো দেখি কোনো কিছুই ব্যাপার নেই তোমাদের মধ্যে?'

কালু হাসে কিন্তু মলিন সে হাসি, 'আমিও অবশ্য ওকে মন খুলে কথা বলেছি। ধরলে অনেক কিছুই আছে···এই এক-আধ বছরের মধ্যে আমার যদি কোনো বাচ্চা না হয় এবং তার মধ্যে ও যদি বিধবা নাও হয়, তা হলে পঞ্চায়েতের লোকেরা বিচারে যা বলার বলুক, আমি রাজুকে আবার বিয়ে করেই ছাড়ব। তাতে যদি নানিয়ার মতে ঝগড়া মারামারি বেধে যায় ও মাকে দেওয়া দিব্যিও

যদি ভাঙে তো ভাঙুক। একবার অন্তত জীবনের বাসনা পূরণ করে নেব। আমার ছেলেবেলার স্বপ্নকে সত্য করে তুলব···' তার মুখে যেন জল এসে পড়ে এমনি ভাবে বলে ওঠে, 'ওর মা যখন রাজুড়ীর মতো মেয়ের জন্ম দিয়েছে···তখন আমি আর কী করতে পারি···। রাজুড়ীর মতো অমন কেউ আমার পাশে থাকলে' সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে বলে, 'এই পাহাড়ে লাঙল চালিয়ে সমান করে দিতে পারি, নদীর গতিকে আটকে রেখে পুকুর বানাতে পারি, জায়গায় জায়গায় আম গাছ লাগিয়ে ও কুয়ো খুঁড়ে...জঙ্গলে আনন্দের হাট বসাতে পারি— যদি এই সব-কিছু একটা রাজুড়ীকে খুঁজে এনে দিতে পারে!' কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সে সুখের দিন এ জীবনে কি আর কখনো আসবে?'

জলখাবার জন্যে নদীর বুকে খোঁড়া কুয়োর দিকে যেতে যেতে কালুর মাথা খানিকটা চাঙ্গা হও, 'ও-সব অনেক কিছুই তো তুই ভাবছিস কিন্তু দুটো বউ করার কষ্টটাও একবার ভেবে দেখেছিস কি! মনে মনে শুধুই আকাশকুসুম রচনা করছিস। কোনো সুখ নেই ওতে। আর সতিসত্যিই যদি সতীন আসে তো তা হলে তাদের দুজনের গলা দিয়ে নামতে দেবে? স্রেফ জন্ম ভুলিয়ে দেবে বুঝলি। নানিয়াকে দেখছিস না? পাঁচজনের মধ্যে নিশ্চিন্তে একটু বসবে সে উপায় কি ওর আজ আছে?···আর সেও কি কম মারধোর করে নাকি? দুটো বউয়ের কারুর দেহের হাড় তো গোটা রাখতে দেয় নি। ঐ কথায় বলে না যে লাগাম ছাড়া ঘোড়া আর বেহায়া স্ত্রী— নইলে তোর মা শুধু শুধু কি আর দিব্যি করিয়ে নেয়। তার উদাহরণটাই বা নিচ্ছিস না কেন? ও তো ভগবানের কাছে মানত করেছিল বলেই না তোর জন্ম হয়েছে; না হলে তো কিছুই হত না। পাগল, দুটো বউয়ের চিন্তা ভুলে যা। স্বামীর ধুতি ধোয়ার ব্যাপারেও দু বউয়ে লড়াই করবে। বল, তুই তার কি করতে পারবি? এই পুরোনোকে (ভঙ্গী) তুই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তাকে ভিটের থেকে দূর কথা সম্ভব নয়! অতএব···'

'তাই যদি বলিস তা হলে ও বেচারী খারাপটা কি? একটু মেজাজটা যা গরম নইলে কাজকর্মের দিক থেকে তো সাতটা বউয়ের সমান।…আর রাজু বউয়ের মধ্যেই বা কোন্ ময়ূর পেখম তুলে রয়েছে? মানছি স্বাস্থ্য এবং গড়ন সুন্দর বলেই ঐ রূপ আর সব-কিছু আছে…ও তো চারদিনের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। আমাদের মতো চাষাদের সে জ্যোৎস্না ভোগের অবকাশ কোথায়? মিষ্টি কথাতে কি আর ভাগ্য ফেরে? আমাদের দরকার কাজেকর্মে পোক্ত স্ত্রী…ঐ মিষ্টি বুলি দূরে আছে বলেই আজো মিষ্টি রয়েছে, ঘরেতে এলে সেও নিজের মূর্তি… ।'

পাশের পাহাড়ের বস্তিগুলোর দিকে এগোতে এগোতে হেসে ফেলে, 'সব-কিছুই দেখছি মনের ব্যাপার। না-হলে এমনিতে তো এও মেয়েমানুষ আর সেও মেয়েমানুষ…ঠিক আছে ভাই, কখনো কখনো রঙের ছিঁটেফোটাই ভালো, বেশি হলে সব-কিছু মাটি হয়ে যায়।'

কালু সেই 'অল্প' সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলে, 'অল্প অল্প করতে করতে হয়তো…'

সে যেন কোনো শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করছে সেইভাবে ভলীর কথাটাকেই সামনে তুলে ধরে, 'বুকে হাত দিয়ে বলো তো দেখি…'

কালু মনে মনে স্থির করে যে বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে: মহাদেব, তোকে সাক্ষী রেখে এই আজ বলছি যে আর কখনো যদি কোনো বিশেষ দরকার ছাড়া রাজুর বাড়িতে যাই তো কি বলেছি।

॥ আঠাশ ॥

তামার ঘড়া কলসী

কালু নদীর পার ধরে গাঁয়ের থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে চলে এসেছিল। রাস্তা এত সংকীর্ণ আর দু পাশে এত ঘন ঝোপঝাড় যে দিনে-দুপুরে এখানে বাঘে খেয়ে যেতে পারে। বাঘ অবশ্য বেরোয় না বটে কিন্তু পাহাড়ের ওপরে গঁদ সংগ্রহ করতে করতে ভীলেরা তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে 'কার ছেলে রে এটা ?' প্রশ্নকারী কালুর সারা শরীরটা চোখ বুলিয়ে নেয়।

লুট করার মতো কিছুই নেই দেখে বা 'বালা প্যাটেলের ছেলে' জেনে অথবা 'অলখাগামেতী বাড়িতে যাচ্ছি' এই কথা শুনে কিংবা কালুর চওড়া বুক, বলিষ্ঠ হাত, কাঁধে রাখা তলোয়ার দেখে ওরা তাকে বিরক্ত করতে এগোয় না।

কালুর বাবা বালা প্যাটেলকে ভীলেরা যথেষ্ট সম্মান করত। বছর পঞ্চাশেক আগে বালার যুবক বয়সের কথা ও তার লড়াইয়ের গল্প তারা বলাবলি করে আজো। সে সময়ে মোগল দস্যুরা এদিকে এসেছিল। এই-সমস্ত গ্রামের এবং এই ভীলেদের মান-ইজ্জত বাঁচিয়েছিল সেদিনে দুজন লোকে, একজন বালা আর অন্য জন বেচাতের বাবা। দস্যুরা এদের গাঁ লুট করতে এলে এই দুজনে নদীর ওধারে রাস্তাতেই বাধা দেয়। টিলার জন পঁচিশেক ভীলের সাহায্য নেয় তারা— এক সংকীর্ণ রাস্তার ধারে আড়ালে সকলে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে মাথার ওপর মন মন ভারী পাথরের চাঁই ও বৃষ্টির মতো তীরের ঝাঁক এসে পড়তে ডাকাতেরা ভীষণ ঘাবড়ে··· যে যেখানে পারে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। অনেকেই সেখানে মরে পড়ে থাকে, যারা পালিয়েছিল তারা ভীলেদের ফাঁদে গিয়ে পড়ে। যারা বেঁচে যায় তারা যে কোথা দিয়ে কোথায় পালিয়ে

যায় তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

সেইদিন থেকেই ঐ অঞ্চলের নাম 'লাল ঘাটী' হয়ে যায়। টিলার ওপরে তারপর থেকে বন্দুকের পাহারা বসে। বালা ও বেচাতের আহত বাবা লুঠের মালের সঙ্গে একটা করে বন্দুক নিয়ে এসেছিল। আজো সেটা কালুদের বাড়িতে কে জানে কোথায় পড়ে আছে— কিন্তু আছে ঠিকই।

এই টিলার কিছু ভীলেরাও বালার কাছে একবার শায়েস্তা হয়েছিল, সেই থেকে তাদের এমন ভয় ধরে গিয়েছিল যে বালার নাম বলে গাঁয়ের সকলেই ভীলেদের এখানে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারত, তাদের সঙ্গে একরকম বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে।

কালু পাহাড়ের ওপর উঠে একটা বস্তির সামনে গিয়ে হাঁক পাড়ে— 'ঘরে কে আছে?'

দশ হাতের সেই দেয়াল কাঁটা গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি। খাপড়ার বদলে, ঘরের ছাত পলাশ গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া। উঠোনে মাথা হেঁট করে ঢুকতে হয় ছাত এত নিচু। খাটিয়ার বদলে মাটিতে চারটে খুঁটি পুঁতে দড়ি বুনে বসবার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। উঠোনে তিনটে বাচ্চা খেলা করছিল। কালুর ডাক শুনে তারা বেরিয়ে আসে। বছর সাতেকের মেয়ে পরনে শুধু একটা লেঙ্গটী। তিন আর পাঁচ বছরের ছেলেমেয়ে দুটো পুরোপুরি উলঙ্গ। অবশ্য লাল সুতো একটা কোমরে বাঁধা ছিল বটে। গায়ের রঙে তাদের একদম ঠিক কালো নয়, বরং বলা চলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

'এই বাচ্চারা, তোদের বাপ কোথায় 'গেল রে?' একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। কালু তলোয়ারটা তার দিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করে।

বাচ্চারা জবাব না দিয়ে দরজার দিকে তাকাতে থাকে! ঘরের থেকে একটি কিশোরী বেরিয়ে আসে, তার গায়ের রঙ গমের মতো বাদামী। মুখটা গোলগাল সুডৌল। বারো-পনেরো বছরের সেই কিশোরী মেয়ের দুপায়ে দুটো করে বালা। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো

কতকগুলো একসাথে করে নিতম্বে কাছা দিয়ে পড়া। গলায় কাঠের পুঁতি ও কড়ির মালা। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল। দেহে বিকাশোন্মুখ উন্মোচিত যৌবন! এমনভাবে নগ্ন-যৌবনে তারা অভ্যস্ত বলেই হোক কিংবা অবুঝ বয়স থেকে মাত্র দু-পাঁচ বছরের বড়ো হওয়ার জন্যেই হোক, তার আচরণে বিন্দুমাত্র কোনো সংকোচ নেই। কালুর কাছেও অবশ্য এমন পরিস্থিতি নতুন কিছু নয়।

'আমার বাবা তো গঁদ জোগাড় করতে গেছে।'

কালু আগুন চায় তার কাছে। ছিলিমে তামাক ভরে। তারপরে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে অন্য টিলার দিকে চলে…

চতুর্থ টিলায় গিয়ে সন্ধান মিলল, 'ঠিক আছে ভাই, দিন-রাত কাজ করার জন্যে একটা ছোকরা দিতে পারি, আমার ভাগ্নে রয়েছে, কিন্তু মজুরি কী দেবে তুমি?'

'যা বরাবর দিয়ে থাকি তাই দেব, আবার কি?'

'উঁহুঁ! ওভাবে হবে না। চলো অলখা গামেতীর বাড়ি চলো, সে আমাদের দুজনের মধ্যে দর ঠিক করে দেবে।'

কালুও রাজী হয়। দুজনে টিলা থেকে নেমে আসে। পথে আট-দশ বছরের একটা ছেলে গোরু চরাচ্ছিল। কালু নাম জিজ্ঞেস ক'রে তার সঙ্গে কথা ব'লে বাজিয়ে দেখে, 'তোর নাম কী ছোকরা?'

'মঙ্গলিয়া, কিন্তু কেন জানতে চাইছ?'

'আমার বাড়িতে দিন-মজুরের কাজ করবি?'

'হ্যাঁ, মামা পাঠালে নিশ্চয় করব।'

ছেলেটাকে কালুর চালাকচতুর, আর উপযুক্ত মনে হয়।

অলখা গামেতীর বাড়ি বাঁশের দরমার হলেও দেওয়ালে মাটি লেপা ও মেঝেও লেপা-পোঁছা ঝকঝকে। উঠোন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার চলন-বলনে কিছুটা জমিদারি চাল ছিল। উঠোনে ঘোড়া বাঁধা। উঁচু রোয়াকের খুঁটিতে দুটো বন্দুক টাঙানো— অবশ্য পলতে দিয়ে আগুন দেবার পুরোনো গাদা বন্দুক। দু-তিনটে তলোয়ার। আর তীর-ধনুক এত প্রচুর যে জড়ো করলে এক বোঝা হবে।

অলখা গামেতী কালুকে চিনতে পারে, 'আরে আরে, আমার বাল্য ভাইয়ের ছেলে যে? এসো ভাই, এসো!' হাত ধরে তাকে খাটিয়ায় নিয়ে বসায়।

ষাট বছরের বেঁটে খাটো চেহারা তখনো বেশ মজবুত। খালি গায়ে এত লোম যে মনে হয় যেন ফারের কোট পরে আছে। কানেতেও ভোমরা বাসা বাঁধতে পারে এত চুল। পরনে কেবল হাঁটু অবধি খাটো ধুতি, মাথায় দু-তিন ফেরতা দেওয়া দড়ির পাগড়ী।

'জল খাবে নাকি ভাই? ঘড়ায় করে রাখা আছে, বুঝলে।' বুড়ো না বলে দিলেও কালু জানত অলখা গামেতীর বাড়িতে আলাদা ঘড়াতে সব সময়ে জল ভরা থাকে।

'তুই ভাবছিস বুঝি মাটির মটকাই হবে, কিন্তু মাটির নয়, তামার ঘড়া আছে। ওই ওখানে রয়েছে, নিয়ে আসব ঘটিতে করে?' বুড়ো জল খাইয়ে কালুকে আপ্যায়ন করতে চাইছিল। তা ছাড়া উঁচু জাতের লোকে এর থেকে জল খেলে তবেই তো এটা ভরার সার্থকতা।

কালুকে বলতে হয়, 'নিয়ে আসুন তবে, একটু খেয়েই নি।'

তামার ঘড়া শুনতেই কালুর সেই গল্পটা মনে পড়ে যায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের এক বউ কলসী ভেঙে ফেলতে, তাই নিয়ে বউ-শাশুড়ীতে তুলকালাম লেগে যায়। বউ বলে, 'তামার কলসী নিয়ে এলে তো আর কুমোরকে ফসল খেসারৎ দিতে হয় না।' শাশুড়ীও ব্যঙ্গ করে বলে, 'তামার ঘড়া তো কেবল ঐ ভীলেদের গামেতীর বাড়িতে আছে। এবার থেকে সেটা ভরতে যেয়ো।'

গঞ্জনা সইতে না পেরে ধনুকের থেকে তীর ছুটে যাওয়ার মতো বউও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এসেই গামেতীর ঘড়া নিয়ে লেগে পড়ে। প্রথমেই জল খায়, তারপর ঘড়া কলসী তদারকের দায়িত্ব নিজেই নেয়...

গামেতী যথেষ্ট আফসোস করেছিল কিন্তু সেই বা কী করতে পারে—

এই গল্পটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করার কালুর খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু সত্যিই যদি অলখের বাড়িতে এখন সে উপস্থিত থাকে? দ্বিতীয়ত সময় ছিল না। সে কাজের কথাই শুরু করে, 'নিন অলখাকাকা, এবার আপনি খান। এই কনকার ভাগনেকে আমার বাড়িতে কিছুদিন সাগরেদ হিসাবে রাখতে চাই। ফসলের ভাগ মজুরি হিসেবে নিতে তো এ রাজী হচ্ছে না—'

'কেন রে কনকে?'

'না তো বলি নি সর্দার, আমি ভাবছিলাম কী, ফসল আনলে তো আমার বাচ্চারাই খেয়ে শেষ করে দেবে। পয়সা হলে তবু ওর কাছেই থাকবে।'

'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, বল কত নিতে চাস তুই? আচ্ছা আমার ওপরই ছেড়ে দে। এই চন্দ্রমাসের তেসরা কেটে গেছে যখন তা হলে সামনের চন্দ্রমাসের এই কটা দিন তোকে কাজ করে পুরিয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

বাড়তি দিনকটা কাজ করা নিয়ে দরদস্তুর করার পর কনকা লীবা বারোটা শশা গুণে দেখায়, মজুরির টাকার পরিমাণ বোঝাবার জন্যে। গামেতীও সেগুলো গুণে দেখল। তার থেকে দুটো তুলে নিয়ে বাকী দশটা কালুর হাতে তুলে দেয়। 'তোর যদি উচিত বলে মনে না হয় তা হলে তোর নিজের ইচ্ছেমতো আমাকে জবাব দে তুই?'

কালুকে ভাবতে দেখে কনক বলে, 'যদি দিন হিসেবে ধরতে যাও তা হলে দিন-প্রতি তিন পয়সা করে মজুরি ধরলে কত হয়? কি বল গামেতী? কিন্তু এ তো আমি—'

ঠিকই বলেছিস তুই। ফুরন হিসাবে দর করলে দিন আর আলাদা করে ধরা হয় না, নে নে ওঠ।' আবার কালুকে বলে, 'তুই এখনো হিসেব করছিস কিন্তু আমি উচিত দরই বলেছি।'

কালু কিছুটা মাজাঘষা করার পর রাজী হয়ে যায়। দুটো কাপড় দিতেও সম্মত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা হলে ওকে রাখতে কবে আসবে?'

'তুই যখনই বলবি তখনই যাবে, তাই তো রে কনকা ?'

কনকা 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানায়।

কালু বলে, 'আজ দিনটা ভালো— বৃহস্পতিবার। আজই যদি ছেড়ে আসে তো—'

'তা হলে এক কাজ কর না, তুই ছোকরাকে আজ নিয়ে যা। আমি কাল যাব— সকালের দিকে।'

'ঠিক আছে' বলে কালু ও কনকা উঠে পড়ে। অলখা তাদের গাঁয়ের সীমানা অবধি এগিয়ে দেয়।

কনকা মঙ্গলকে কালুর হাতে তুলে দেয়। তার চোখে জল এসে যায়, 'মা-মরা ছেলে ভাই, ওকে কষ্ট—

'কেন, কিসের জন্যে কষ্ট দেব ? খাবে দাবে আর গোরু-বলদ চরিয়ে নিয়ে আসবে। তুই বিন্দুমাত্র চিন্তা করিস না কনকাভাই। তোর যেমন ভাগ্য, আজ থেকে আমারও তেমন ভাগ্য হল, বুঝলি ?' কালু কনকাকে আশ্বাস দিয়ে মঙ্গলকে সাথে নিয়ে রওনা হয়।

কালু মঙ্গলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলে না, সেই তামা হাঁড়ি-কলসীর গল্প মাথায় ঘুরতে থাকে। সে গামেতীকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। জীবন সার্থক হয়ে যায় এমন যদি তার বরাতেও ঘটে। রাজুর মতো কেউ যদি এসে তার বাড়িতে এমনিভাবে— তা হলে সারা তুনিয়ায় হৈচৈ পড়ে যাবে— গল্পকথা হয়ে থাকবে সে ঘটনা…

হুঁশ হতেই কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'কোথায় রাজু আর কোথায় কিসের চিন্তা করছি। তামার ঘড়াই আসলে নেই, তা হলে ? জমুনা পিসীকে আমার জন্মের সময়ে দেওয়ার কথা হয়েছিল এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। মনে কর নাহয় সবচেয়ে আদরের জিনিস বিক্রি করে তামার ঘড়া-কলসী নিয়ে এলাম, তামার ঘড়ার নাম শুনেই যদি আসবার হত তা হলে তো নানিয়াদের বাড়িতে তু-তুটো ঘড়া-কলসী রয়েছে। তবে এই অলখা গামেতীর মতো জমিদারি চাল আছে কি ? কিন্তু ভাই আমার, রাজুকে গঞ্জনা দেবার মতো যখন কেউ নেই, তবে এ-সব আকাশকুসুম রচনা করে আর কি হবে'—

সে মঙ্গলের সাথে কথা বলতে সচেষ্ট হল, 'ঘরে পৌঁছেই লেঙ্গটটা ফেলে দিবি। আমার একটা পুরানো ধুতি দেব আর জামা সেলাই করিয়ে দেব…'

কালু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা নাহয় বন্ধ করে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে কী করতে পারে। সেই একই স্বপ্ন এসে উপস্থিত হয়। ৩০ বছরের পুরোনো তামার ঘড়া-কলসী চকচক করছে। দোহারা, লম্বা, ফর্সা ও উজ্জ্বল আয়ত চোখের অধিকারিণী রাজু যেন মাথা উঁচু করে আসছে, এসেই তাড়াতাড়ি ঘড়া-কলসীর ভার নেয়…

রাজু কুঁয়ো থেকে জল ভরে ঘড়া-কলসী না ধরেই স্থিরভাবে আসতে থাকে। তামার হাড়ি-কলসীতে সূর্যের কিরণ ঝিকিমিকি খেলা করে। চোখে মদির আবেশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে রাজু জবাব দেয় :

'মনে তামবা নে বেড় রেড লাগী !'

(আমার তামার ঘড়া-কলসীর ভীষণ শখ।)

চোখ খুলতেই দেখতে পায় সামনে মঙ্গল মুচকি হাসছে।

কালু ভগবানের রসিকতা ধরতে পেরে হেসে ফেলে। মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকে, 'ভগবান আমার বরাতে যা আছে তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এবার থেকে রোজ এই ভীলের মুখ দেখতে হবে !'

কিন্তু— হায় রে মানুষ, আর তোর আশা ! খাট থেকে নামতে নামতে কালু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করতে থাকে, 'ভীল হলেই বা হয়েছে কি ? মানুষ তো বটে ?…বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে আজ জীবনের প্রথম ঘুম থেকে উঠেই হাসিমুখের চেহারা দেখতে পেলাম। ভোরবেলা উঠেই হাসিমুখ।…আমার অন্তর অকারণ আশা করছে না !…বাবার ঐ ভজনা গানটা মিথ্যে নয়, কালু গানটা মনে করতে চেষ্টা করে :

কোনে ঢং ঢোল্যাং মারাং সুতাং সমাণানে
• ওল্যাং কোনে হড় বেথী সোড় তাণী ?

ঝংখী ঝংখীনে চেতন আতমে পুর্য্যা
তারাং সমাণায়ে সোড়নে সংকেলী।

(কবরের ঢাকনা ধীরে ধীরে সরিয়ে কে আমার ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্নকে জাগিয়ে ধীরে ধীরে টেনে তুললে ?···কামনা করতে করতেই আত্মার চৈতন্যোদয় হয়েছে, তোর স্বপ্নই তোকে জাগিয়েছে।)

কালু তার মনকে প্রবোধ দিতে থাকে, 'তোর স্বপ্নও একদিন আড়মোড়া ভেঙে জাগবে। কবরের ঢাকা সরিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। আজকাল যে-সব স্বপ্ন দেখছিস তা সত্যি হবে একদিন। তোর স্বপ্নের রাজু সত্যি সত্যিই সেদিন বলবে, 'আমার তামার ঘড়া-কলসীর ভীষণ শখ···' মনের মধ্যে এই কথাটা সত্যি বলে রেখাপাত যাতে না করতে পারে তাই কালু হেসে সেটা মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে, লোকদের ও এইভাবে বলবেই তো ? নইলে কখনো কি বলা যায় নাকি যে 'দুজনেই প্রেম-ভালোবাসার জন্যে—' ক্রমশ কালুর হৃদয়ে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা খুশির আবেশ ছড়িয়ে পড়ে··· খাট থেকে নামতে নামতে স্বপ্নে বলা রাজুর কথাটা গদ্যের বদলে কবিতায় গেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে,

মনে তাংবানে বেড়ে রেড় লাগী,
রেড় লাগী রে রেড় লাগী—
মনে মননে মেড়াপে রেড় লাগী !

(আমার তামার ঘড়া-কলসী ভীষণ পছন্দ, তামার ঘড়া-কলসীর প্রেমে পড়ে গেছি, বড়ো গভীর প্রেম— আমার মনের মানুষকে ভালোবাসতে বড়ো ইচ্ছে হয় !)

॥ উনত্রিশ ॥

মন ময়ূরী

'গড় ড় ড়…গড় ড় ড় ড়…' গীর পাহাড়ে সিংহ যেন গর্জন করতে থাকে— উত্তরের দিকে মেঘের ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে যায়, যেন তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে কোনো ভয়ংকর আলোড়ন চলছে।

কালু কোদর প্রভৃতি প্রত্যেক কিষানের হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। সকলেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে বার বার চেয়ে দেখতে থাকে আকাশের দিকে। কেউ বলে, 'মেঘ ছুটছে যখন, আজ নিশ্চয় বৃষ্টি হবে।' রামা তো ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে, 'আহাহা, কেমন মেঘ দৌড়চ্ছে দেখো, কী সুন্দর দৌড়চ্ছে! এতদিনের নিঝুম আকাশ যেন কথা বলছে।'

সত্যিই মেঘের দল ছুটে আসছিল, যেন বাড়িতে বাচ্চা কাঁদছে শুনতে পেয়ে মাথায় জল নিয়ে মা যেমন দৌড়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবেই তারা আসছে।

দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়। কড় কড় করে মেঘ ডাকতে থাকে আর বিদ্যুৎ যেন সূর্যকে নালিশ জানায়, 'একদিন অন্তত পৃথিবীকে তুমি আমার মতো এইরকম আলোকিত করে দাও!'

ততক্ষণে মেঘেরাও 'জলকে চল' বউকে বিদ্রূপ করতে থাকে, 'ঘরের চালের নীচে উঠোনে খালি বাসন রেখে দেখ কতক্ষণে তা ভরে দিতে পারি!'

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এসে যায়। টিলার ওপর থেকে বন্যার মতো তোড়ে জলের ধারা নেমে আসে। আর মাঠ-ময়দান তো কালু যেমন বলে, 'এমনি ভাবে আর কিছুক্ষণ যদি বৃষ্টি হতে থাকে তো নদী নালা মাঠ ঘাট সব একাকার হয়ে যাবে।'

সেই রকমই হয়তো হত কিন্তু পৃথিবী গত আট মাস ধরে তৃষ্ণার্ত

ছিল, জলের জন্যে ছটফট করছিল, আর তার পেটটাও তো ছোটো-খাটো নয়! গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের ধারা আশ-পাশের ক্ষেতের পক্ষে খুব একটা বেশি ছিল না।

আর বরুণদেব যদি কেবল এক জায়গাকেই তৃপ্ত করতে এমনি থেমে যায় তা হলে অন্য সব জায়গার কি হবে? এই তো সবে প্রথম পরিবেশন করা হল। তা ছাড়া ভীষণ তৃষার্তকে এক সাথে সব জল খাইয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কথা নয়, তাই যেন ক্ষেপা ষাঁড়ের মতোই মেঘের দল পল্লী থেকে ছুটে দক্ষিণের দিকে বেরিয়ে যায়।

চাষারা আবার কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়ে। কেউ লাঙলের ফলা ঠিক করানোর জন্যে কামারের কাছে গেল, আবার কেউ কেউ লাঙল ঠিক করাতে ছুতোরের কাছে। কেউ বীজ জোগাড় করতে যায় তো কেউ লাঙলে বাঁধবার লাল সুতোর জন্যে বেনের দোকানের দিকে যায়।

ওদিকে শিবা নাপিত পাড়ায় পাড়ায় হাঁক পেড়ে সকলকে নেমন্তন্ন করতে থাকে, 'মোড়ল তার বাড়িতে ডাকছে···সকলে যেয়ো সেখানে।'

ইচ্ছা না থাকলেও কালু আজ এই প্রথম বর্ষার দিনে মোড়লের সঙ্গে আর ঝগড়ার আমল দেয় না, 'আমি তো আর খেতে বসব না, গাঁয়ের অন্য সকলের সাথে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ফিরে আসব।'

ভাড়ার থেকে ভুট্টার দানা বার করতে করতে ভলী নিজের মনে গজগজ করতে থাকে, 'তুমি সার তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে যাও নি, সে নাহয় ঠিক আছে কিন্তু বীজও কি পৌঁছে দিতে যাবে না।'

'নিজেদের গরজ থাকলে নিয়ে যাবেখন।' কালু মাথায় পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে বলে।

'এতদিন তো ছুটতে ছুটতে যেতে আর এই দিন-পনেরো তোমার কী হয়েছে বলো তো? নাকি আমি সেদিন ঐ কথা বলেছিলাম বলে?

'তাও যদি হয় তবে দোষটা কোথায় ? কিন্তু বীজটা তো দিয়ে এসো। সেই গরমের সময় ওরা বলে রেখেছিল আর এখন—'

'এসে নিয়ে যাক। তাদের পায়ে তো আর পোকা পড়ে নি। নইলে তুই যা। এখানের কাজের জন্যে তো আমি আর মঙ্গল দুজনে রয়েছি—' মঙ্গল বলদদের ঘাস দিচ্ছিল, তাকে হাঁক দিয়ে বলে, 'কি বলিস মঙ্গল ?' আবার বউকে বলে, 'আর মঙ্গলিয়াকে নিয়ে যেতে চাস তো নিয়ে যা। আমি একলা ঠিক আছি।' কালু কথা শেষ করে হুঁকো সাজতে বসে।

'তুমি গেলে আজকেই ফিরে আসতে পারতে। লাঙল দেবার পক্ষে আজকের দিনটা ভালো নয়, বলেই বলেছিলাম—'

'না ভাই, না ; আমার অনেক কাজ আছে আর তুইও যখন যাবি না তখন ওদের দরকার থাকলেও এসে নিয়ে যাবেখন।' এই বলে কালু বেরিয়ে যায়।

কালু ভেবেছিল যে রাজুই হয়তো তার বড়োজাকে নিয়ে বীজ নিতে আসবে। পরের দিনও চলে গেল কেউ এল না। 'বড্ড গুমরওলা মেয়েমানুষ তো', কালু মনে মনে চটে ওঠে। ওদিকে ভিতরে ভিতরে কাতর হয়ে পড়ছিল। 'নিজেদের জেদ রাখতে হয়তো ঘাসের দানাই চাষ করবে। গাঁয়ে তো একসের বীজ ধার দেবার মতো কেউ নেই···তার চেয়ে বরঞ্চ আমি দিয়ে এলেই ভালো ছিল।'

এখন আর কালুর ছুটি নেবার উপায় ছিল না। যদিও মঙ্গল রয়েছে কিন্তু সে ভুট্টার চাষ করতে পারলে নাহয় কথা ছিল। পারলেও কালুর মতো ভালো করে কি পারবে ! কালু এক লাঙলে দেড়া কাজ করতে পারে।

এমন বর্ষার দিনে কালুর পায়ে যেন বেশি ক্ষমতা আসে। গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। ধুতিও উঁচু করে পরেছে আর মাথার পাগড়ী গত বছরে পোঁতা আম গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মেঘের আড়ালে ঢেকে থাকা সূর্য যেন বেশি ক্ষেপে উঠছিল। এই ভ্যাপসা

গরম রোদের থেকেও বেশি অসহ্য লাগছিল। কিন্তু তা নিয়ে তার কোনো চিন্তা বা খেয়ালও ছিল না। তার তখন একটাই চিন্তা মাথায় ঘুরছিল, 'এখানে এই ভুট্টা বুনে দেবার পর কুয়োর পাশের ক্ষেতেও বুনতে হবে, কাল ওটাকে শেষ করে নিয়ে এই ক্ষেতটাকে আড়াআড়ি লাঙল দিয়ে চষে নেব।'

সকলেই দুপুরের দিকে জমি চষা ক্ষান্ত করে, কেবল কালু তখনো কাজ বন্ধ করে নি। তার নজর দূরে গ্রামের রাস্তার দিকে ছিল। 'জলখাবার নিয়ে আসতে দেখলে তবে বন্ধ করব।'

হঠাৎ কালুর দৃষ্টি সতর্ক হয়ে ওঠে, 'কমলার কোয়ার মতো বড়ো চোখ দুটো তার ছোটো হয়ে আসে। বলে ওঠে, 'রাজু? উঁ হুঁ! ও কোত্থেকে আসবে? আর এলেও ওর ভাইয়ের লাঙল তো কুয়োর ওদিককার মাঠে চলছে।...কিন্তু না, রাজুই তো দেখছি। সেই ভঙ্গী, সরু কোমর আর সেই চলার ছন্দ! বিশ্বাসই হয় না ও যে আমার জলখাবার নিয়েই আসছে।'

কালুর বিস্ময় বেড়ে যায়, 'কী বাজে বকছি আমি? হাজার কাজ থাকলেও ভলী কি বলে রাজুকে দিয়ে জলখাবার পাঠালে? এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।'

সে লাঙল চালানো বন্ধ করে। বলদ দুটোকে মাঠের ধারে বটগাছের নীচে নিয়ে যায়। রাজুও ততক্ষণে এসে পৌঁছয়। কালুর অন্তর যেন নেচে ওঠে। এমনিতে অবশ্য রাজুর হাতে জলখাবার সে অনেকদিনই খেয়েছে, কিন্তু সেটা শ্বশুরবাড়িতে। এখানে এই নিজের বাড়িতে, তাও আবার নানিয়ার চোখের সামনে (নানার লাঙল সেসময়ে পাশের ক্ষেতেই চলছিল)! কালুর অনেক দিনের অপূর্ণ বাসনা যেন পূর্ণ হয়। সুদের সঙ্গে উপরি হিসেবে প্রতিশোধের সুযোগও যেন সে পেয়ে যায়।

ওপাশে কিছু দূরে মঙ্গল বাঁশি বাজাচ্ছিল। কালুতাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলদদের ঘাস দিতে বলে।

মঙ্গল ঘাস দিতে দিতে বারবার রাজুকে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

সে মুখে কিছু না বললেও রাজুই আগে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই ছোকরা, আমার দিকে অমন জুল জুল করে তাকাচ্ছিস কেন রে?'

রাজুকে হাসতে দেখে মঙ্গলও হেসে ফেলে, 'না এমনি···আমি ভাবছিলাম ভলী মাসী কোথায় গেল?'

'তা ভলী মাসীর বদলে আমি এসেছি বলে কি দোষ হয়েছে?'

জীবনে এই প্রথম কালু মনের কথা খুলে বলে 'বলে দে না মঙ্গল, একদিন তো ভারি এসেছ, এতে কীই বা আর সুখ হবে?' আর রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'পেটেতে ক্ষিধে রয়েছে দুটো রুটির মতন অথচ খেতে জুটছে না এক টুকরোও রুটি। এ তো দেখছি মনের জ্বালা আরো বাড়ার মতো কথাবার্তা।'

'খাবার থাকতেও যদি কেউ ক্ষিধে নিয়ে পড়ে থাকে তার কে কী করতে পারে?' রাজু মঙ্গলের জন্যে শালপাতার দোনায় ডাল দিয়ে তাকে বলে, 'এই ছোকরা, নিয়ে যা।'

'পেট তো ঐ···' মাথার ওপরে বটগাছের ডালে বসে থাকা কাককে দেখিয়ে কালু বলে, 'কাকেরাও ভরাচ্ছে, রাজু!'

'তা হলে তোমার আবার আরো কী চাই?' মঙ্গলের মেলে ধরা জামার কোঁচরে রুটি ফেলে দিতে দিতে রাজু বলে।

মঙ্গল তার রুটি দুটো মাথায় উপুড় করে রেখে ডালের দোনাটা নিয়ে এই ঘনঘোর বটগাছের অন্য পাশে চলে যায়।

কালু বলে, 'ভগবান জানেন ঠিক কী চাই, তবে এটুকু জানি যে তৃপ্তি পাই না কিছুতেই। জন্মে অবধি অভুক্ত রয়েছি, আর বোধ হয় অভুক্তই থেকে যাব।'

'নাও হাত ধুয়ে খাওয়া শুরু করো তো, দেখি পেট কেমন করে না ভরে।' কালুর বিষণ্ণ করুণ চেহারা দেখে রাজুকে আবার বলতে হল, 'কখনো তো কিছু বলো নি, আজ এ-সব কথা কেন ভাবছ আবার?'

'ভাবছি অনেক দিন থেকেই রাজু, সেই যখন ছোটো ছিলুম তখন থেকেই! আজই প্রথম তোর কাছে মনের ছবিটা খুলে ধরছি।'

'এতদিন সে ছবি যখন বন্ধ রাখা ছিল তখন বন্ধ রেখে দেওয়াই ভালো নয় কি ?' রাজু হাসছিল বটে কিন্তু তার গলার স্বর আর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারা যায় যে সেও কালুর থেকে কম দুঃখী নয়।

কালু আপন মনে কথা বলতে বলতে হাত ধুতে যায়।

'এটা তো বুঝতে পারো যে এ ছবি খোলা উচিত ছিল না।' ক্রমশ রাজুর ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত মুখ ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকে।

'খুললেই বা কি ক্ষতি হল ? সত্যি করে বল তো রাজু, তোর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে না ?...কোদর ও আমরা সবাই এই বটগাছের নীচে খেলা করতাম। তুই রুটি তৈরি করতিস আর আমি লাঙল চালাতাম। তুই জলখাবার নিয়ে আসতিস কিন্তু তরকারী আনতে ভুলে যেতিস আর আমি তোকে মারতে ছুটতাম। তুই জল ভরে আনতিস আমি তোর মাথা থেকে ঘড়া নামিয়ে নিতাম ; মনে আছে তোর সেই-সব কথা ?'

রাজু দাঁড়িয়ে ছিল, আঁচলের মধ্যে হাত জড়িয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে ভিজে নরম মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চোখ না তুলে রাজু ঘাড় নাড়িয়ে জানায়, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

কালু বলতে থাকে, যখনই এই বর্ষাকাল আসে আমার সেই-সব স্মৃতি ঠিক মনে পড়ে যায়···তুই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবি না। কিন্তু আমি সে সময়ে তোর পায়ের ছোটো ছোটো ছাপ পর্যন্ত মাটিতে দেখতে পাই। তোর ঐ লম্বা-ঘের-দেওয়া ঘাগড়া আর অন্য সব-কিছুই আমার সামনে ভেসে ওঠে....মনে মনে ভীষণভাবে কামনা করতাম ঐ ছোটো হয়েই থাকতে পারতাম যদি ! ভগবান আমাকে যদি বড়ো না করতেন তা হলে....

রাজু স্বগত বলে, 'আমার আর সে ভাগ্য কোথায় যে তোমার জলখাবার আনব !' ডালের বাটিটা কাছে সরিয়ে এনে বলে, 'নাও খেয়ে নাও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'না··· ! একবার তুই আগে বল যে তোর সেই ছেলেবেলার কথা

মনে পড়ে কিনা…'

'মনে করেই-বা….' রাজু কালুর দিকে নিরুপায় কিন্তু স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'কি করব ! আমার এখনকার এই দিনগুলো বয়সের বাধা ডিঙিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে যায়, সেই আগের মতো খেলায় মেতে ওঠে। আমি তোমার জন্যে রান্না করি, জল ভরে আনি— সব-কিছু করি, কিন্তু আজ আর করার কোনো উপায় নেই ! নদীর স্রোতে যদি একটা কাঠ ভেসে যেতে থাকে তা হলে দৌড়তে দৌড়তে সাগরের মোহানায় পৌঁছেও তাকে চেষ্টা করলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিন্তু এ তো—' সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'চলে-যাওয়া-দিন যদি ফিরে আসত তা হলে তো মানুষের সুখের কোনো সীমা থাকত না ! নাও লক্ষ্মীটি খেতে শুরু করো এবার।'

কালু ডালের বাটি আর রুটি হাতে তুলে নিতে নিতে ম্লান হেসে বলে, 'আজ ক্ষিদে একদম মরে গেছে, রাজু।'

'আমি এসে তোমার ক্ষিদে নষ্ট করলাম, এতে কী লাভ হল ? আগে বুঝতে পারলে ভলী বোনকেই পাঠিয়ে দিতাম !'

'আমার দুর্ভাগ্যে সে তো লেখা আছেই—'

'বলো যে সৌভাগ্যে রয়েছে, হৃদয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। যে ঘাসের দানা দুর্ভিক্ষের দিনে কাজে লাগল তাকে হেনেস্তা কি কখনো করা উচিত ?'

'হেনেস্তা না করলেও ঘাসের দানাকে তো আর গম বলা যাবে না,' বলে কালু মুখে রুটির একটা বড়ো টুকরো পুরল।

'আমাদের কাছে সেটাই গমের সমান। বোঝদার হয়েও কেন তুমি এটা ভুলে যাচ্ছ, কালু ?'

ভালো করে না চিবিয়েই রুটির টুকরোটা গলা দিয়ে নাবাতে নাবাতে কালু মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহুঁ ! খাওয়া আর পেট-ভরানো এদুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে, রাজু…তুই বল্ পার্থক্য নেই কি ?'

দূরের নদীতীরের গাছের সারির দিকে তাকিয়ে থেকে রাজু শুধু

বলে, 'আছে।'

'তুই কি মনে করিস যে আমরা এই কি বাঁচার মতো বেঁচে আছি?'

'সকলেই বেঁচে আছে, আমরাও তেমনি বেঁচে আছি।' সে বলতে থাকে, 'সকলের জীবনেই কি আর আনন্দে ময়ূর নৃত্য করে?'

ডালে রুটি মাখতে মাখতে কালু বলে, 'কিন্তু আমাদের জীবন যদি একসাথে মিলতে পারত তা হলে সত্যি সত্যি বলছি রাজু, সারা দিন-রাত ময়ূর নাচতে থাকত!'

'সে তোমার এখন মনে হচ্ছে।' হেসে সে বলে, 'রাজু যদি তোমার বিয়ে-করা-বউ হত তা হলে সেও আর-পাঁচজনের মতোই সাদামাটা সাধারণ লাগত। দুনিয়ার নিয়মই যে তাই।'

'না না রাজু।'

'আমার চোখের দেখা ঘটনা। পেথা মোড়লের মেয়ে লখুড়ীর তো ছগনকে না দেখতে পেলে সকাল হত না, আর ছগনের কাছে লখুড়ীর চোখেই যেন সব আলো। ওরা দুজনে যে প্রেম-ভালোবাসা দেখিয়েছে এ তল্লাটের কেউ তেমনটি দেখাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত বাপের মান-সম্ভ্রম ডুবিয়ে দুজনে পালিয়ে বিয়ে করলে···কিন্তু বারো মাস কাটতে না কাটতেই সেই আলোর দীপ্তি গল্পকথা হয়ে যায় আর ময়ূরেও নাচা বন্ধ করে। সেই ঝগড়া আর মারামারি। এখন তো সে লখুড়ীকে রোজ ধরে মারে···দাও ডালের বাটিটা দাও, আমি এবারে যাই নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

বীজ কতটা নিয়ে যেতে হবে, কোন্ কোন্ জমিতে চাষ হবে, কে কে এসেছে সঙ্গে এবং স্বামী-স্ত্রী কাল কেন আসে নি, ইত্যাদি খবর নেবার পর কালু রাজুকে বিদায় দিতে দিতে বলে, 'আমি এখন আর বারবার তোর বাড়ি যাব না কিন্তু কাজের কোনো অসুবিধে হলেই আমাকে খবর পাঠাস।'

'রেগে গেছ, তাই না?' বলে রাজু আড় চোখে তাকায়।

'তুই কী করে জানবি যে আমার যেতে—'

'ভলী বোন আমাকে সব কথাই খুলে বলেছে , ওর ও-সব কথাতে তুমি কান না দিলেই ভালো করতে। আমার কাছে হাত জোড় করে অনেক কান্নাকাটি করেছে। বলছিল যে নিজের বাপের বাড়ির ক্ষতি আমি নিজে করছি। এমনি দেখো তো ও একটু বেশি বকে বটে, মনে যা আসে তাই বলে দেয়; আর পরে আপসোস করে।.... বলো, এবার কবে আসছ তা হলে?' বাটি আর পুঁটলি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাজু জিজ্ঞেস করে?

'ভুট্টার গাছে ভুট্টা দেখা দিলে!' কালু বিদায় দিতে উঠে দাঁড়ায়।

রাজু হেসে ফেলে, 'ভুট্টার বীজ এখনো ঝুড়িতে পড়ে আছে আর তুমি বলছ যে—'

'কেন যেতে বলছিস রাজু! মিথ্যে মিথ্যে লোকেদের কথা রটাতে দিয়ে কি লাভ? এই ভালো, কখনো যদি দুজনের আবার দেখা হয় তো এমনি ভাবেই আজকের মতো দুটো কথা বলে মনের ভার কম হবে, নইলে এ জীবনে তৃষ্ণা তো কোনোদিনই মেটবার নয়!'

'সেটাই মেনে নাও-না তা হলে!' রাজুর সারা মুখে আবার গভীর বিষাদ ছেয়ে যায়। একহাতে ডালের বাটি আর অন্য হাতে পুঁটলি নিয়ে পা দিয়ে আবার সে মাটি খুঁটতে থাকে। তারপর যেন নিজেকে নিজে বলে, 'মন ময়ূরীকে মনেতেই খেলাতে হবে আর এইভাবেই জীবনের দিন পুরো করতে হবে!'

কালুও স্বগত বলে, 'আর এই কল্পনার ময়ূর এবং কল্পনার জীবনই আমাদের সত্য জীবন! সেখানে কেউ আসে না পাকা দেখার সম্পর্ক ভেঙে দিতে কিংবা মিথ্যে বদনাম দিতে, ঘরের বউ সেখানে ঈর্ষা করে না আর—' কালু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চেয়ে বলে, 'তুইও সেখানে এমনি এক মুহূর্ত থেকে চলে যাস না।'

এদের দুজনের দুটো হৃদয় আর আত্মা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে··· এই অল্পক্ষণের নীরবতায় তারা যেন যুগযুগান্তরের কথা বলে নেয়। হৃদয় দুটি পরস্পর মিলিত হয়েছিল, এখন আলাদা হওয়াতে কাঁদতে শুরু করেছে। দুজনেরই চোখ দিয়ে জল ঝরে

পড়তে থাকে ট···প···ট···প।

রাজু চোখের জল চেপে হাসতে চেষ্টা করে। তার রক্তিম ঠোঁট দিয়ে কথা ঝরে পড়তে থাকে। 'পেটের ক্ষিদের তৃপ্তি হয় তো হয় কিন্তু মনের তৃষ্ণার—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে রাজু কালুর কমলালেবুর কোয়ার মতো আয়ত দুটি চোখের গভীরে তাকিয়ে দেখতে থাকে। রাজুর উজ্জ্বল চোখের পল্লব দুটি যেন বৃষ্টিতে ভেজা গাছের পাতার মতোই আর্দ্র হয়ে যায়।

'কথাটা ঠিক বলেছিস।' গভীর নিশ্বাস নিয়ে কালু বলে,—'আমার বাবা বলত, পেট ভরার কথা শুনেছি কিন্তু হৃদয় ভরেছে বলে কখনো শুনি নি।' তারপর যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'যা তুই···তোর আবার দেরি হয়ে যাবে।'

রাজু অবশ পা দুটো উঠিয়ে পেছন ফেরে। কালুও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু সে যেন তখনো সেই সুখস্বপ্নেই নিমগ্ন ছিল, 'কল্পনার ময়ূরীকে কল্পনাতেই খেলাতে হবে আর এভাবেই জীবনের বাকী দিন কটা কাটিয়ে দিতে হবে।'

॥ তিরিশ ॥

জীবন-মরণের শেষ বাসনা

পাঁচ দিনের মধ্যেই এতদিনের পড়ে থাকা জমি আবার সবুজ হয়ে যায়। যুবতী বয়সে প্রবেশ করার সময় কিশোরী কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তার দেহতটে যেমন যৌবন প্রকাশিত হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি ধরিত্রীর অণুতে অণুতে যৌবন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে গাছপালা গাঢ় সবুজ রঙ ধারণ করে আর ওধারে শাল-সেগুনের ছায়ায় পনেরো দিনের মধ্যেই মাতাল হয়ে ওঠে। পাহাড় আকাশী রঙ মেখে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় যেন।

ভুট্টা গাছের চারাগুলো এক বিঘৎ খানেক হয়ে বাতাসে নাচতে থাকে; ঘাসের দানা, ডাল ইত্যাদি ফসল বোনার কাজ চলতে থাকে। কিষাণরা আবার একবার ভুট্টার ক্ষেতে লাঙল দিয়ে দেয়। তাতে ঘাস ও আগাছা মাটির সাথে মিশে যায়। এলোমেলো হয়ে পড়া ভুট্টার চারা এক দু-দিন সামান্য শুকিয়ে আসতে আসতে আগের থেকে দ্বিগুণ বেগে বাড়তে থাকে। কালু তার ক্ষেতের জমি এমনি-ভাবে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল যে মনে হতে থাকে বিঘৎ বিঘৎ দূরে আমগাছের চারা বোনা হয়েছে।

রাজুর বাড়ি থেকে দু-তিনবার খবর আসে যে, 'কালুকে বোলো সে যেন একবার আসে।'

কিন্তু কালু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল, 'ভুট্টার শীষ এলে তবেই যাব।' ক্ষেতের কাজের থেকে ছুটি হলে, রামা কোদরদের বলে, 'এখন যদি একবার বৃষ্টি হয়ে মাঠে জল জমে তো ধান বুনে দেব।'

'তুই ক্ষেতের বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় আছিস কিন্তু এবারে বর্ষার জন্যে আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে যদি ঘাড় ব্যথা না হয়ে যায় তো তখন মনে রাখিস মঙ্গলা কী বলেছিল। ভুট্টার চারা একেবারে শুকিয়ে ছাড়বে।'

রামা কিন্তু উল্টো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল, 'আরে শ্রাবণ যেমন জেঁকে বসেছে এ যদি ভুট্টার ক্ষেত ভাসিয়ে না দেয় তো কী বলেছি। গ্রাম ডুবিয়ে দেবে, ভালো মজবুত ঘরের চালা পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সব উল্টে পাল্টে দেবে। ডাঙা জলে ডুবে গিয়ে মাঠ ঘাট সব একাকার করে ছাড়বে।'

কালু হেসে ফেলত, 'আরে রাখ তো এ-সব কথা ; তোমরা সব খুব মাতব্বর হয়ে উঠেছ দেখছি। আমার বাবা বলত 'মৃত্যু, আকাশ আর পেটের বাচ্চার বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না আর কখনো বলাও সম্ভব নয়'।'

হলও ঠিক সেই রকম, বড়ো বড়ো মাতব্বরদের সব ধারণা হয়ে যেতে থাকে, খারিজ হতে থাকে, 'পঞ্চমী তো কেটে গেল, একাদশীতে বৃষ্টি নিশ্চয় হবে···পূর্ণিমাতে বৃষ্টি না হলে ওর বাবার সাধ্যি কী যে নিষ্কৃতি পায়...গোকুল অষ্টমী যদি বিনা বৃষ্টিতে কাটে তো গোঁফ মুড়িয়ে ফেলে দেব—'

একজন তো কালুকে শুনিয়ে দেয়, 'গোঁফ তো অনেকেই মুড়িয়ে ফেলবে কিন্তু মুড়োবার জন্যে ভিজোবার মতো জল পেলে তবে তো ? এখন থেকেই নদীতে হনুমান দৌড়াদোড়ি করছে। আর কুয়োতে ভূতেরা নৃত্য করছে। খাবার জন্যেই জল পাওয়া যাবে না তো দাড়ি কামাবার জলের কথা ওঠে কী করে ?'

অবস্থা সত্যি সেই রকম হয়ে দাঁড়ায়। মাথার ওপরে আকাশে মেঘের যাওয়া-আসা না থাকলে কেউ বলত না এটা বর্ষাকাল। ঘাসের দানা, ডাল এবং অন্য ফসলের বীজ যা বোনা হয়েছিল তা মাটির মধ্যেই থেকে যায়। যেটুকু হয়তো কোনোমতে হয়েছিল তা গোরু-বলদের পেটে গেল। ক্রমশ শুকিয়ে কালি হতে থাকা ভুট্টার চারাগুলো দেখে মনে হয় ক্ষেতে যেন কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। বাতাসের সাথে হেলেদুলে যে-সব পাতাগুলো কথা বলত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত কিশোরীর ক্লান্ত হাতের মতো এখন তারা এলিয়ে পড়েছে।

ভুট্টার দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কিষাণেরা বারবার ঘাড়

ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে মেঘের ছুটোছুটি, আসা-যাওয়া সকলকে প্রলুব্ধ করে তোলে। কালুর তো অনেকবার মনে হচ্ছিল, 'এই এত জল চলে যাচ্ছে আর তার (ভগবানের) কী আমাদের ওপরে একটুও দয়া হচ্ছে না ?....'

একবার সে বলে, 'কেউ আমাকে একটা লম্বা বর্শা দেয় যদি ?'

'কী করবি তুই বর্শা নিয়ে ?' কোদর জিজ্ঞেস করে।

'আকাশটাকে ফুটো করে দিতুম।'

তারা সকলেই হেসে ওঠে। রামা বলে, 'আকাশকে যদি অত সহজে ফুটো করা যেত তা হলে ভলী বউদি ভোরবেলা মুরগী ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই কুয়োতলায় গিয়ে রাস্তা দেখতে কি আর দাঁড়িয়ে থাকত ?'

একলা শুধু ভলী নয়, প্রায় গাঁয়ের অর্ধেক লোক— বিশেষ করে একলা-দোকলা আছে যারা, মুরগীর দ্বিতীয় ডাকের সাথে সাথেই গাঁয়ের তোরণের ধারের কুয়োতে চার-পাঁচ জন শীর্ণ বিমর্ষ লোকের সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হয়। তামার ঘড়া-কলসী যাদের আছে— শংকরদা, নানা প্রভৃতি তিন-চার ঘরের স্ত্রীদের খাতির কিছুটা বেড়ে যায়, 'বোন, আমাকে একবারটি জল তুলতে দিন না !···দিন দিন, আপনার ঘড়া-কলসী আমি ভরে দিচ্ছি···'

গাঁয়ে অন্য আর-একটা কুয়ো ছিল। কিন্তু সেটা খুব দূরে, একেবারে সেই নদীর ধারে। তাও আবার সেটা এত গভীর যে অনেকেই তার চেয়ে নদীতে গর্ত করে জল ছেঁচে তোলা পছন্দ করত।

ভাদ্র মাস অবধি লোকেরা বৃষ্টির আশা ছাড়ে নি। অবশ্য ক্ষেতের ভুট্টা ততদিন গোরু-বলদের পেটে চলে গিয়েছিল কিন্তু তবু তো ঘাস-টাস কিছুটা হলে জানোয়ারগুলো অন্তত খেয়ে বাঁচতে পারবে।

কিন্তু কোথায়ই-বা ঘাস আর কোথায় তার কী ? কালু বলে ওঠে, 'শ্রাবণই যখন শূন্য গেল তখন ভাদ্র আর কতটা কী ভরে দেবে।'

আশ্বিন মাসে আকাশ একেবারে খালি হয়ে যায়, যেন কেউ ঝেড়ে-

মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে।

দেওয়ালীর উৎসবও শূন্য যায়। না কেউ পটকা নিয়ে আসে, না আনে ফুলতোলা কুঁচি দেওয়া জামা। গোরু-দৌড়নোর প্রতিযোগিতা হয় বটে, ছোটো ছেলেরা মিলে করে আর তোরণে পৌঁছনোর পর গান অথবা ছড়া গায় না কেউ। সকলেই চুপচাপ যেন শ্মশানে এসে বসেছে। ঘাস, গাছড়া, পাতা কিছু কিছু তখনো পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু অনাগত দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়ে যেতে গোরুদের পায়ের জোর কমে গেছে।

এ-বছরে নববর্ষের দিন মহুয়া গাছের তলায় আলিঙ্গনের ধুম পড়ে যায়। স্ত্রীরা ছাড়া পুরুষেরা ছোটো বড়ো সকলেই যোগ দিয়েছিল। তবে গান গাইতে কিংবা আমোদ-আহ্লাদ করতে নয়। শেষবারের মতো দেখা করতে এসেছিল সকলে। শংকরদা বলে ওঠে, 'কে জানে আমাদের মধ্যে কজন বেঁচে থাকবে আর কজন মরে যাবে। হয়তো আমরা সকলেই মরে যাব তাই, ভাই, একটু শুধু বলতে চাই, যে বেঁচে থাকবে সে যেন গত বছর যারা মরে গেছে তাদের কথা একটু চিন্তা করে, আর—'

তার গলার স্বর ভেঙে আসে, কথাটা শেষ করতে পারে না।··· সকলেই একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন ক'রে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যেন শেষ বিদায় নিচ্ছে।

গাঁয়ে ফেরার পথে কেবল যুবকেরাই নয়, রণছোড় এবং শংকরদার মতো বুড়ো আর বেচারা রামার সাত বছরের ছেলে পর্যন্ত দোঁহা গাইতে শুরু করে:

'জীবো জাগো! তো রাবনাং বেসাড় জী
পেলা মুয়লানা ছেল্লা ঝবার!'

(বেঁচে থাকো যদি আবার গানের আসর বসিয়ো, মৃত্যুপথ-যাত্রীদের এটাই শেষ বাসনা।)

কে বলবে যে তারা গান গাইছিল। শংকরদা-কাসমের চোখ থেকে জলের ধারা বইছিল। কালু ও ভগার মতো কঠিন হৃদয় যুবকদের

গলার স্বরও আর্দ্র। রামা যে মরতে মরতেও ঠাট্টা ব্যঙ্গ না করে থাকতে পারত না, সেও আজ কেমন অবশ হয়ে পড়েছে। গাঁয়ে পৌঁছে যখন সকলেই একে একে বাড়ি চলে যেতে শুরু করেছে তখন সে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানায়, 'ভগা, কোদর তোরা খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার বাড়িতে আসিস। যা হবার তাই হবে! শেষবার তো একসাথে গান গেয়ে নিই।'

গাঁয়ের লোকেরা দলে দলে প্রত্যেক বাড়িতে যায়। ক্রন্দনরত আর্দ্র হৃদয়ে জীবনের শেষ বিদায় দেওয়া-নেওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে দেখা করতে থাকে।

জমিদার আসে কিন্তু খাজনার কথা সে উচ্চারণ পর্যন্ত করে না। বাড়ি বাড়ি খাবার নেমন্তন্ন করতে দেয় না। দরবার বসে অবশ্য। আফিম গোলা হয় কিন্তু আদর-আপ্যায়ন তেমন বিশেষ-কিছু আর প্রকাশ পায় না। সে-সব পাট দরবার বসার আগেই চুকেবুকে গিয়েছিল। জমিদার তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে বসার আগে বলে, 'আমি তো মনে করি এই দুর্ভিক্ষ আসাতে আমার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। বেঁচে থাকো যদি শুনবে কোনোদিন যে জমিদারের ডাকাতের হাতে মৃত্যু হয়েছে।' গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলে, 'কিন্তু কীই-বা করব? আমার ক্ষমতা কম। তোমরা সবাই সংসারী লোক; কীই-বা সাহায্য করব? তবুও এ কথা বলব যে যতদিন সম্ভব সকলে গ্রামেতেই টিকে থাকার চেষ্টা কোরো; না পারলে 'শেরপুর' চলে এসো, কিছু দানা আর দু-চারটে করে গোরু-বলদ নিয়ে। সেখানে তোমাদের চুলের ডগা পর্যন্ত টেরা হতে দেব না।' রেকাবে পা দিয়ে বলে, 'যতদিন আমি আর আমার ঘোড়া বেঁচে থাকবে অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিক থাকবে। ঠিক আছে, নমস্কার ভাই-সব।'

'নমস্কার, বাপুজী।' পঞ্চাশ-ষাট জন সমস্বরে বলে ওঠে, যেন ভ্রমর গুঞ্জন করে ওঠে। গমনোদ্যত জমিদারকে রণছোড়, কাসম বলে, 'বাপুজী, আমাদের খোঁজ-খবর একটু রাখবেন··· । আপনার নিজের

দিকেও খেয়াল রাখবেন বাপুজী।'

কেবল কালু জোর গলায় বলে, 'আমরা যদি শেষ হয়ে যাই তো ঐ দোল খেলার মাঠেতে আমাদের স্মরণে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করে দেবেন।'

শংকরদা, 'বেঁচে থাকি কি না থাকি···' এই শব্দের সাথে সাথেই সারা ধরিত্রী যেন সুর মেলায়, 'শেষ সম্ভাষণ।'

একটা স্তব্ধতা ছেয়ে যায়, আর মুহূর্ত-কয়েকের সেই স্তব্ধতার মধ্যে কেবল ক্রমশ দূরে চলে যাওয়া ঘোড়ার পদশব্দ শোনা যেতে থাকে : 'টগবগ....টগবগ...টগবগ....'

কিসের ভয় ছিল এই-সব লোকদের ? দুর্ভিক্ষে শেষ হয়ে যাবার এবং স্মৃতিরক্ষার জন্যে স্তম্ভ তৈরি করার কথাই বা উঠছে কেন ? ভয় জমিদারের জন্যে মোটেই নয় যে ফসল মরে নষ্ট হওয়াতে বলবে, 'দুর্ভিক্ষ পড়েছে আর আমাদের মৃত্যুর দিনও ঘনিয়ে এসেছে।'

ভয় অন্য কারণে।

যে অকালকে তারা ভয় করত তারা ঐ নদীর পারে পাহাড়ের ওপরে বস্তি বেঁধে অনাদি-অনন্তকাল থেকে পড়ে রয়েছে। তারা জামা-কাপড়কে অকাল বলে ধরে না, ভাতের দুর্ভিক্ষ সদাসর্বদা তাদের লেগেই রয়েছে। চাষ-আবাদ কিছু করত কিন্তু ঠিকমতো চাষ করতে তারা জানত না। অল্পস্বল্প ফসল কিছু হত বটে কিন্তু তাকে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখার উপায় তাদের জানা ছিল না।

অলখা গামেতী ও অন্য যারা তাদের মধ্যে ফসল সামলে রাখতে জানত এমন দুর্দিনে তারাও গাঁয়ের লোকদের মতোই ভয় করত ঐ ভীলেদের।

ভয় এদের জন্যে ছিল।

এমনিতে এখন ঘাস, খড় বিক্রি করে গাছের ছাল সেদ্ধ করে তেতুল ইত্যাদি গাছের কচি ডালপাতা খেয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু কতদিন আর সে-সব চালানো যাবে ? শীতের লম্বা রাতগুলোতে তো পেটের ক্ষিদেকে বশ মানিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া

চলে। কিন্তু গরমের লম্বা দিনগুলোতে কী করবে?

ঘাস খড় তো এখন কেউ কিনতে চায় না। আর কিনবেই বা কী করে? যে কিষাণদের মূলধনের জোগানদার বলে ধরা হয়ে থাকে তাদের কোনোমতে সামনের বৃষ্টির সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়ার মতো সম্বল ছিল। তারা যদি ধানের বদলে গবাদি পশুকে বাঁচাতে চেষ্টা করত পশু আর মানুষ সবাইকেই যে মরতে হবে তখন?

ঘাস, খড় যারা কেনে তাদেরও দুঃসময় এসে গিয়েছিল। কেউ গয়না বন্ধক রাখে তো কেউ জমি···

শংকরদা, কাসম এবং বিশেষ করে রণছোড় নানা প্রভৃতিরা তো ভাবছিল যে এমন সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না। পাঁচ শো মনের যুগ্যি ক্ষেত পাঁচ মন শস্যের বদলে দিয়ে যাচ্ছে তাও হাত জোড় করে···

ফাল্গুনের অন্ধকার রাত থেকেই গুজব শুরু হয়ে যায়, 'ডাকাতেরা লুটপাট আরম্ভ করে দিয়েছে...। আজই হয়তো এখানও এসে পৌঁছবে...ঐ....শালাদের বন্দুকের আওয়াজ হল...ঐ ছুটে আসবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।'

এইভাবে লোকদের রাতের ঘুম পর্যন্ত মাটি হয়ে যায়।

অন্য যুবকদের সাথে গ্রাম পাহারা দেবার সময় এই গভীর তমসাচ্ছন্ন রাতগুলোতে কালুর মনে হত মৃত্যু যেন উঁকি মারছে···। চাঁদনী রাতেও গ্রামের সীমান্তে ডাকাত আসছে এমন ভ্রম হত। খোলা তলোয়ারের ওপর জ্যোৎস্নার আলো পড়ে কিছু যেন ঝিক-মিকিয়ে উঠল বলে মনে হয়।

কালু একদিন রাত্রে ভাবল, 'কাল জীবন-মরণের শেষ দেখা করে আসি।'

সত্যিসত্যি কালু পরের দিন ভোরবেলায় রাজুর সাথে দেখা করতে গেল।

রাজু সদর দরজায় বসে ছিল; সামনে আসতে থাকা কালুকে সে দূর থেকে চিনতে পারে না। আর কি করেই বা পারবে? কাঁধে

তলোয়ার ঝুলছিল। হাতে প্রায় গোটা পনেরো তীরের তূণ ছিল। চালচলনও বদলে গেছে তার। এখন তার মধ্যে কৃষকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না—এখানে সেখানে উঞ্ছবৃত্তি করে দিন কাটছিল তার। মুখ ঢাকা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে চকচকে চোখ ছুটিকেও তেমনি দেখায়···একেবারে সামনে আসতে তবে সে ওকে চিনতে পারল। হেসে বলে, 'আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি।'

'তোকেও কি চিনতে পারা যাচ্ছে। শস্য কিছু পাচ্ছিস তো, নাকি এখন থেকেই—'

'শস্য তো জুটছে কিন্তু কোনো কাজ পাওয়া যাচ্ছে না!' রাজু খাটিয়া বিছাতে বিছাতে বলে।

'বসে বসে বরং মানুষ তো মোটা হতে থাকে, নাকি এমন···রোগা!' ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সব কোথায় গেছে?'

'গ্রামের তিনজন লোকের সাথে ডেগড়িয়াতে কিছু ফসল নিয়ে আসতে গেছে। আর বাচ্চারা কোথাও খেলছে বোধ হয়।'

'দানা একটুও কিছু নেই?'

রাজু হাসে। বেপরোয়া ভাব দেখানোর চেষ্টা করে বটে কিন্তু সারা শরীর তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তখন হাসিতেই বা কি ক'রে আর রঙ আসবে?

'আছে অল্পবিস্তর! একেবারে শেষ হয় কখনো কি?'

'না···। বিশ্বাস করতে পারছি না। চল আমাকে দেখাবি চল।'

কালু তলোয়ারটা কাঁধ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'আমাকে দেখতে দে ঘরেতে কী আছে,' বলে ধনুকটা নিয়ে সামনের ঘরের দিকে যায়।

তাকে থামাবার ইচ্ছে হচ্ছিল রাজুর। বলতে পারত, 'আমি মিথ্যে কথা বলছি নাকি।' অথবা 'নাও বসো তো দেখি, কাউকে লজ্জায় না ফেললে বুঝি ভালো লাগে না।' এটাও বলতে পারত কিন্তু কি করে বলবে সে? গলা ধরে যায় ও সারা দেহ যেন অবশ হয়ে গিয়েছে।···খাটিয়ার পায়ার কাছে রাখা তীরগুলো উঠিয়ে সে

খাটের ওপর তুলে রাখে। পাশে পড়ে থাকা ঝাড়ুটাকে অন্যপাশে রাখে। ঘরের মেঝের ময়লার কথা খেয়াল হতেই আবার ঝাড়ুটা হাতে তুলে নেয়।

কালু ধনুক দিয়ে জালার ভেতরটা পরীক্ষা করতে ভিতর থেকে 'ঘম্‌ম্‌ ঘম্‌ম্‌' আওয়াজ হতে থাকে যেন ভেতরে বসে মহাকাল গর্জন করছে। শুধু তাই নয়, ঘরের দেওয়ালে হাওয়ার 'সর্‌র্‌ সর্‌র্‌' আওয়াজও এই নীরবতার কাছে ভয়ংকর মনে হয়।

রাজু ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ুটা একপাশে রেখে দেয়। ঘরের থেকে বেরিয়ে এসে কালু ধনুকটা তীরের সাথে রাখে। খাটে বসতে বসতে বলে, 'শেষ !···নতুন ফসল ঘরে উঠতে এখনো তো মধ্যে গরমের তিনমাস আর বর্ষার চার মাস— সাত মাস পড়ে আছে, আর ঘরেতে এককণাও খাবার দানা নেই !'

কালুর এ-সব কথা শোনেই নি এমনভাবে রাজু হুঁকো থেকে ছিলিম নিয়ে আগুন ধরাতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে কালু আবার গজগজ করতে থাকে, 'ঘরে খাবার থাকলে তবে তো আগুন জ্বলবে ?' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'কে জানে কতদিন আগে ও খাবার খেয়ে থাকবে !'....কিছু একটা ঠিক করে নিয়ে সে রাজুর পথ চেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজু আসতেই বলে, 'রাখ দেখি তামাক ; চল আমার সাথে, বেরিয়ে পড় এখান থেকে।'

রাজু ঘাবড়ে যায়। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হয় কাঁদব না হাসব, এই দোটানায় পড়ে গেছে যেন।

কালুর চেহারা কাঁদার চেয়ে কিছু কম ছিল না। সে বলতে থাকে, 'আমি এভাবে তোর অপঘাতে মৃত্যু দেখতে পারব না।'

'অপঘাতে মৃত্যু হলে তো আমার একলার নয়, সারা গাঁয়ের লোকেরই হবে। তোমার ঘরেই কি জালা-ভরা ফসল আছে নাকি ? বীজ নিতে গিয়েছিলাম, সে সময়েই জালা তো—'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি হিসেব করে দেখেছি। আমাদের

দুজনের আরো দুমাস কেটে যাবে আর মঙ্গলাকে তো— আজ আমি এখানে এলাম তাই নইলে ফেরত রেখে আসতে বেরোতাম—'

রাজু বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'না না! তুমি যদি ওকে ছেড়ে আসো লোকে কী বলবে তোমাকে? লোকের কথা নাহয় ছেড়ে দাও, প্রাণ তো সকলেরই সমান, তাই নয় কি?' একটু থেমে থেকে মাথা নেড়ে বলে, 'উহুঁ! তা কী করে হবে— তুমি যদি তোমার কোনো-এক শালাকে নিয়ে যেতে চাইতে তো ঠিক ছিল, তা ছাড়া— তোমার আমার মধ্যে কিসের সম্পর্ক?'

'ঠিক আছে! এই কথা তো রাজু!' কালুর গলার স্বর শুধু নয় তার চেহারা পর্যন্ত দুঃখে ভরে যায়।

'তা নয়! তোমার আমার মধ্যে মনে-মনে তো অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি—'

'আরে, আমি তো আমার ভাগ থেকে, আমরা দুজনে এক এক দানা ফসল খেয়ে দিন কাটাব, তা হলে কিছু বলার থাকবে না তো?'

কিছুক্ষণের জন্যে রাজু যেন চিন্তার সাগরে ডুবে যায়। এই সামান্য সময়টুকু সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে সচকিত হয়ে বলতে থাকে, 'এ কী ধরনের কথা তোমার?…তুমি কি ভেবেচিন্তে এ কথা বলছ? নিজের ঘরের সবাইকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাব? কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর মাচার চালায় ঠেকা দেওয়া খুঁটি থেকে নখ দিয়ে কাঠের আঁশ তুলতে তুলতে রাজু বলে, 'আমাকে নিয়ে যাবার কথা ভুলে যাও। স্বপ্নেও তা হওয়া সম্ভব নয়।'

'তা হলে সেই কথাই বল না যে জেনেশুনে তুই মরে যেতে চাস।'

'মরতে আর কার ভালো লাগে' হাসবার চেষ্টা করে রাজু। বলে, 'আর আমি কেনই-বা—'

'কেনই বা মানে আমি সব-কিছুই বুঝতে পারি রাজু! পৃথিবীতে আর কেউ না জানুক আমি তো জানি তোকে—' সে রাজুর দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'খাবার তুইই রান্না করিস, বল এটা সত্যি না মিথ্যে?'

'সত্যি।'

'সকলকে পরিবেশনও তুই করিস।'

রাজু সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বলে, 'ভাগ করে দিয়ে দিই।'

'যে ভাগ করে দেয় তার নিজের ভাগেতে কতটা বেঁচে থাকে, বল তো?'

রাজুর ম্লান বিষণ্ণ চোখ তুটি হাসতে থাকে। ভ্রূ নাচিয়ে যেন ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে বলে, 'বলো।'

'পরিবেশনকারীর ভাগ্যেতে তো ডালের বাটি পুঁছে আর হাঁড়ি ধোওয়াতে যেটুকু জোটে!' বলতে বলতে কালু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'কিসের জন্যে তুই নিজের হাতে— আরো অন্যের ভালো করলে বাঁচতে হবে না! সত্যি বলছি, পাগলী! তুই বোধহয় ভাবছিস যে তুনিয়ার লোকে তোকে বদনাম দেবে, কিন্তু এ সময়ে বদনাম দেবারও কারুর ফুরসৎ নেই। সকলেই যে যার ধান্ধায় রয়েছে। দেখবি যে তুদিন আসছে তাতে মা যদি নিজের বাচ্চাকে সেদ্ধ করে না খায় তো কী বলেছি, তখন মনে করে রাখিস, কালু কী বলত! তাই বলছিলাম কি বোকারাম, আমি ঠিকই বলছি— তুই রাজী হয়ে যা—'

'মিথ্যে মিথ্যে তুমি আজেবাজে কথা বলতে শুরু করেছ।' রাজু কিছুটা চটে গিয়ে বলে, 'আমি এই ঘর ছেড়ে কোনোদিন যাব না।' মাটিতে বসতে বসতে সে আবার বলে, 'আমার নিজের ভাই এসে ডাকতে এলেও না।'

কালুর আজ রাজুকে অসীম শক্তিময়ী মনে হয়। সে মনে-মনে এই মূর্তিমতী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত হুঁকো টানার পর রাজুর দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'তা হলে শেষবার এই তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমাকে শুভেচ্ছা জানা!'

'কিসের জন্যে শুভেচ্ছা জানাব, শেষ দেখাই-বা কেন?' রাজুর পাণ্ডুর মুখ পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'কেন বলছ তুমি এ কথা।'

সত্যি বলছি রাজু। আমাদের ওদিকেও অনেকেরই অবস্থাই

তোদের মতো, আর যার যেটুকু শস্য পড়েঝড়ে আছে তা আজকালের মধ্যে যে-কোনো দিন লুঠতরাজ হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করে নিয়েছি না খেয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে ডাকাতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে মরা খারাপ কোথায়! দুনিয়ার লোকে স্মৃতিস্তম্ভে অন্তত—'

'হুঁ… ! তাই বুঝি তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়েছ?'

রাজু গোপন রহস্যটা যেন বুঝতে পারে, সাথে সাথেই তার তীক্ষ্ণ আয়ত চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। কথাও বলে ব্যঙ্গের ছলে, 'তা হলে সেই কথাই বলো-না কেন যে ডাকাতের হাতে মরতে চাও কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভতে বেঁচে থাকতে চাও।'

কালু এ কটাক্ষ ধরতে পারে না এবং এই রাজুকেও সে চিনতে পারে না; তাই সে দ্ব্যর্থবোধক জবাব দেয়, 'তা হলে ক্ষিদের জ্বালায় কুকুরের মতো ধুকতে ধুকতে মরতে হবে?'

'হুঁ… !' রাজুর দৃষ্টি দরজা দিয়ে দেখতে পাওয়া আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল, মনও অন্য কোথায় ছিল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কালু ভাবে যে সে বোধহয় ঠিকমতো কথাটা বুঝতে পারে নি, তাই বলে, 'মরে যেতে যেতেও এই দেহ মানুষের যতটা উপকারে আসে।'

রাজুর দীপ্ত চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই থাকে। কালুর দিকে চোখ তুলে প্রশ্ন করে, 'তুমি কখনো উপোস করে থেকেছ কি?'

'এখনো পর্যন্ত তো ভগবানের কৃপায়—'

'তা হলে এক কাজ করো। দুদিন এখানে থেকে পরখ করে যাও পেটের জ্বালা কাকে বলে। তারপর গিয়ে না-হয়—'

রাজুর এই কথাগুলোর থেকে তার ক্লান্ত, শীর্ণ চেহারা কালুকে বেশি বিচলিত করে তোলে। এত বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে যে সে তার অর্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারে না। কথার মধ্যে বলে ওঠে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কী বলতে চাইছিস তুই?'

'ক্ষিদে কী তাই দেখো নি তো কী করে বুঝতে পারবে।' রাজু যেন নিজের মনে কথা বলে, পরক্ষণেই সে কালুর দিকে ফিরে তাকায়,

'তুমি জানো না'— কেবল তার চোখের দৃষ্টি নয়, গলার স্বরও তীব্র হয়ে ওঠে, 'যেদিন আমি শেঠের বাড়িতে খাবার দানা ধার করে আনতে গিয়েছিলাম তখন তার গোলা ফসলে ফেটে পড়ছিল, শেঠ আমার রূপের তারিফ করে আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। সেদিন খালি হাতে ফিরে আসবার সময় অনেক কিছুই ভেবেছিলাম, আমি যদি পুরুষ হতাম তো ঐ তেজারতীর কারবারীকে খুন করতাম আর ক্ষিদের জ্বালায় যারা মরতে বসেছে তাদের ডেকে এনে শস্যের গোলা লুঠতরাজ করতাম।' রাজুর চোখে সত্যি সত্যিই যেন রক্ত ভরে আসে। জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে তার গলার স্বর আস্তে হয়ে আসে, 'আজকেও তো তুমি আসার আগের সময় পর্যন্ত আমি ঐ এক কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু কী আর করব আমি, ভগবান আমাকে মেয়েছেলে করে তৈরি করেছেন।'

কালু নিশ্চুপ হয়ে যায়। উত্তর দেবার মতো তার কিছুই থাকে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার রাজু বলে, 'তুমি ভাববে রাজু বোকা মূর্খ। কিন্তু রাজু কী করতে পারত? যা গহনাপত্র ছিল সব বেচে খেয়েছে আর এই বাড়ি জমি যদি কেউ কিনতে চায় তো দশ মন কেন দু মন শস্যের বদলে বিক্রি করে দেব। কথায় বলে না যে বেঁচে থাকলে তবেই না সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারব, কিন্তু—'

কালুর বলতে ইচ্ছে করে, 'তুই বাঁচার চেষ্টা করছিস কোথায়! তোকে তো অন্যের সুখ-সুবিধেতেই পেট ভরাতে হবে। হয়তো বলেও ফেলত কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে না···নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কিন্তু তুই না পারবি লুঠতরাজ করতে না খোয়াবি নিজের জাত-কুল। তা হলে মৃত্যুই একমাত্র পথ বাকী থাকে কিনা বল?'

রাজু তার নিজের এত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও কালুর দুঃখ দেখতে পারে না, হেসে বলে, 'তুমি মৃত্যুর কথা ভেবে অবাক হচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে— আমি তো পা বাড়িয়ে রয়েছি। ঐ নদীর ধারে এখন থেকেই রোজ তিন-চারটে করে চিতা জ্বলছে দেখতে পাই। ওদের

সাথে একদিন আমার চিতাও জ্বলবে। এতে অবাক হবার কী আছে ?··· আর তুমি তো বলছই যে আমি মৃত্যুকে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

কালুর কাছে এই গলার স্বর, এই ব্রীড়াবনত নম্র চেহারা একান্ত নিজের বলে মনে হয়। 'নিজের মৃত্যুর জন্যে কে আর ভয় পাচ্ছে ? কেবল ইচ্ছে হয় যে মরবার সময়টা আমরা দুজনে একসাথে থাকতে পারতাম যদি—' কালুর চোখে জল ভরে আসে, সে চুপ করে যায়।

'তোমার যেমন ইচ্ছে হয় আমার বুঝি হয় না ?' ব'লে ছেঁড়া আঁচলটা নিয়ে আরো ছিঁড়তে থাকে, 'মনে অনেক কিছুই ইচ্ছে জাগে। এই জীবনে বেঁচে থেকে তোমাকে যখন পেলাম না ; মরবার সময়েও যদি···' নিশ্বাস নিয়ে বলে, 'তেমন ভাগ্য আমার কোথায় যে মরার সময় এক সাথে—'

কিন্তু 'চিতায় জ্বলব' এই কথাটুকু বলার আগেই তার ভাসুর-জা ও স্বামীকে উঠোনে প্রবেশ করতে দেখা যায়। মাথায় তাদের বোঝার মতো কিছু রয়েছে দেখে রাজুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— 'নাও, অন্তত মাসখানেক মৃত্যু পিছিয়ে গেল আর তত দিনে তো আবার রাজ্য গড়ে তুলতে পারব,' সে উঠে পড়ে।

কালু বুঝতে পারে যে রাজুর এই-সব কথা ও এই বেপরোয়া ভাব কেবল তাকে খুশি করার জন্যে।

শ্বশুর ও কাকার সাথে সম্ভাষণ করার পরে কালু শুধু ওদের দেখানোর জন্যে ঘর-সংসারের খবর জিজ্ঞেস করে। বলদ বেচে ফসল এনেছে জেনে সে খুশি হয়, 'এ তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনাদের গোরুও তো আছে !···ওটা যদি কোনো গ্রাহক পেয়ে যান তো বেচে—'

'গ্রাহক তো পাওয়া যাবে কিন্তু—' চচ্চ্ চচ্চ্ চচ্চ্ চচ্চ্ শব্দ করে কালুর শ্বশুর অনিচ্ছা প্রকাশ করে, 'আরে ছিঃ ছিঃ ! তারা তো ক্ষিদের জ্বালায় অকাজ-কুকাজ সব করছে কিন্তু আমি কী করে গোরু বেচে পাপের ভাগী হই !'

কালু বুঝতে পারে যে বলদগুলো জ্বালা দূর করতেই শেষ হয়েছে আর এই গোরুর গ্রাহকেরা— সে এই উপদেশ দেবার জন্যে অনু-শোচনা করতে থাকে— যেন কেউ ভীষণ পাপ করে ফেলেছে !

'দেখো, কথাটা যেন আবার রাজু বউয়ের কানে না ওঠে।'

শ্বশুরের এই কথা শুনে কালুর ইচ্ছে হয় রাজুকে বিদ্রূপ করে, 'বারে আপনার রাজু বউ ! মানুষ খুন করতে আর লুটপাট করতে ধর্ম কোনো বাধা দিতে আসে না ; এই গোরু বিক্রিতেই— পরক্ষণেই সে ওই রাজুকে মনে মনে প্রণাম করতে করতে বিড় বিড় করে বলে, 'রাজু ! এই কঙ্কালসার প্রেতের রাজত্বে আর এই হৃদয়হীন জাতের মধ্যে তোর মতো মেয়ের কেন জন্ম হল ? তোর তো কোনো রাজ-বংশে অথবা পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল !...'

এরপরে কালু শস্য সামলে রাখার ও বুঝেসুঝে কম করে খাবার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দেয়। নিজের গ্রামের সব খবরাখবর জানায় আর বাড়ির কথা চিন্তা করতে করতে যাবার অনুমতি চায়, 'আমি তা হলে আজ যাই।'

শ্বশুর-শাশুড়ী খেয়ে যেতে অনুরোধ করে। ঘরে রান্না করতে করতে রাজু বাইরে এসে স্নেহভরা বকুনি দেয়, 'তোমার যদি লজ্জা থাকত তো এভাবে না খেয়ে যেতে পারতে কখনো ?'

কালুর খাবার রুচি ছিল না, ক্ষিদেও মরে গিয়েছিল। কী আর করবে সে ? মুখে কোনো কথা না বললেও রাজুর দু চোখ যেন বলছিল, 'আমার হাতে শেষবারের মতো খেয়ে যাও, কে জানে পরে কে বেঁচে থাকবে আর কে মরবে !'

কালুকে বসতেই হল শেষ পর্যন্ত।

রাজু কিছুক্ষণের মধ্যে জাঁতার পেষার কাজ শেষ করে নেয়। কালুর চান করার সময়টুকুর মধ্যে রুটি তৈরি করে দেয়। সে কালুকে রান্নাঘরের উনুনের পাশে খাবার জন্যে বসায়।

কলমি শাকের সামান্য ভাজার সাথে ঘাসের দানার এই রুটির মতো মধুর জিনিস বোধ হয় পৃথিবীতে এখন আর কিছুই নেই ! তার

ওপর রসুনের চাটনী ও ঘোল।

খেতে খেতে কালুর চোখে জল এসে পড়ে। আবছা অন্ধকারেও রাজুর তা চোখে পড়ে যায়, মৃদুস্বরে সে বলে, 'খুব তো বল যে পুরুষমানুষ !···এই বুঝি তার নমুনা ?'

'আর কখনো দেখা হবে কি না হবে কে জানে !'

'তাতে কি ? ওখানে ঐ পরপারে গিয়ে তো দেখা হবে !'

'আমার অনেক কিছু বলার ছিল রাজু—' বলেও ফেলে সে, 'তোর কোলে মাথা রেখে শেষবারের মতো কেঁদে নেবার বাকী রয়ে গেল—' তার নিজের অজান্তে ওর মাথাটা রাজুর দিকে এগিয়ে যায়।

'নাও, এবার লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও !' রাজু কালুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পরক্ষণেই জলের ঘটি নিয়ে আসার ছুঁতো করে সে উঠে যায় কিন্তু এখন সে এখানে বসে থাকলেও কালুর মনে আর কোনো কামনা-বাসনা ছিল না। তার শুভেচ্ছা নেবার কিংবা কোলে মাথা রেখে কাঁদার বাসনার কোনো কিছুই আর অপূর্ণ রইল না। মাথার চুলে বিলি কেটে যাওয়া রাজুর ঐ পাঁচটি আঙুলের স্পর্শেই সে সব-কিছু পেয়ে যায়— এই যেন তার জীবন-মরণের শেষ বাসনা ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হুঁকো টানা কোনোমতে শেষ করে তার হাতিয়ার গুছিয়ে নেয়। শ্বশুর-শাশুড়ী ও খুড় শ্বশুরের কাছে অশ্রু-পূর্ণ চোখে বিদায় নেয়, 'সব শেষে রাজুর কাছ থেকে কিন্তু সে শুধু চোখের ভাষায়। 'দিন পনেরো বাদে আমি আবার এসে দেখা করে যাব আর আপনারাও খোঁজ-খবর নেবেন দেবেন, আচ্ছা চলি, নমস্কার।' পিছন ফিরতে ফিরতে কালু বলে ফেলে, 'রাজু! আর কোনোদিন দেখা হবে কি হবে না জানি না, নইলে জীবন-মরণের এই—'

রাজু নিজেও চেতনা ভুলে দাঁড়িয়ে ছিল। অপস্রিয়মান কালুর পিছনের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামে— পাগড়ীর চূড়া মিলিয়ে যাওয়ার পর তবেই সে পিছন ফেরে আর চোখের জল মোছে।

॥ একত্রিশ ॥

ক্ষুধার্ত কঙ্কাল

কালুর ফেরার পথে জুড়ে সমস্ত অঞ্চলটাই যেন ছাপ্পানোর মন্বন্তরের কবলে পড়ে শুধু 'খাই খাই' করছিল। পাখিরা পর্যন্ত খিদে ও তেষ্টায় ধুকছিল। চৈত্রের উত্তপ্ত হাওয়া একেবারে শুষ্ক রুক্ষ। রোদে তেতে পোড়া মাটি কালুর নগ্ন পায়ের তলায় ঠিক যেন জলন্ত কাঠ চেপে ধরে শত্রুতা করতে থাকে।

কিন্তু কালুর কোনো দিকে খেয়াল নেই। তার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা ঘুরছে, 'রাজু, ঐ সুদখোর শেঠকে শেষ পর্যন্ত তার দেহ সমর্পণ করবে না তো?'

অন্যধারে আবার তার পুরো বিশ্বাস ছিল, 'মাটির ওপরের চেহারা পাল্টে গেলেও যেতে পারে কিন্তু রাজু পাল্টাবে না!···ক্ষুধার তাড়নায় কাল যেখানে মরতেই হবে—'

এ ধরনের দুশ্চিন্তা করার জন্যে কালু নিজেকে নিজেই তিরস্কার করতে থাকে; 'ধিক হতভাগা তোকে! তুই আজও রাজুকে চিনতে পারলি না? ও চুরি করবে, লুটপাঠ করবে— ক্ষেপে গেলে বাঘিনীর মতো অনেককে হয়তো খুনও করতে পারে কিন্তু ও-ধরনের কাজ করবে না।'

তবুও কালু শস্যের সেই পুঁটলিগুলো আর বাড়ির লোকের সংখ্যার হিসেব লাগায়···রাজু কমসম করে একমাস নিশ্চয় তা দিয়ে কাটিয়ে দেবে। সে মনে মনে স্থির করে, 'তা হলে দিন-পনেরো বাদে আমি একবার করে ঘুরে যাব ওদিকে।'

এবার সে ভলীর পায়ের বালা, ঘুঙুর, কানের দুল, হাতের চুড়ি, কঙ্কণ হার আর দুটো তিনটে আংটি ইত্যাদির হিসেব করে দেখে, হুঁকোর ওপর জড়ানো আট-বারো আনার মতো ওজনের রুপোর তারটাও হিসেবের মধ্যে ধরতে ভুলে যায় না। নিজের মনে বলে,

'এ-সব বিক্রি করলেও কি পরের একটা মাস কাটবে না ? আর—'

সেই শস্যের বোঁচকা আর গয়নার সাহায্যে দু মাস কাটাবার কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে, 'এই বারো মাস ধরে চলে যাওয়া বৃষ্টি জ্যৈষ্ঠের শেষ পনেরো দিনেও কি ফিরে আসবে না ?'

যেন এখনই তার সামনে জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় পক্ষ এসে উপস্থিত হয়। কালু বলে ওঠে, 'বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে, এখনো উঁকিঝুঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। গাছের ডালপালা আর ভাজাভুজি খেয়ে দিন কাটিয়ে দেব কিন্তু একবার অন্তত বৃষ্টি তো পড়ুক।...'

এই-সব ভাবনার কারণে কিংবা গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে যাওয়াতে অথবা অস্তগামী সূর্যের তেজ ক্রমশ কমে আসায় সে তাড়াতাড়ি পা চালায়। গাঁয়ের উত্তর দিকে নদীর তীর থেকে চীৎকার শোনা গেল, 'শিগগির ছুটে এসো, গোরুর পালেতে ডাকাত পড়েছে, শিগগির এ—সো—ও...'

কালুর সারা শরীরে ঝিঁ ঝিঁ ধরে যাওয়ার মতো কম্পন শুরু হয়। আশপাশের স্তব্ধ বনরাজি এবং হাওয়ার শান্তি নীরবতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে!

তৎক্ষণাৎ ঐ চিৎকারের জবাবে গাঁয়ের সারা আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে, 'ঐ এল...ঐ !...হায় রে হায় ! এতদূর শয়তানী করলে দেখো ! ওরে কোণাকুণি দৌড়ে শিগগির টিলার দিকে চল...রে... !'

খুঁটির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালুর চেতনা ফিরে আসে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সাড়া জাগে— সাহস বেড়ে যায়। বাঁ দিকে ফিরে সে দৌড়তে থাকে, ক্ষেতের কিনারা, আল এ-সবের কোনো খেয়াল থাকে না। দু-এক জায়গায় মাথার সমান উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে যায় আর ছোটো-বড়ো ঝোপঝাড় তো দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে যেতে থাকে। নদীর তীরে পৌঁছে সে একবার হাঁক পারে, 'হ্যাঁ...রে...রে... ব্যাটাচ্ছেলেরা ! একটু সবুর কর, এই আসছি। তোদের সময় ফুরিয়ে এসেছে !' বিকটভাবে শব্দ করে ওঠে— 'রে...রে...রে।'

গাঁয়েতে দুজনের গলার স্বরে সিংহনাদ ছিল। এক কালুর, অন্য

বেচাতের। সকলেই এদের গলার স্বর চিনতে পারত। তাই পাহাড়ের ওপর থেকে বেচাত চিৎকার করে ওঠে, 'আর ভয় নেই! আমার বন্ধু এসে গেছে···রে··· ।'

কিন্তু এই বন্ধু ঐ চিৎকারের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে ঘুরে যায়··· ঝোপজঙ্গলের মধ্যেও খালি পায়ে কালুর দৌড়ানোর গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে—মাথার চুলের মধ্যে উকুন যেমন সরসর করে যায় ঠিক সেই ভাবে সে যেন পিছলে এগিয়ে যেতে থাকে!

অবশ্য তার মানে এই নয় যে কালু এই জঙ্গলের লোকদের চেয়ে জোরে দৌড়তে পারে। ওদের মধ্যে তো কেউ কেউ ছুটন্ত খরগোশকে দৌড়ে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। এক তো ক্ষিদের জ্বালায় মরছিল, ওদিকে আবার গোরুবলদেরা মেরে ছিল। লাঠি পিটিয়ে পিটিয়ে মোষগুলোকে খুব ছোটানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু ঐ শান্ত জাত কত আর দৌড়তে পারে।

তবুও গ্রাম থেকে সাহায্য এসে পৌঁছনোর আগেই তারা পাহাড়ে উঠে পড়তে পারে তখন আর কোনো-কিছু করার থাকে না, 'বাপের বাড়ি পৌঁছনো মেয়ে ও পাহাড়ে-চড়া ভীল কারুর কথা গ্রাহ্য করে না।'

দাঁত পিষতে পিষতে আর হাত রগড়াতে রগড়াতে রামা, ভগা, নানা, কোদর প্রভৃতি যুবকেরা আর শংকরদা, কাসমের মতো বৃদ্ধেরা, 'এখন বসে বসে কাঁদো ভাই। আর কি আমাদের টিকতে দেবে!··· গোরু-বলদ লুটে নিয়েছে, সেইজন্যে কাঁদছি না। কাঁদছি তারা ঘরদোর সব দেখে গেল', এই ব'লে বুক চাপরাতে চাপরাতে গাঁয়ে ফিরে যায়।

· গ্রামে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। যা গেছে তার জন্যে কেউ কাঁদছিল না। এখনো যা-কিছু রয়ে গেছে তার জন্যেই ভাবনায় কাঁদছিল। অনাগত ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মা কাঁদছিল। মাকে কাঁদতে দেখে বাচ্চারাও ঘাবড়ে গিয়েছিল···

কে কাকে ভরসা দেয়? আকাশে যদি ফাট ধরে তো তাপ্পি

লাগাবে কোথায় ? পাহাড় ক্ষেপে উঠলে কার কাছে আর আশ্রয় খুঁজতে যাবে ?

সারা গাঁয়ের মধ্যে কেবল বেচাতের বাড়িতেই কান্নাকাটি কিছু কম হয়েছিল। এবার ওধারে ছিটকে-পড়া গাঁয়ের অন্য গোটা চারেক মোষের সাথে সে নিজের সাতটা মোষের ভেতরে তুটোকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল।

ওদিকে কালুর বাড়িতে ভলী দরজায় মাথা কুটছিল, 'বেচাত ভাই তো একলাই ফিরে এসেছে, আর কেউ একবার গিয়ে দেখ, আমার ঘরের লোকের একটু খোঁজ-খবর করো··· ! হায় হায়! এখন আমার কি হবে ? রেগে-মেগে সে লোকটা হয়তো ডাকাতদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে আর ভীলেরা হয়তো, হায় হায় ! ওরে কেউ একবার এগিয়ে গিয়ে দেখ। রামাভাই, কোদর ভাই ! অনেকদিন তোমাদের সাথে একসঙ্গে বসে হুঁকো খেয়েছে ঐ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটা, আজ তোমরা কেউ একবার তার খবর নিয়ে এসো।' সে গিয়ে বেচাতের কাছে কাকুতি-মিনতি করে আসে।

গাঁয়ের জন-পনেরো জোয়ান ছেলে আবার খুঁজতে বেরোয়।

ওধারে কালু প্রায় এক নিশ্বাসে পাহাড়ে চড়ে একটা সংকীর্ণ গিরি-পথের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। বড়ো বড়ো পাথর নিয়ে এসে সে ঐ গিরিপথের ঠিক ওপরের পাহাড়ের মাথায় জড়ো করে রাখে। খাপ থেকে তলোয়ার বার করে ধনুকে তীর লাগিয়ে একটা ছোটো পলাশ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ডাকাতদের পথ চেয়ে বসে থাকে।

কালুর সজাগ কানেতে দস্যুদের হাতে নিহত মরণোন্মুখ জানোয়ারের অন্তিম স্বর এসে পৌঁছয়, 'ম্যাঁ··· !' সে মনে মনে বলে, 'হয়তো এই গিরিপথ পর্যন্ত আসার আগেই সব জন্তুদের শেষ করে ফেলবে।' সে সেখান থেকে বেরিয়ে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য পাহাড়টায় চড়ে।

পাহাড়ের ওপরে উঠেই কালু যে দৃশ্য দেখতে পায় সে দৃশ্য শুধু এ জন্মে কেন আগামী সাত জন্মেও কোনোদিন সে ভুলতে পারবে না।

অস্থিচর্মসার বিশ-পঁচিশ জন ভীল সেই নিহত জন্তুটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তাদের দাঁতই যেন বাসনের কাজ করছিল আর আগুন তো পেটে ধক্‌ধক্ জ্বলছিল। কালু শিহরিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্যে তার ভাবনা হয় 'এরা শকুনি নয় তো'?

শকুনদের মতোই খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছিল। কেউ বাচ্চাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, তো কোথাও কোনো বৃদ্ধ রক্ত চুষে খাচ্ছিল। জানোয়ারের এক-একটা পা-দুজনে মিলে দাঁত দিয়ে কাটছিল আর অন্য জন যারা তলোয়ার নিয়ে জানোয়ারের ওপর উঠে বসেছিল, মাংস কেটে কেটে নিজেদের (লঙ্গটের) কাছে পায়ের তলায় চেপে রাখছিল কিংবা পেট ও উরুর মধ্যের অংশে জমা করছিল। তলোয়ারের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তার থেকেই দু-এক টুকরো টেনে নিতে থাকে।

কালু শিউরে ওঠে। তার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। তাদের মারা দূরের কথা, তার চোখ জলে ভরে আসে, 'ভগবান তুমি নিপাত যাও! মানুষের সন্তানের একি দুর্দশা!' সারা পাহাড় বিদীর্ণ করে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'জগতে যদি সব থেকে কিছু খারাপ থাকে তো এই পেটের জ্বালা।'

কালুর দুই হাত নিসপিস করে উঠেছিল বটে তবে বাবার মতো নাম-করার বাসনা বেশি জেগেছিল। কিন্তু এখানে এই জানোয়ারের দল এবং এই লোকেরা সকলেই তো মরে রয়েছে তা হলে কাকে আর সে মারবে? ওদের মারার চিন্তা তো দূরের কথা; ঐ অস্থিচর্মসারদের ধারে কাছে ছটফট করে ঘুরে বেড়ানো দু-তিনটে ছেলেকে দেখে উল্টে সে চেঁচাতে থাকে, 'ও মুখপোড়ারা, ঐ বেচারী ছেলেগুলোকে তো কিছু দিবি।'

হয়তো সে সত্যিই বলে ফেলবে সেই ভয়েতে কিংবা সেই দৃশ্য অসহনীয় হয়ে ওঠাতে, সে সেখান থেকে সরে আসে। 'এখন কি করব?' ভাবছে এমন সময় গোটা পঞ্চাশেক অস্থিচর্মসারের এক-দলকে প্রায় পনেরোটা জানোয়ারদের সঙ্গে নিয়ে সেই গিরিপথের

দিকে যেতে দেখে। জানোয়ারদের মধ্যে তার নিজের মোষদের দেখতে পেয়ে তার সুপ্ত বাসনা আবার জেগে ওঠে, 'একা এদের কাছ থেকে নিজের মোষ যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই আমি বালা প্যাটেলের উপযুক্ত ছেলে।'

কালু আবার সেই গিরিপথের উপরে গিয়ে বসে। তলোয়ার খাপ থেকে খুলে বার করে এবং পলাশ গাছের গুড়িতে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই পঞ্চাশ জন লোকের গোটা দলটা যেন কেবল-মাত্র জনা-দশেক লোকের জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে যুবক ছিল, যুবতীও ছিল, কিন্তু কৌপীনের জায়গায় গাছের ছাল আর পাতা জড়ানো থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের আলাদা করে চেনা বেশ মুশকিল। আজ থেকে সাত-আট মাস আগে এক এক কলসী দুধ ভরে রাখার মতো স্ফীত উন্নত তাদের স্তন এখন বুকের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। ঝুলেপড়া চামড়াকে কালো রঙের একটা রেখার মতো মনে হচ্ছিল। পেছন পেছন বুড়ো-বুড়ীর দল কোনোমতে ঘষতে ঘষতে আসছিল। তাদের পায়ে পায়ে ছটপটানো বাচ্চার দল, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে, মরে যাচ্ছি রে···কিছু খেতে দাও,' এ কথা বলার মতো শক্তিও হারিয়ে ফেলে কোনোমতে শুধু আস্তে আস্তে আর্তনাদ করছিল। কালু বুঝতে পারছিল একটা কুটো ভাঙার শক্তিও তাদের কারুর হাতে-পায়ে নেই। কেবল সামনের ঐ চতুষ্পদ জানোয়ারগুলোর প্রলোভনেই কোনোমতে এটুকু ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে··· ।

জন্তুর পাল আর মানুষের দল গিরিপথের কাছে পৌঁছেছে কি পৌঁছয় নি একজন— জনাচারেক বারণ করা সত্ত্বেও একটা বাছুরের গলায় তলোয়ার চালিয়ে দেয়।

যারা মানা করছিল তারাও এক এক কোপ লাগায়।

সেই জানোয়ারটার ওপরে এরা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মনে হয় ঠিক যেন এক চাকলা গুড়েতে পিঁপড়ের ঝাঁক ছেয়ে রয়েছে···

যার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না সে হাত কামড়াতে থাকে।

ভিক্ষের চেয়ে কাকুতি মিনতি করাতেও কেউ তার তলোয়ার দিতে রাজী নয়। আর দেবেই বা কি করে? অন্যে যতক্ষণ এককোপ লাগাবে তার আগেই যদি তার নিজের প্রাণ বেরিয়ে যায়?

মাত্র পাঁচ-দশ মুহূর্ত এই নিরস্ত্র লোকেরা এইভাবে বিব্রত হতে থাকে। তারপরেই তারা দাঁত কামড়ে ধরে রক্ত খেয়ে বেঁচে উঠতে থাকে।

এই জানোয়ারের দল যদি চুপচাপ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তবে এই লোকেরা সত্যি সত্যিই হয়তো বাঘের মতোই জ্যান্ত কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলত। মানুষের মতো হত যদি তো তাদের গলা চেপে ধরে মেরে ফেলত, কিন্তু এত বড়ো জানোয়ারদের তো—

একদল ছুরি ব্যবহার করছিল তো অন্য দল মাটির খুরি কাজে লাগাচ্ছিল। আর অস্ত্রবিহীন তৃতীয় দল সেই গিরিপথের মাঝখানে একটা সাদা বলদকে আটকায়। ছুদিক থেকে পাথর দিয়ে বর্শার মতো খোঁচাতে থাকে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। রক্তে আপ্লুত হয়ে ওঠে। অসক্ত মানুষদের অধীরতা আর সেই সবল জানোয়ারটার ছটপটানি!…

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কালু কথা বলে যেন সে রাজুকে উত্তর দিচ্ছে, 'তুই বলছিলিস্, তাই আজ ক্ষিদে কাকে বলে খুব দেখলাম।'

কালু এদের মারবার কথা ভুলে যায়, উল্টে সে এই লোকগুলোর জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে অনেক চিন্তার উদয় হয়, 'কতক্ষণে এরা একে মেরে খেতে পারবে? বেচারা জন্তুটার মৃত্যুতে মুক্তি হবে কখন?'

সেই জন্তুটার আর্ত চিৎকার শুনে অথবা তাকে মারবার জন্য লোকগুলোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা কিংবা তাদের পেছনে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে থাকা বাচ্চাদের কান্না ইত্যাদি কোন্‌টা দেখে কে জানে সে তলোয়ার ফেলে দেয়। 'নে, তোরা মায়ের বেটারা'। সে উঠে পড়ে রওনা হয়, ভগবানকে শাপশাপান্ত আর গালি পাড়তে থাকে, 'ছুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী যে ভগবান তোর সর্বনাশ হোক, তুই মানুষের

এমন অবস্থা করেছিস…'

রাস্তার যেদিকে তাকায়, সেখানেও এই এক অবস্থা। কালুর তো স্থির বিশ্বাস হয়ে যায়, গাঁয়ে যে দু-তিনশো গোরু বলদ ছিল, আজ দিন শেষ হবার আগে তার একটাও আর বেঁচে থাকবে না। কখন এই পাহাড় থেকে বেরুতে পারব সে চিন্তায় সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাহাড়ের সীমানা পেরিয়ে সে রাস্তায় সবে নেমেছে হঠাৎ পাশের ঝোপের দিকে তার নজর পড়ে যায়। বাঘকে দেখলে ঘোড়ার পা যেমন মাটিতে আটকে যায় তেমনি সেই দৃশ্য দেখে কালু কাঠ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তো সে এক পাও এগোতে-পেছুতে পারে না এবং দৃষ্টিও সেখান থেকে ফেরাতে পারে না…ধীরে ধীরে পিঠের শিরদাঁড়ার চেতনা ফিরে আসে। খরগোশের মতো সে ত্রস্ত হয়ে অন্য ধারের—ছোটো ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়ে। মনকে সে প্রবোধ দিতে থাকে, 'না না, এ হতে পারে না, ওটা বোধহয় ডাইনী। আরে ভাই স্ত্রীলোকই হবে হয় তো, কিন্তু যাকে খাচ্ছিল সেটা নিশ্চয় খরগোশই ছিল…'

খরগোশের মতোই তীব্র বেগে ছুটে পালাতে পালাতে কালু তাদের গাঁয়ের রাস্তায় পৌঁছে তবে স্বস্তি ফিরে পায়।

কিন্তু কালুর শরীরের শিহরণ তখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাটে না। হৃদয়ের স্পন্দন জোরে হতে থাকে। মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। নিজের চোখে দেখা তবু সে নিজেকে বার বার প্রশ্ন করে, 'একি সত্যি নাকি? না না, স্বপ্ন নিশ্চয়ই। আমি বোধহয় শুয়ে রয়েছি— অথবা— এমন কখনো হতে পারে।…'

সত্যি সত্যিই সে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেত, ঠিক সেই সময়ে সামনে বেচাত, কোদর প্রভৃতিকে আসতে দেখে কালুর পাগলের মতো চোখের দৃষ্টি, ওদের গলার স্বর শুনে কিছুটা স্বাভাবিক হয়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে মাটির ওপর বসে পড়ে। আর বসেই প্রবলভাবে কেঁদে ওঠে…যেন আজই তার মা-বাবা দুজনেই মারা গেছে।

বন্ধুরা ঘাবড়ে যায়। তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'কী হয়েছে রে কালু? কথা তো বল? আরে কোথাও লেগেটেগে যায় নি তো?' ভগা তো সম্পূর্ণ উল্টো কারণ দেখায়, 'আরে ভাই, ওর গোরু-বাছুরগুলো চুরি গেছে সেইজন্যেই কাঁদছে। ভেবে কেন মিথ্যে মিথ্যে মাথা খারাপ করছিস।'

হৃদয় কিছুটা হাল্কা হতে কালু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে। তার চোখ দুটো তখনো জলে ভরা। কান্নার বেগ তখনো সম্পূর্ণ থামে নি। কালুর তখনকার সেই অবস্থা দেখে মনে হতে থাকে এজন্মে তার কান্না আর কখনো থামবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে সে গাঁয়ের লোকদের শুধু এটুকুই বলে, 'কিছু হয় নি ভাই, কিন্তু পেটের জ্বালা···' নিজের মনে বলে, 'না না! ক্ষিধে কাকে বলে তা তো এখনো পুরো দেখা হয় নি। এ যা দেখলাম, সে তো ক্ষুধার্ত মানুষ কেবল।···মানুষও নয় এক পাল ক্ষুধার্ত ভূত।' পুনরায় তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ে।

কোদর, ভগা প্রভৃতিরা ভয় পেয়ে যায়, 'এ পাগল হয়ে যায় নি তো?'···না হলে কালুর মতো ছেলের চোখ দিয়ে জল পড়তে পারে না!

॥ বত্রিশ ॥

গুজব

কালু এবং অন্য যুবকেরা তখনো গাঁয়ে পৌঁছয় নি কিন্তু ইতিমধ্যেই সারা গাঁয়ে কথা ছড়িয়ে যায়। কেউ বলছিল, 'আহত কালুর কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে…' কেউ বলছিল, 'হাত ভেঙে গেছে' কেউ সে কথার প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, 'দূর ও-সব বাজে কথা, আমি নিজের চোখে দেখে আসছি। তবে এটা সত্যি কথা অলখা গামেতী এই খবরটা গাঁয়ে পৌঁছনোর জন্যে কালুকে জীবন্ত ফেরত পাঠিয়েছে যে ঐ ক্ষুধার্ত ভিখিরীর দল এখন আর তার বশে নেই, অতএব বুদ্ধি যদি থাকে তবে সাবধান হও ভাই…।'

অবশ্য এই কথাটাতে সার কিছু ছিল। গ্রামে অন্য যুবকদের সঙ্গে আলাদা হবার সময় কালু বলে, 'যদি বেঁচে থাকতে চাস তো কালই বিছানাপত্র বাঁধতে শুরু করে দে, নইলে এখানে যে থাকবে সে ধনেপ্রাণে মারা পড়বে ভাই!'

একে তো চৈত্রের অন্ধকার রাত। তার ওপর এই-সব খবর। এই খবরের জন্যেই হোক কিংবা ভাঁড়ার খালি হওয়ার (শুধু বলদ আর কারুর ঘরে দুধ দেওয়া মোষ— এই শুধু বেঁচে ছিল) জন্যেই হোক— লোকদের বাড়িতে ভয় করতে থাকে। কালুর মুখ থেকে সেই ভূতের দলের বিবরণ শুনেই তারা গুজবও ছড়িয়ে দেয় যে, ঐ খালি ভাণ্ডার ঘরের অন্ধকারে কঙ্কালরা 'খাবো খাবো' করে আওয়াজ তুলছে।

প্রায় সারা গাঁয়ের লোকেরাই কালুর কাছে খবর শুনতে আসে। যে-সব ছেলে আগেই শুনেছিল তারাও এসে বসে। কালুর ছোটো বারান্দা আর বড়ো উঠোনে জমায়েৎ লোকেরা উনুনে চড়ানো খিচুড়ীর মতোই যেন কিলবিল করতে থাকে। সকলেরই ইচ্ছে কালুর সামনে বসে জিজ্ঞেস করে, ভালো করে সব কথা শোনে। সেইজন্যে আগে গিয়ে বসবার তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। কয়েকজন স্ত্রীলোকে দূর

থেকেই চীৎকার করে বলে, 'ও কালু ভাই, একটু আমাদের শোনাও।'

কালুর জ্ঞানগম্যি তেমন বিশেষ নয়, তাই বক্তৃতা বা ভাষণ কি করে দিতে হয় তা সে জানবে কী করে? কিন্তু তাকে জানতেই হয় শেষ অবধি। সে খাটের ওপরে উঠে, 'আরে ভাই, আমি কাকে বলব আর কাকে না বলব কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' এই বলে সে রকের ধারে চলে আসে। তখনো ঠিকমতো দাঁড়ায় নি, আওয়াজ ওঠে, 'না, এদিকে একেবারে উঠোনে এসে বলো।'

এ সময়েও রামার মাথায় ইয়াকি করার বুদ্ধি আসে, মাথায় খাটিয়া নিয়ে 'সরে যাও···সরে যাও' করে এসে পৌঁছয়। উঠানের মাঝখানে খাটিয়া পেতেই দৌড়য়, 'কালু ভাই, একটু দাঁড়াও।'

রামাকে বড়ো একটা ঝুড়ি নিয়ে আসতে দেখে অনেকেরই হাসি পেয়ে যায়। কয়েকজন রেগেও যায়, 'হতভাগা, ভাঁড়ের মতো কী শুরু করেছিস?'

কিন্তু রামা যখন খাটের উপর ঝুড়িটা উল্টে রেখে, 'এর ওপর উঠে বল কালু ভাই' বলে, তখন চটে-ওঠা লোকেরাও বলে ওঠে, 'ঠিক করেছ, ভালো করেছে রামা ভাই।'

কালুরও এ ব্যবস্থা ঠিক মনে হল। ঝুড়ির ওপর উঠে দাঁড়ায় সে। আর সকলের মাথার ওপরে আলোকোজ্জ্বল আকাশের নীচে কালুকে দেবদূতের মতো দেখতে থাকে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয় কালু দেবদূত নয়, ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট-করা সেই কঙ্কালের দূত।

কালু ওপরে চড়ে বটে কিন্তু কিছুক্ষণ সে বিব্রত বোধ করতে থাকে, 'আমার আর কি বলার আছে? লোকদেরও এতে শোনারই বা আছে কি?' পরক্ষণেই কিন্তু জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে ভাই, আপনারা চাইছেন তাই এসে গেছি, বলুন কি জিজ্ঞেস করছিলেন?

নাথার বউ কঙ্কু বলে ওঠে, 'আমাদের একটা কথা কেবল বলুন, আপনি ডাকাতদের মধ্যে গেলেন কি করে?'

'ওতে আর বলার মতো কী আছে বউদি?' কালুর চোখের সামনে

ভেসে ওঠে ঃ সেই মরা জানোয়ারকে ছেঁকে-ধরা মানুষ-শকুনিদের দল, কাঁচা মাংসের দলা এবং চাপ চাপ রক্ত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে ওঠে, 'আমি ভগবানকে বলব যে অন্ধ করে রেখো সেও ভাল কিন্তু সাতজন্মেও কখনো এমন দৃশ্য দেখিয়ো না! আমি নিজের চোখে আমাদের গোরু-বলদকে কাটতে দেখেছি আর সেই কাটা জানোয়ারের ওপর, কিভাবে যে বোঝাব আপনাদের, ঠিক যেমন আমাদের এখানে মৃত জন্তুর ওপরে এসে বসে ছিল, শকুন ঠিক তেমনি, বুঝে নিন। সেই রকমই খামচা-খামচি খেয়োখেয়ি, তেমনিই আপসে লড়াই— একেবারে এক দৃশ্য। কালুর গলার স্বর স্তিমিত হয়ে আসে, চোখের কোণে জল এসে জমা হয়। কেশে গলা পরিষ্কার করে সে আবার বলে, 'আমি শ্মশান জাগানো কখনো দেখি নি, কিন্তু লোকেরা বলে শুনেছি যে শ্মশান জাগিয়ে তুললে নাকি নির্দয় এক ভূত আসে আর তার পেছনে পেছনে ভূতের পাল দলে দলে আসতে থাকে— শুকনো চুল, কঙ্কালসার দেহ খাই খাই চিৎকার করতে থাকে। কালু আবার কেশে গলা পরিষ্কার করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠিক সেই রকম, শুধু ভাই সেই নির্দয় ভূত সেখানে ছিল না, এই যা তফাৎ।

রামা বলে ওঠে, সেটাই তো দুঃখের বিষয়। নির্দয় ভূত থাকলে তবু সকলকে বশে রাখতো কিন্তু এতো— সব বাঁধনছাড়া গোরুর পাল।

'ঠিক কথা, ঠিক বলেছে রামা!' কাসম ঘাঁচী বলে ওঠে। রাগে ফুলতে ফুলতে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাত নেড়ে বলতে থাকে 'যাদের দয়ায় ঐ বর্বর ভূত এখানে এইভাবে শ্মশান জাগিয়ে তুলছে— আমাদের সেই জমিদার এবং রাজ্য সরকার নিজেদের খাসমহলে বেশ মেজাজ দেখিয়ে আরাম্‌সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোনা-রুপায় মোড়া খাটেতে বসে সুন্দর হুঁকো খাচ্ছে আর মশারী ঢাকা আরামের গদীতে শুয়ে ফুর্তি করছে। কালু যা বলেছে তাতে বিন্দু মাত্র ভুল নেই। এরা বাঁধনছাড়া জন্তু-জানোয়ার— গোরু-বলদগুলোকে তো ছুটিয়ে

নিয়ে চলে গেল। এবার বাড়ি লুটপাট হবার পালা। বুদ্ধি যদি থাকে তো সাবধান হও। এক দুই তিন দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। বারান্দায় ফিরে যেতে যেতে আবার বলে, তখন তো আবার বলবে আমাদের কেউ আগে বলে নি।'

এক মুহূর্তে সেখানে এমন নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় যে সন্দেহ হতে থাকে মানুষগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না তো?

কালু খাটিয়া থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে বসে। তখন লোকদের মধ্যে গলা খ্যাঁকারী ও নড়েচড়ে বসার শব্দ ওঠে। কয়েকজন বলে, 'ঘর লুটতে এলে তো যার ঘরে কিছু আছে তারই ভাবনা হবার কথা, তাই না?'

কয়েকজনে সায় দেয়, 'হ্যাঁ ঠিক কথা। তোমার আমার যা অবস্থা তাতে বস্তা ভরে আর কীই-বা নিয়ে যাবে? যা দু-এক দানা আছে সে লুট হবার আগেই পেটে চালান করে দেব।'

'ঠিক কথাই তো। বাঁধাছাঁধা করে বেরিয়ে পড়ে ভিন দেশের মাটিতে দেহ রাখার চেয়ে বাড়িতে আটচালা কী দোষ করল?' রামাও সেই লোকেদের মতে সায় দেয়…আর এইভাবে বিচার করতে করতে গাঁয়ের আধের্ক লোক নিজেদের অবস্থা খুলে প্রকাশ করে, 'রামা ভাইয়ের কথা মিথ্যে নয়। ডাকাত পড়লে দু-একমন দানা যা আছে তা নাহয় নিয়েই যাবে। এমনিতে তো আধের্ক আমরা মরেই রয়েছি, বাকী আধের্ক যা বেঁচে আছি— তা সে পনেরো দিন বাদে মরার বদলে নাহয় আজই মরে যাব।'

বেচাত, ভগা আর নানার মতো কিছু সম্পন্ন অবস্থার লোকেরা গাঁ ছেড়ে যাবার বিরুদ্ধে ছিল। নানা বলে, 'আমরা সকলে একজোট থাকলে ঐ ভীলেদের কী এমন ক্ষমতা রয়েছে যে গাঁয়ে এসে লুটে নিয়ে যাবে।

'হ্যাঁ ছো! ছো! কী এমন শক্তি ঐ ভীলেদের!' বেচাত যে এক্ষুনি ডাকাতদের হাত থেকে গোরু-বলদের পালকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এমন ভাব দেখায়।

'তাহলে এই ব্যাপারটাই ফয়সালা করুন সকলে।' রণছোড় মোড়লের ফ্যাকাসে মুখে কিছুটা রক্ত ফিরে আসে।

কাসম ঘাঁচীও খুশি হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, এরকম সাহস থাকলে কে আর বারণ করতে যাচ্ছে?' রণছোড় মোড়ল যেন বেরোবার আগে লোক গুণে দেখতে বসেছে এমনি ভাব দেখায়, 'বেঁধেছেঁদে বেরিয়ে পড়ার পর ধরো যদি রাস্তায় ভীলেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো, কী করবে? কী করেই বা ভেবে নিচ্ছ যে শেরপুরের মতো বড়ো গাঁয়ে লুঠ হবে না? তার থেকে বরঞ্চ এখানে বাড়িতে থাকলে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু রাখা যাবে।'

কালু চুপ করে থাকতে পারে না, 'আপনাদের সকলের ইচ্ছে না থাকলে জবরদস্তি কেউ বাঁধাছাঁদা করতে বলছে না। কিন্তু পরে বলবেন যে কেউ তো আমাদের বলে নি। আমি যে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করার বা খালি পেটে পড়ে থাকার কথাবার্তা সব অলস বেকার চিন্তা। এমন ধরনের কথা যারা বলছে, আজ, আমি পঙ্গপাল দেখেছি তারা কোনোদিন তা দেখে নি। কালুর শরীর এবং গলার স্বর কেঁপে ওঠে। 'আমি তো ভাবছি যে এতলোক এল কোথা থেকে? পাহাড় বিয়োল, নাকি, সব আকাশ থেকে খসে পড়ল?'

একটু থেমে আবার শুরু করে, 'কিন্তু ভাই পাহাড়ও বিয়োয় নি আর আকাশ থেকেও ঝরে পড়ে নি। ক্ষুধার তাড়নায় অন্য সব পাহাড় থেকে এসে ওরা আমাদের আবাদী জমিতে নেমে এসেছে··· এবং এখনো আসছে! মনে রাখবেন, কয়েকদিনের মধ্যে যদি না নদীর তীরের পাহাড় ভীলেতে ভরে না যায় তো—এক একটা পাহাড় মৌচাকের মতো না দেখায়, তো আমার নামে থুতু ফেলবেন আপনারা।' হুঁকো নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।'

'পালের কথা আমি মানছি, কিন্তু তারা এসে ফসলই তো নিয়ে যাবে, মানুষকে তো আর খেয়ে নেবে না?' রামা জিজ্ঞেস করে।

হুঁকো ভরতে ভরতে কালু বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসে। উনুন

থেকে নেওয়া আগুন চিমটেতেই রয়ে যায়। রামার দিকে তাকে এগতে দেখে লোকেরা ভয় পায়। জেনেশুনে ওকে পোড়াতে যাচ্ছে নাকি? কালুর ভাব-ভঙ্গি ও গলার স্বর সেই রকম ছিল, 'মানুষকেই খেয়ে যাবে বেমালুম!…কাঁচা কাঁচাই কেটে খেয়ে নেবে। তুই এখনও জানিস না কিছু…গাঁয়ে যারা বুড়োমানুষ রয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে আয়, বলিস— কখনও শুনেছে কি মানুষ মানুষকে খায়?… আরে, সেকথা যদি শুনেও থাকে তবু জিজ্ঞেস করিস যে মানুষ—তাও আবার মা তার পেটের ছেলেকে খেয়েছে কিনা?

কালু একটুখানি থেমে আশপাশের সবাইকে দেখে, 'কেউ বলবে না যে আমি শুনেছি। শুনেছি একথা বললেও আমি মানতে রাজী নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, 'এই ছাপ্পান্নের দুর্ভিক্ষে সেকথা শোনবার আর আমার মতো অভাগার দেখার সুযোগ মিলবে…এই আমার শেষ কথা।' পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে বলে, 'তাও যদি না মানেন তো ভুগতে হবে।'

আবার নীরব নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়।

রণছোড় মোড়ল বলতে থাকে, 'তাহলে সকলে মিলে ভেবেচিন্তে দেখ।'

'সকলে মিলেই তো রয়েছি এখানে। নাকি দু-একজনে যারা বাড়ি পাহারা দিতে রয়ে গেছে তাদেরও ডেকে আনতে হবে?' রামা বলে।

এরপরেই লোকদের খেয়াল হয়। 'কি কাণ্ড দেখো, আর আমার বাড়িতে কেউ নেই।'

'আমি তো ঠিক করে দরজায় শিকলি লাগিয়ে আসতেও ফুরসৎ পাই নি।'

পুরুষেরা সকলেই এখানে ছিল। স্ত্রীলোকেরা নিজেরা একলা ফিরে গেলে ভালো হত, কিন্তু ঘরে গিয়ে তারা একলা থাকবে কি করে?

অবশেষে প্রত্যেক পাড়ার দু-তিনজন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী ও বাচ্চাদের

পাঠিয়ে দেওয়া হল। অন্য লোকেরা ভাবতে থাকে যে কি করা কর্তব্য এখন। দুটো দল হয়ে গেছে দেখা গেল; একটা কালুর, দ্বিতীয়টা রণছোড় নানার।

প্রথম পক্ষের নিজের স্বার্থ বলে কিছু ছিল না, সেই তুলনায় দ্বিতীয় পক্ষের নিজেদের স্বার্থ তো ছিলই— অন্য দায়িত্বও ছিল। কাল যদি হঠাৎ সরকার জিজ্ঞেস করে, যে তুই মোড়ল সমস্ত গ্রামকে কেন নষ্ট করলি? তাহলে? কিন্তু সেটাও লোক-দেখানো যুক্তি। নইলে মনের ভেতরে তো হচ্ছিল, 'কালিয়ার কথা শুনতে হবে নাকি?'

নানা রণছোড় যদি গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করত তাহলে দেখতে পেত এতে কালুর নিজের লাভ-লোকসানের কিছু ছিল না। 'এ সময়ে যা বলা উচিত আমি সেই কথাই বলে দিলাম, এখন তোমরা যা ভাববার ভাবতে পারো। আমার নিজের কথা যদি জানতে চাও তাহলে বলব, গাঁয়ের আর সবাই যেখানে থাকবে আমিও সেখানে আছি।' এই বলে সে হুঁকো সাজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর পঞ্চায়েতও সেই একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে সমস্যাটাকে জিইয়ে রাখে···বৈঠক শেষ হবার সময় অবধি তর্ক-বিতর্কের পর বেচাতের জাতের দশ-বারোজন লোক নিয়ে কাজ চালানোর মতো পাহারা দেবার একটা দল তৈরি করা হল। কিন্তু গাঁ ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা হল না। রণছোড় মোড়ল কাসমকে বলে, 'আপনাদের মধ্যে কেউ দুজনে মিলে একবার শেরপুর ঘুরে আসুন অন্ততঃ। সেখানে থাকবার সুবিধে হবে কিনা দেখে আসবেন।' গাঁ পাহারা দেবার যে ব্যবস্থা হল সেটা কালুর পছন্দ হয় না। কিন্তু সে একা আর কী করবে? তার কথার আসল উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারে না। অথচ কেউ খোলাখুলি আপত্তিও করে না। কিন্তু এই শেরপুর যাবার কথায় সে ভীষণ ভাবে আপত্তি জানায়, 'না, যেতে যদি হয় তো পশ্চিমের দিকে যাব। না হলে যেখানে আছি তাই ঠিক আছে।' কারণ হিসেবে সে পুব আর পশ্চিমের চাষ-আবাদ ও নিয়ম-কানুনের তফাৎ উল্লেখ করে, শোনায়,

'এ সময়ে তো জমিদারের পক্ষীরাজ-ঘোড়াও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কোনো কাজেই আসবে না।'

রণছোড় মোড়ল এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, 'তাহলে কেউ ডেগডিয়া গিয়ে দেখে এসো।' সে বসার আসন কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

লোকেরাও সবাই হয়তো দেশ ছেড়ে যেতে হবে সেজন্য কিংবা গাঁয়ে গাড়ি কম থাকার জন্য অথবা বাড়ি থেকে বাইরে কী কী জিনিস নিয়ে যাবে, না যাবে সেই দোটানায় পড়ার ইচ্ছে না থাকার জন্য বা সে যে কারণেই হোক-না কেন সকলেই এমন-কি, কাসম পর্যন্ত উঠতে উঠতে বলে, 'তাহলে যাও ভাই, কাল তুজন মিলে কেউ ডেগডিয়া ঘুরে এসো একবার।'

এভাবেই ডেগডিয়া যাবার চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে গেলেও কিন্তু লোকেরা সকলেই বাড়ি ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাজ করতে শুরু করে। কেউ বউকে ঘুম থেকে তুলে তার পায়ের রুপোর বালা খুলতে লেগে যায় তো অন্যে চুড়ির থেকে রুপোর পাত খুলতে থাকে। কালু ভেতরের ঘরের পেছনের দেওয়াল থেকে তু-পাঁচ হাত জায়গা ছেড়ে ঘাস খড় দানা প্রভৃতি দিয়ে আর-একটা নকল দেওয়াল তৈরি করছিল, আর নানা রণছোড় বাক্স-প্যাঁটরা খুলে গয়নাগুলো বার করে বুড়ী মালীর কোলে জড়ো করে রাখছিল। কোদরও আঁস্তাকুড় থেকে গোবর তুলে এনে তাতে মুঠো মুঠো শস্য পুরে ঘুঁটে তৈরি করতে মেতে উঠেছিল…।

পরের দিন সকাল হল। তুজন সমগোত্রের লোকেরা দেখা সাক্ষাৎ হলে এক সাথে হুঁকো টানতে বসে বটে কিন্তু কেউ কাউকে গতরাত্রের নিজের চাতুরীর কথা প্রকাশ করে না। কেবল কালু— তাও শুধু কোদর রামা আর ভগা এই তিন জনকে বলে, 'আরে, ভেতরের দিকের ঘরে একটা করে চোরা দেওয়াল তৈরি করে রাখিস, আলাদা নতুন দেওয়াল বুঝলি…সময় এলে যদি পালাতে হয় তাহলে তুই দেওয়ালের মধ্যে বলদদের বেঁধে রাখলে ঠিক মতো রয়ে যাবে।'

এইভাবে দ্বিতীয় রাতে অন্য ধরনের কলাকৌশল চলে। যাদের

যত বেশি আছে তাদের ভাবনাও তত বেশি। এই হিসেবে সারা গাঁয়ের মধ্যে বুড়ী মালীর বাড়িতে যেন বেশি দুশ্চিন্তা। 'হতভাগারা নিজেদের মাগীদের গা থেকে গয়না সব খুলে নে···এত গয়না রেখেই যত জ্বালা হয়েছে দেখছি···যাও সব নিয়ে এসো আমার কাছে···' অন্য সময় হলে কোলে রাখা এই প্রায় আধ মন খানেক গয়না দেখে মনে খুশির ফোয়ারা উঠত কিন্তু আজ তার জন্যেই ভাবনায় শরীরের রক্ত জল হয়ে যেতে থাকে।

'মা, আমাকে দাও ও-সব, আমি কোথাও কোনো জায়গায় মাটিতে পুঁতে দেব' নানা বলে। বুড়ী চটে যায়, 'যা ভাগ্, পুঁততে এসেছে হতভাগা।' রণছোড় বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, তুমি তাহলে আমাকে দাও— আমি ভেবেচিন্তে যা ভালো বুঝব তাই করব অখন।' সে ভেবেছিল ঘরের দেওয়ালে এবং মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দুটো-একটা করে গয়না লুকিয়ে রাখবে।

কিন্তু বুড়ী ভুরু কুঁচকে সে বুদ্ধি উড়িয়ে দেয়, 'সে সবই আমার জানা আছে, হতভাগারা। তোমরা সব এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি অন্য কোথাও। মাথার এই চুল এমনি এমনি সাদা হয় নি।' বুড়ী নিজে যেমন তার বুদ্ধিকে বাক্সবন্দী করে রেখেছিল, তেমনিই গয়নাগুলোকে সব এক সাথে বোঁচকায় বেঁধে নেয়। আর সেই বোঁচকা নিয়ে ঘাটে গিয়ে বসে···

তারপর থেকে খাওয়া-দাওয়া সব হতে থাকে সেই গয়নার বিছানার পাশে বসে, কখনো বাইরে যাবার দরকার পড়লে গয়নার পুঁটলিটাকে গদীর নীচে চাপা দিয়ে ওপরে কিছু কাপড়-চোপড় এলোমেলো ভাবে রেখে নানাকে পাহারায় বসিয়ে তবে যেত।

বউয়েরা বলাবলি করে, 'যাবার সময় বোধ হয় বুকে বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

কেবল নানার খোঁড়া বউয়ের কিছুটা অন্য মত ছিল, সে বলত, 'ও মরেও যদি তবে সাপিনী হবে। গয়না যারা গায়ে দেবে তাদের প্রাণ নিয়ে ছাড়বে···'।

মরলে নাগিনী হবে কি না হবে সে তো একমাত্র ভগবান জানেন কিন্তু বুড়ীর প্রাণ দেহের থেকে ঐ গয়নার পুঁটলিতেই বেশি। সব ধ্যানজ্ঞান ওতেই।

কেবল মালীর কথা বলি কেন, কোদরের মায়ের প্রাণ পড়ে ছিল দুধেলা মোষ দুটোতে, রামার প্রাণ ছিল তার বাচ্চাদের ওপরে আর কালুর চাষের বলদ দুটোতে—

কিন্তু রাত হলেই সকলের মন-প্রাণ গাঁয়ের সদর তোরণে গিয়ে বসত যেন। কোথাও আওয়াজ হলেই, 'ঐ বোধহয় বন্দুক ছুঁড়ল। ঐ ওদের চিৎকার হল বোধহয়, ওধারে কালো মতন···মেঘের ধরনের ওটা কী দেখা যাচ্ছে যেন··· ।'

এইভাবে গাঁ এবং আশপাশের লোকেরা খাওয়া-দাওয়া ভুলেই গিয়েছিল। এখন রাত্রে ঘুমোনোও ভুলে গেল। সকাল হলে মুরগীর ডাক শুনতে পেলে তবে লোকদের বিশ্বাস হত যে বেঁচে আছে, বলত, 'আজকের দিনটা বাঁচতে পাওয়া গেল।'

॥ তেত্রিশ ॥

দুঃখের জাঁতা

একে তো গরমের দিন তাও আবার হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, আর মাথার ওপরে ঝুলন্ত ঐ ভয়ের খোলা তলোয়ার! দিন যেন কাটতেই চায় না। অনেকেই বলতে থাকে, 'বেচারা দিনের বোধহয় পা খোঁড়া হয়ে গেছে, কিংবা ক্ষিধের জন্যে হাঁটতে পারছে না।'

ডাকাতের হাতে গোরু-বলদ হারিয়ে আর কালুর কাছে পাহাড়ের সেই দৃশ্যের কথা শোনার পর দিন-রাত সব সময়ে সকলের নজর নদীর তীরের দিকেই পড়ে থাকে। খবর পাওয়া গেল দূরে কোথায় একজন মুদীর দোকানের মালপত্র লুঠ হয়ে গেছে।—'

আর দূরের কথাই বা কেন? দ্বিতীয় রাতে পাশের গ্রামেই চীৎকার ডাকাডাকি শুরু হয়, ঢোলের শব্দের সাথে সাথে বন্দুকের গুলির আওয়াজ ওঠে। একে অন্যকে সাবধান করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে ত্রস্ত গ্রামবাসীরা পালিয়ে গাঁয়ে এসে পৌঁছয়। কালুর গ্রামের লোকেরা এদের আশ্বাস দেবে, না সামনের গ্রামে চারিদিকে মশালের আলোয় ফুটে-ওঠা ছায়ামূর্তি দেখে পালাতে শুরু করবে, কিছু ভেবে পায় না।

সকলেই ভাবছিল, ওখান থেকে বেরিয়ে ডাকাতের দলবল নিশ্চয় এদিকের পথ ধরবে। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে ভাই, এখন আর কোনো উপায় নেই।

প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় যুবকেরা তলোয়ার, তীর-ধনুক নিয়ে তৈরি হলেও ভাবতে থাকে, 'মিথ্যে মরব না, যদি বুঝি যে যুঝতে পারছি তবেই লড়ব।'

কালুর স্মৃতিসৌধের বাসনা রাজুই বানচাল করে দিয়েছিল, 'পুরুষের ধর্ম' যে পৌরুষ তা সেই কঙ্কালসার প্রেতেরা মুছে দিয়েছিল, ,ভগবান তো এদের মেরেই রেখেছে.। তার ওপরে আমরাও মারব।

ক্ষিদেই যত নষ্টের গোড়া ভাই, মানুষ খারাপ নয়!' এই চিন্তার সাথে সাথে সে সকলকে বলে, 'আমি ঠিক করে নিয়েছি যে মারতে আসে যদি তবেই হাত তুলব, নতুবা নয়···তাতে সমস্ত গ্রাম লুঠপাট হয়ে যায় যদি যাক!

একদিন রাতে গাঁয়ের তোরণের কাছে বসে পাহারা দিতে থাকা বেচাত্তের দলবলকে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কতজনকেই-বা মারতে পারবে। আর তোমাকেও কি কেউ রাগের চোটে মারবে না, ভেবেছ?'

'মারার হলে মারবে', বেচাত উত্তর দেয়, 'বেঁচে থেকেই বা কি এমন রাজত্ব লাভ হবে?' বেচাতের এই ধরনের কথা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কেননা সে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই দশ সের করে শস্য ধার নিয়েছিল। এই রকমের কোনো কিছু বাহাদুরী না দেখিয়ে সে সেগুলো হজম করে কি করে? তা ছাড়া বাকী আরো দশ সের করে নিতে হবে তো।

কালু প্রায়ই বলত যে, 'শিয়রে শমন দাঁড়িয়ে আছে এই এসে পড়ল বলে।' তৃতীয় রাতেই গাঁয়ের উত্তর দিকে নদীর এপারে দোনালা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, গুড়ুম্ গুড়ুম্···একটা নয়, পরপর তিনটে আওয়াজ।

তখনো ওদের এসে পৌঁছতে যে সময় লাগবে তাতে ধীরে সুস্থে হুঁকো সেজে খাওয়া চলে, কিন্তু গ্রামের লোকদের মধ্যে থরহরি কম্প শুরু হয়ে যায়। কে কোথায় পালাবে না পালাবে সেই চিন্তাতেই সকলে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বউ যা জিজ্ঞেস করে স্বামী তার কিছুই বুঝতে পারে না। আর স্বামী সাবধান হবার জন্যে যা কিছু বলে স্ত্রীর মাথায় তা ঢোকে না। বাচ্চাদের কথা তো আর কহতব্য নয়। তারা তখন নিতান্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।···

তোরণের কাছে পাহারাদারদের মধ্যে বেচাত বলে ওঠে, 'তোমাদের বাপের দুর্ভাগ্য। কি আর করবে, লড়ো এখন। পালিয়ে বাঁচতে চাইলে যেখানে ইচ্ছে পালাতে পারো। তবে খানিকটা হৈ-চৈ

আমাকে করতেই হবে, নইলে প্রত্যেক বাড়ি থেকে দশসের শস্য নেওয়ার যে বাকী আছে তা আর কেউ দেবে না। কিন্তু দেখো, কারুকে জানে মেরো না, তা হলে মৌমাছির ঝাঁকে ঘা দেবার মতো অবস্থা হবে। একজনকে মারলে সকলেই তোমার দিকে ধেয়ে আসবে।'

আর সত্যি সত্যিই সবে-ফুটে-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের আবছা জ্যোৎস্নায় মৌমাছির ঝাঁকের মতো তাদের গ্রামের দিকে আসতে দেখা যায়। সেই রকম গুন্ গুন্ ক'রে আর দ্রুতগতিতে। যতই কাছে এগিয়ে আসতে থাকে ততই নানা রকম বিচিত্র শব্দ হতে থাকে। কয়েক-জনের রণহুঙ্কারের শব্দের সাথে সাথে জটিল অসুস্থতার কাতর আর্তনাদের মতো কান্নার শব্দ ভেসে আসে···।

'গুড়ুম' করে তোরণের পাশে কুয়োর সামনে এবার একটা আওয়াজ হয়।

কালু অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভলী, কঙ্কু ও অন্যান্য কয়েকজন বউ ও ছেলেমেয়েদের এক সাথে এক জায়গায় বসিয়ে রেখেছিল, 'আমি বললেই বলে উঠবে তার আগে নয়, আর পেছনের বাগানের ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। দেখো ভয় পেয়ে দূরে কোথাও যেয়ো না'···কিন্তু বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে শস্যের গোলায় বসে-থাকা বউ আর ছেলেমেয়েদের দল ভয়ে পাখির মতো ঝটপট করতে থাকে।

সারা গাঁয়ের এই একই অবস্থা। স্বামী স্ত্রীর কথা চিন্তা করছে না। স্ত্রী বাচ্চাদের কথা ভুলে যাচ্ছে। বাচ্চাকে কোলে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে তাকে ফেলে ছুটে পালানো মায়েরাও ছিল··· কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না, কেউ যেন কারুকে চেনে না···

ওদিকে মোড়লের বাড়িতে তো ডাকাত পড়ার আগেই সব লুঠপাট হয়ে যায়। বুড়ী মালী গয়নার পুঁটলী নিয়ে কে জানে কখন যে চুপিসারে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং কোথায় যে শেষ পর্যন্ত সে গেল তা কেউ বুঝতে পারে না। সেই গণ্ডগোলে হুড়োহুড়ির মধ্যে নানার

খোঁড়া বউয়ের ভালো পা-টাও যেন জখম হল। সে পাড়ার মধ্যেই বসে পড়ে চীৎকার করে বুক চাপড়াতে থাকে। বুড়ীকে খুঁজতে রণছোড় ও নানা একেবারে শেষ মুহূর্তে দৌড়য়— দৌড়তে দৌড়তে দুজনে ঝগড়া করতে থাকে। রণছোড় মোড়ল বলতে থাকে, 'হায় হায়, আমার মাথায় যে কি দুর্বুদ্ধি হল, আমি সমস্ত গয়না বুড়ীর কাছে সঁপে দিয়েছিলাম। এখন কোথায় তাকে খুঁজতে যাব?'

নানা রণছোড়কে মারতে তেড়ে আসে, 'দেখলি তো! আমি বলেছিলাম যে আমাকে দে, আমি কোনো জায়গায় পুঁতে রাখি। তুই সাত জন্মের কিপটে বুড়ী…ঠিক আছে! এখন কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ঐ গয়না যদি হারায় তা হলে দেখিস তোর কি অবস্থা করি আর বুড়ীকে তো কেটে ফেলব বলে দিলাম…'

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যারা ছুটে পালাচ্ছে তাদের থেকেও যারা তাদের পালানোর জন্যে দায়ী তাদের মাথা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেছে— কোথায় ঢুকবে না ঢুকবে সেই ভাবনায়। এই ঘরেতে খাবার কিছু পাওয়া যাবে, নাকি ঐ ঘরেতে? আগে বাক্স-প্যাঁটরা ভাঙবে, নাকি শস্যের জালাগুলো, কেউ কেউ তো মরবার আগেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে বসার মতো লুঠের মাল পুঁটলী বাঁধার জন্য কাপড় বিছিয়ে রাখছিল…

যার প্রাণে যা ইচ্ছে হল সে সেই করতে শুরু করে। কেউ ভাঁড়ার ঘর খালি করতে যায় তো কেউ ঝুড়ি-প্যাঁটরা কাপড় যা হাতে আসে তাইতেই ভরতে থাকে। কেউ সেই ভর্তি-করা ঝুড়ি টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে।…জালাগুলো যারা উল্টে পাল্টে দেখছিল তাদেরও ঐ একই অবস্থা। দই, দুধ ধান আর ভুষি যা পায় তাই সই। কেউ কেউ আবার ধান আর ভুষির পার্থক্যটাও গুলিয়ে ফেলে। যারা মুখে পুরছিল তারা যা পেল তাই নিয়ে পাগল। কেউ হাতের সামনের জিনিস ছেড়ে বেশি নেবার লালসায় যা সঙ্গে ছিল তাও গণ্ডগোলে নষ্ট করে ফেলছিল।

তাদের ছেলে-ছোকরাদেরও সেই একই অবস্থা। টানাটানিতে

আর মুখে পোরবার সময় মাটিতে যা-কিছু পড়ে যাচ্ছিল তারা সেগুলোর মালিক হচ্ছিল। আর সেও জীবনপণ করে জোগাড় করার মতো ব্যাপার। মাটির থেকে তোলার সময় ঘাড়ের ওপর কারোর পা পড়লে তো খতম।

কালুদের পাড়া গাঁয়ের পশ্চিমে একেবারে সব শেষে। কালুকে নিমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামা, নাথা ও পাড়ার অন্য দুজন জোয়ান ছেলে ছুটে না পালিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

'কী ভাবলে তা হলে, কালু ভাই।' রামা জিজ্ঞেস করে।

কালু হেসে বলে, 'ভেবেছি তো অনেক কিছুই ভাই। আমার একবার ইচ্ছে হচ্ছিল যে এদের মোকাবিলা করি, সঙ্গে সঙ্গে এও চিন্তা হচ্ছিল আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই তখন শুধু শুধু জীবনটাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কি হবে?'

'তোর কাছে মংলিয়া রয়েছে। সেজন্যে হয়তো তোর বাড়ি লুঠতে নাও পারে। দেখে মনে হচ্ছে ও তো জামা আর ধুতি খুলে ঐ দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। দেখছিস, কি রকমভাবে বেড়ার ওপর নির্বিকার বসে রয়েছে।'

মঙ্গল দেখতে পায় যে সেই মশাল এদিকেই আসছে।

তাই দেখে নাথা বলে ওঠে, 'এদিকেই তো আসছে। মুশকিলে পড়ে যাব না তো কালু।' বলতে বলতে নাথা তীব্র বেগে দৌড়ে পালায়। আর তার পেছনে পেছনে ঐ যুবক দুজনও যায়। রামা ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে বলে, 'তা হলে কী ঠিক করলি, কালু?'

'তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি।'

রামাও সরে যায়। ওদিকে কালু পালাবার বদলে হাতের তীর-ধনুক নিমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখে। জামা আর পাগড়ী খুলে ফেলে কেবল দড়িতে বাঁধা ছুরিটি গলায় ঝুলিয়ে নেয়। পরনের ধুতিটাকে খুলে লেঙ্গটের মতো করে কোছা লাগিয়ে পরে। পরক্ষণেই তীর-ধনুক নিয়ে বাঁদরের মতো দ্রুত নিমগাছে উঠে একেবারে মগডালে গিয়ে বসে।

পাড়ার দুদিক দিয়ে দলটা এগিয়ে আসে। যে যেদিকে পারল ঢুকে পড়ল। বাদবাকী জনা দশেক লোক কালুর বাড়ির দিকে মুখ ফেরায়।

কালু বাড়ির দরজা খুলে রেখেছিল। মঙ্গল দরজার পাশেই বেড়ার ওপর শুধু লেংটি পরে বসেছিল। দলটাকে আসতে দেখেই সে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'বাড়িতে কিছুই নেই ভাই। আমি তো না খেয়ে মরছি এখানে···আমাকে সঙ্গে করে তোমরা নিয়ে যাবে?'

কিন্তু কালুর এ চাতুরী ব্যর্থ হয়ে গেল। কে শুনবে এখন ওর কথা? দলটা সোজা ওর ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কালুর রক্ত গরম হয়ে ওঠে, 'নামব কি নামব না, ওদের রুখে দাঁড়াব, না ছেড়ে দেব?' ভাবনা তো কেবল সেই চোরা দেওয়ালের আড়ালে রাখা বলদ দুটোর জন্যে; অন্য আর কিছু তো ওরা করতে পারবে না, কেবল খালি জালা বয়েমগুলো ভাঙা ছাড়া। ফসল যা ছিল সব অনেক আগেই সরিয়ে ফেলেছিল— পুঁটলি বেঁধে বেঁধে ছাইয়ের গাদায় আলাদা আলাদা করে পুঁতে রেখেছিল। রান্নার উনুন আর জল রাখার জায়গা এমন করে সাজিয়ে রেখেছিল যে দেখে মনে হবে যেন মাস খানেক আগেই বাড়ি ছেড়ে লোকেরা চলে গেছে কোথাও।

সবার ওপরে, 'আমি বালা প্যাটেলের ছেলে। আমার বাড়ি লুঠ করবে?' এই আত্মাভিমান মনে বাজছিল। 'তাও আবার আমার চোখের সামনে?'···কালু খাপ থেকে ছুরিটা খুলে কোমরে গুঁজে তীর-ধনুক নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এসে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকতে থাকা অন্য লোকদের সঙ্গে মিশে যায়।

মঙ্গল তখনো বেড়ার ওপরে বসে ছিল। এমনিতে কালু তাকে অনেক ফন্দি শিখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এই ভূতের দলকে দেখে মঙ্গলের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তার পক্ষে তখন মাথা খাটিয়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না।

'কী রে মঙ্গল ?' কালুর সামনে যেতে যেতে একজন জিজ্ঞেস করে। কালু তাকে চিনতে পারে। সে কনকা লীবা। কিন্তু মঙ্গল তার মামাকে চিনতে পারে না···চিনতে পারলেও মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে ; যেন বুঝতেই পারছে না। কোথায় তার মোষের মতো চেহারা কনকা মামা আর কোথাকার কে এই কঙ্কালসার লোকটা।

মামা ভাগ্নেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু কে জানে কেন, মঙ্গল চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দেয়।

কালু মঙ্গলের ওপর চটে যায়। 'এ ছোকড়াকে এমন কী দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে যে' তার চটে ওঠাতে কনকার থেমে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু থামতে না দেখে মামা ভাগ্নের এই মিলনের মধ্যে তাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে হয়। কনকার কানে কানে সে বলে, 'কনকা ভাই, একবার তুই বাড়ির মধ্যে চল্। এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে বলে দে যে এ বাড়িতে কোথাও কিছু নেই। আর এই দলকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যা। তা নইলে সবার আগে কিন্তু এই ভাগ্নার মৃত্যু আমার হাতে।'

কনকা বুঝতে পারে কথাটা, সে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কালুও পেছন পেছন দলের সাথে মিশে যায়।

'আরে, এই এখানে আছে বোধহয়, এখানে রয়েছে', বলতে বলতে কনকা ধনুকটা দুটো একটা জালার মধ্যে ঢুকিয়ে নেড়ে দেখে। সেখান থেকে পেছনের ঘরে যায়। পাঁচ-সাতজন ছেলেমেয়ে বউও তার সঙ্গে ছিল আর তাদের সকলের সঙ্গে কালুও···

পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কনকা চীৎকার করে বলে, 'ওরে, এখানে তো কিছুই নেই, চল্ চল্ ঐ দিকের ঐ বাড়িতে চল্, নাহলে আগেই সব লুঠ হয়ে যাবে···চল্ চল্···

সাথে সাথেই কুড়ি-পঁচিশ জন লোক, 'চল্ রে চল্' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর তাদের সঙ্গে কালুও।

'কিন্তু ভাই, একটা কাপড় অন্তত তোমাকে দিতেই হবে।' কনকা বলে।

'কোথা থেকে দেব?' বলে কালুর ভাবনা হয়, 'শালা এখন সুযোগ বুঝে পেয়ে বসেছে। সহজে তো নিষ্কৃতি দেবে না।'

'আমি কিছু খাবার দানা পেছনের মাঠে জড়ো করে রেখে এসেছি, কাপড় না হলে নিয়ে যাব কি করে?'

'ঠিক আছে, তা হলে এক কাজ কর্, মঙ্গলের ধুতিটাই নিয়ে যা, তা হলে।'

কনকা সেটাই নেয়। তবে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার শর্তে রাজী হয়।

'এই ভূতের দল কখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে কনকাভাই? এরা তো লুঠপাটের চেয়ে জিনিসপত্র ভাঙছে চুরছে বেশি।'

'ব্যস, তোরণে পৌঁছে বন্দুকের শব্দ করলেই পালাবে সব,' বলে কনকা ধুতিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, কালুও। ভয় তার এখন বিন্দু-মাত্র ছিল না। বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে ভাবনা হচ্ছিল বটে, কিন্তু গ্রামে একবার টহল দিয়ে আসার বাসনাও ছিল। কনকার পেছনে দলের সঙ্গে সেও চলতে শুরু করে।

গাঁয়ে যেন জিনিসপত্র নিয়ে অর্ধনগ্ন লোকের মেলা বসেছিল। মশালগুলো দেওয়ালীর আলোর মতো মনে হচ্ছিল। কালু এদের খেয়াল করে দেখতে থাকে; এদের মধ্যে গাঁয়ের পাহারাদার ক'জন আছে আর ক'জন সত্যিকারের ডাকাত?

বন্দুকের শব্দ করে এই দলকে গাঁয়ের বাইরে চলে যাবার সঙ্কেত সূচনা দেবার জন্যে কনকাকে কালু সাথে করে গাঁয়ের তোরণের কাছে পৌঁছে দিয়ে তবে সে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়। অধীর আগ্রহে সে যখন বন্দুকের আওয়াজের পথ চেয়ে বসে আছে তখন একদল মশাল হাতে আবার ওর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। এবারে কালুকে পেছনের ঘরের মাচায় উঠে লুকিয়ে পড়তে হয়। সেখানে বসে বসে সে দলটা ঘরে ঢুকছে বুঝতে পারে, এদিক-ওদিক কিছু ভাঙাচোরার শব্দ শুনতে পায়। কিছুক্ষণ ব্যর্থ পরিশ্রম করার পর দলের লোকেরা বাইরে বেরিয়ে গেল বলে মনে হল তার। তখনই মঙ্গলের আওয়াজ শোনা গেল, 'না, জাঁতাটা নিয়ে যেতে দেব না…

আমিও কনকা মামার ভাগ্নে···নিজেদের মধ্যে আপস ঝগড়া হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি কিন্তু'···মঙ্গলও তাদের পেছন পেছন যেতে থাকে।

কালু বেড়ালের মতো মাচা থেকে নেমে আসে। ভেবেছিল, যদি জাঁতা নিয়ে যায় তো যাকগে যাক্ কিন্তু—'

কিন্তু ততক্ষণে ওরা মঙ্গলের কথা মেনে নিয়েছে। 'আরে, তুই তো আমাদেরও ভাগ্না', এই বলে জাঁতাটা নাথার ঘরের সামনে রেখে তারা চলে যায়। মঙ্গল জাঁতাটা উঠিয়ে আনতে না পেরে তার ওপরই চেপে বসে পড়ে।

কালু বাইরে বেরিয়ে দেখে পাড়ায় তখনও দু-চারটে মশাল এখানে সেখানে জ্বলছে। এমন সময়ে শব্দ শোনা গেল, 'গুড়ুম' আর মশাল সমেত লোকেরা গ্রামের ফটকের দিকে ছুটতে থাকে।

'কিন্তু এ আবার কি? মশালের আলো না জ্বালিয়ে দুটো ছায়ামূর্তি আবার এদিকে আসছে যে?' সদরের সামনে ছোটো চাতালে বসে শঙ্কিত কালু বিড় বিড় করে বলে।

'ওখানে কিছু আর রেখে যায় নি আগের দলেরা', মঙ্গল বলে। কালু উঠে গিয়ে দরজার পেছনে লুকিয়ে দেখতে থাকে।

সেই ছায়ামূর্তি দুটি সোজা ঘরে এল। একজনের হাতে খোলা তলোয়ার। অন্যজনের হাত খালি।

দরজার সামনেই তলোয়ার হাতে লোকটা অন্য ছায়ামূর্তির হাতের কব্জি ধরতে দেখে কালু ভয় পেয়ে যায়, 'শালা মেরে ফেলার জন্যে ধরে এনেছে নাকি?'

কিন্তু তারপরেই সে বুঝতে পারে দ্বিতীয় ছায়াটা মেয়েছেলের··· তখন লজ্জায় কালুকে ভাঁড়ার ঘরের কোনে লুকোবার চেষ্টা করতে হয়।

'গুড়ুম' দ্বিতীয়বার আওয়াজ হল···আর তৃতীয় আওয়াজের পরে কেউ বলতে পারে না যে সারা গাঁ গমগম করে ওঠার মতো অত লোকেরা এখানে এসেছিল। পেছনে তাড়া করে, মিছে মিছি খানিকটা লাফালাফি করে তোরণের পাহারাদাররাও গাঁয়ে ফিরে

আসে। কালু না বলে থাকতে পারে না, 'এগিয়ে দিয়ে আসতে গিয়েছিলি নাকি, বেচাত ?…'

অনেকক্ষণ বাদে নদীর এদিকের পাড়ে মশালের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেল। তোরণ থেকে ফিরে আসা গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে কালু বলে, 'বাঃ চমৎকার, শালার নেশাখোড় মাতালগুলো লুটপাঠ করার পরেই বোধহয় মদ খেতে গিয়েছিল।'

রামা বলে, 'আরে চুরির মালের ভাগ-বাঁটোয়ারাতে—'

কালুর কথাই ঠিক দেখা গেল।

নদীর এদিকের তীর ধরে মশালগুলো ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে। গানের গভীর মধুর এবং উচ্ছল আওয়াজ— অনেকের সমবেতধ্বনি ঐকতানে মিলে— পাহাড় ও আকাশ মুখরিত করে তোলে।

'ভাই যা সপনে তে কাল হে পড় জ্যো রে অলখা ভরোড়
ভূখজ্যে দারড়ী পীছো হে রে
ময় তো গাঁমঠ জ্যো বালয়ো হে রে অলখা ভরোড়
ময় তো কুণ হে রোকণবালো রে'

(ভাই এটা ছাপ্পান্নোর মন্বন্তর। ও, অলখা সর্দার, আমার ক্ষিধে পেয়েছিল বলে আমি মদ খেয়েছি। আমি ঠিক করেছি এবার থেকে শুধু মদ খাব, ও অলখা সর্দার, দেখি কে আমাকে থামায়।)

গানের সব কথা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাদের আনন্দ-উল্লাস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই মদের নেশায় বুঁদ ভীলেদের উচ্ছ্বসিত কলরবে পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ-ঘাট গুঞ্জরিত হতে থাকে : 'ট র র র র র…ঈ…ঈ…'

তোরণ থেকে ফিরে গাঁয়ের আর সকলে যখন ঘরদোরের অবস্থা দেখছিল কালু সে সময়ে তার সদরের ছোটো চাতালে বসে হুঁকো টানছিল, ঐ উল্লাসধ্বনি শুনে সে না হেসে পারে না। বলে, 'বাবা যে বলত তাতে একটুও ভুল নেই! যেমন পাহাড় ঠিক তেমনিই এই ভীলেরা!'— দাবানলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবার পরেও আবার গজিয়ে

উঠতে দেরি হয় না, দারুণ গরমেও বাতাসে হেলে দুলে মাথা নাড়ায় আর বর্ষাকালে বৃষ্টির দিনে তো মদের নেশা লেগে যায়। অল্প কিছুক্ষণ বাদে সে আবার আপন মনে বকে, 'আজীবন দুঃখকে এভাবে হাসিমুখে সহ্য করে পৃথিবীতে যদি কোনো জাত থাকতে পারে তো সে এই ভীলেরাই।' আর এমনভাবে সে মাথা দোলাতে থাকে যেন ভীলেদের ওপর খুশি হয়ে সে মাথাটাই মেঝেতে ঠুকে ফাটিয়ে ফেলবে। পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবহমান সেই উল্লাসধ্বনি সে কান পেতে শুনতে থাকে এবং কে জানে কেন সে খুশি হতে থাকে।

॥ চৌত্রিশ ॥

মালীর মৃত্যু

গাঁয়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো শয়তানের চেলা-চামুণ্ডেরা সেখানে এসেছিল। উনুন, মাটির জালা, বয়েম সব ভেঙে রেখে গেছে। দুধ-দইয়ের সরা, রান্নার হাঁড়ি, ঘড়া-কলসী টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে ছিল। কোথাও কোথাও চোরা দরজা রয়েছে মনে করে দেওয়ালের খুঁটি পর্যন্ত বার করে দিয়ে গেছে। ফসল লুকিয়ে রাখা আছে ভেবে ভাঁড়ার ঘর আর ভেতরের ঘরের মেঝে খুঁড়ে গর্ত করেছে, এবং তাইতে দু-চারজনের ফসলও লুঠে নিয়ে গেছে। গতবারের গোরু মোষ লুঠের সময় যে দুধেলা মোষ আর বলদ বাছুর বেঁচে গিয়েছিল, এবারে তার মধ্যে যা সামনে হাতের কাছে পেয়েছে সব নিয়ে গেছে। কারুর কারুর বাড়ির জাঁতা, হামানদিস্তে এবং ঘরের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে।...সারা গাঁয়ের মধ্যে কেউ যদি অব্যাহতি পেয়ে থাকে তো সে কালু, আর সব চেয়ে যাদের লোকসান হয়েছে তা হল রণছোড় ও নানারা।

বাক্স ভেঙেছে। জালা, বয়েম চুরমার করেছে। দুগ্ধবতী চারটে মোষ-বাছুর সমেত নিয়ে গেছে। ঘোড়া আর হামানদিস্তে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে ; দরজা, জাঁতা ও তামা পেতলের বাসনপত্র রেখে যাবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নানার খোঁড়া বউয়ের গায়ে কাপড়ের একটা সুতো পর্যন্ত রাখতে দেয় নি। আর সেই আধ মন গয়না...

সকাল হয়ে আসতে চলল তবু বুড়ী মালী যে কোথায় গেছে তা খুঁজে পাওয়া গেল না। ঘরের মাচা দেখা হল, খড়ের গাদা তোলপাড় করে ফেলা হল, পেছনের বাগানে দরজার ধারে ছাইয়ের গাদা উল্টেপাল্টে দেওয়া হল। ক্ষেত এবং টিলা অবধি গাঁয়ের যুবকেরা ঘুরে আসে কিন্তু বুড়ী কোথাও থাকলে তবে তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে ?

বাড়ির আর গাঁয়ের সবাই ভাবনায় পড়ে যায় : 'তা হলে বুড়ী গেল কোথায় !'

ভোরের আলো ফুটতে গাঁয়ের পনেরো-কুড়িজন লোক আবার তাকে খুঁজতে বেরোয়। এবারে এদের সাথে কালুও আসে। সে নানাকেই সঙ্গে নেয়, 'চল তো ঐ সাদা জলের ডোবার ধারটা দেখে আসি।'

'আরে, সাদা কালো সব ডোবাই দেখে এসেছি।' নানা বুড়ীকে খুঁজে পাবার আশাই ছেড়ে দিল।

'ঠিক আছে, তা নয় হল— ধরে নে যে গয়না লুঠে নিয়েছে কিন্তু বুড়ীর হল কি ? তুই আমার সঙ্গে আয় তো দেখি।'

কালুর তুদিকেরই চিন্তা ছিল। সে যদি বুড়ীকে খুঁজে বার করতে পারে আর তুর্ভাগ্যক্রমে গয়নার পুঁটলি যদি পাওয়া না যায় তো তা হলে সব দোষ ও বদনাম তার ঘাড়ে পড়বে আর যদি খুঁজে না পায় তা হলেও লোকেরা তাকে সন্দেহ করবে।

কালুর আশঙ্কা হচ্ছিল যে বুড়ি হয়তো পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে পালাতে পালাতে সোজা টিলার ওপর উঠে কোনো খাদেটাদে লুকিয়ে পড়েছিল আর···হয়তো সাপে কামড়েছে কিংবা গাঁয়ের চৌকিদারের কেউ যদি তাকে দেখতে পায়···মোদ্দা কথা বুড়ি আর বেঁচে নেই।

হয়েছিলও ঠিক তাই ! তুটো বড়ো পাথরের মধ্যের খাঁজে বুড়ি পড়ে ছিল। মনে হচ্ছিল যে, কোনো বিশালকায় সারস সাদা পালক ছড়িয়ে রয়েছে।

নানাই প্রথমে সেটা দেখতে পায়, 'এই যে, এখানে মরে পড়ে আছে।' নানা গয়নার পুঁটলি খুঁজতে শুরু করে। আর কালু বুড়ীর নগ্ন দেহ মাথার পাগড়ীর কাপড় খুলে জড়িয়ে দিতে থাকে। সে বলে ওঠে, 'হায় ভগবান, শেষে এই দশা হল।' নানাকে ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে সে বলে— একটু মাথাটা ঘামাবি তো ! বুড়ীর পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে যে, গয়নার পুঁটলিটা কি আর সে ফেলে রেখে যাবে ? যা, গিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়···

দেখছিস না কোমর ভেঙে দিয়েছে। মাটিতে পা ঘষে ঘষে গর্ত করে ফেলেছে দেখেছিস।' আর নিজের মনে মনে সে বলে, 'প্রাণ বেরুনোর সময় ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকবে হয়তো... !'

সারা গাঁয়ে একটা ভয়ের ছায়া নেমে আসে। বউদের কাছে, নিজের পেটের ছেলেদের কাছে বুড়ী যেন চরম শত্রু হয়ে ওঠে। নানা তো পষ্টাপষ্টি বলে, 'বলত যে মরেও যদি যাই তো বুকে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত করলও তাই।...'

শ্মশানে যাবার জন্যে মৃতদেহ বার করা হলে তার কোমর শুধু একফালি পুরোনো কাপড় কৌপিনের মতো জড়ানো দেখে সারা গাঁ বলে ওঠে, 'আহা রে, বেচারী...আমার আমার করত কেবল। আর ভাগ্যের কি খেলা দেখ। নইলে আশী বছর বয়সে বুড়ী মরেছে। ওর জন্যে কোথায় হীরে জহরতে মোড়া কাপড় আসবে, না এক টুকরো কাপড়।'

স্ত্রীলোকেরা নদীতে চান করতে গেলেও সেই কথাই হতে থাকে, ভাই, বুড়ীর কপালে বোধহয় এটাই লেখা ছিল। বেচারা বউদের গলা দিয়ে খাবার নামতে দিত না। ওর জীবদ্দশায় যতগুলো জন্ম হয়েছে সব গুণে দেখ দেখি একবার...। তারপর হিসেব করে যা এই আশী বছর বয়স অবধি বুড়ি কতজনের মৃত্যুতে কলা দেখিয়েছে এতদিন ধরে।'

'অনেককেই মেরেছে। দশটার কম তো দুধেলা মোষ কখনো তার বাড়িতে আমি দেখি নি। আর বছরে পাঁচটা করেও বাছুর ধরলে কত হয়? হিসেব করে দেখো!' শঙ্করদার স্ত্রী বলে।

কয়েকজন যুবতী সেই সংখ্যাটা হিসেব করে বার করতে চেষ্টায় থাকে, আর বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা, 'বেচারীর শ্রাদ্ধতে মিষ্টি তৈরি হবে না বোধহয়,' এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা করতে থাকে, 'আহারে বাসনা অপূর্ণ রেখেই যাবে ওপারে।'

বৃদ্ধারা ভাবতে থাকে, তাহলে কি আমাদেরও এই দশা হবে নাকি? এ ধরনের প্রশ্ন তুলে তারা মৃত্যুর আগেই পরকালের কথা

চিন্তা করতে থাকে।

শ্রাদ্ধের মিষ্টি তো দূরের কথা, শ্মশানযাত্রী গাঁয়ের লোকেদের কল্কেতে দেবার তামাকের টুকরো, আধে´ক সাইজের নাড়ু জোটে। তাও বাড়িতে তৈরি করা নয়। শঙ্করদার বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে আসতে হয়।

বুড়ীর মৃত্যুর অশৌচ সেদিনই ভঙ্গ করা হয় আর তার চিতাভস্মাবশেষ' নদীতে দেবার কথায় নানা বলে ওঠে, 'নদীতে ফেলব এবারে নয় পরের জন্মে! যদি আবার ওর পেটে জন্মাই তবেই?'

নানা মুখে প্রকাশ করে দেয়, কিন্তু রণছোড় মুখে না বললেও মনে তারও বেশ রাগ হচ্ছিল, আর কেনই বা হবে না? কাল এই সময় পর্যন্ত ঘরের উঠানে জমিদার বাড়ির ঠাটবাট ছিল আর আজ সারা গাঁয়ের মধ্যে এরাই সব থেকে গরিব—একেবারে ভিখিরি! সম্পত্তি বলতে শুধু দুটো বলদ রয়েছে, তাও রণছোড়ের বউয়ের বুদ্ধির জন্যে। সে বলদ দুটোকে দড়ি খুলে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাই, গোয়ালে বাঁধা থাকলে সে দুটোও যেত।

কালু না বলে থাকতে পারে না, 'তোমরা তা হলে কী সামলালে? বন্দুকের আওয়াজ শোনার অনেকক্ষণ পরে লুঠপাট করতে এসেছিল, ততক্ষণে তো ভেবেচিন্তে কিছু ঠিক করে নিতে পারতে—'

'আরে, আমি তো ফসল সব পুঁটলি বেঁধে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম পালাবার সময় এক-একজন এক-একটা নিয়ে যাবে…কাপড়েরও পুঁটলি বেঁধে রেখেছিলাম কিন্তু ডাইনী বুড়ী আমাদের সব ভুলিয়ে দিলে। গয়নার ঝোলাটা বুড়ী এতদিন বুকে বেঁধে ঘুরে বেড়াত, আমি ভাবলাম আমাদের নানা কাজের ঝামেলা রয়েছে, নাহয় বুড়ীই এটা সামলাক। হতভাগীকে কলেরায় ধরল যেন সেই বন্দুকের আওয়াজ হতেই। এটুকু তো বলে যেতে পারত যে আমি পালাচ্ছি রণছোড়। আমরা ওকে খুঁজতেই ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় দরজার কাছে আওয়াজ ওঠে। তখন আর ফসল ও কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে যাবার জন্যে কি অপেক্ষা করা চলে?'

'বুদ্ধির বৃহস্পতি সব, ট্রাঙ্কে তালা লাগাতে গেলে কেন? তার চেয়ে খুলে রাখলে পূর্বপুরুষের ঐ একটা স্মৃতিচিহ্নও বাঁচতে পারত তো?' কালু সমস্ত রাগ প্রকাশ করে ফেলে।

'ভাই, যাবার হয় যখন তখন সোজা জিনিসও উল্টো মনে হয়। না হলে তুমিই বলো, এই বুড়ীর পালানোতেই সব-কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এ-সব কপালের গেরো নয় তো কি?'

শঙ্করদার কথাকে সকলে মেনে নেয়, 'কপাল দোষ ভাই, কপাল দোষ! তা না হলে দুধ-ঘি দিয়ে মুখ ধুতো বুড়ী, আর তার মৃত্যুর পর একটা কচি ছেলেরও খাবার জোটে না। এও ভাগ্যের খেলা না তো আর কি?'

চিতায় বুড়ীর শবদেহ রাখা হলে একজনে বলে ওঠে, 'ও ভাই, বুড়ীর মুখশুদ্ধি করবে না?'

নানা চটে ওঠে, 'হতভাগী, আমাদের হাতে রুপোর আংটিও যদি থাকতে দিতে তো সেটা কেটে রাখতাম। শবের ওপর কাঠ রাখতে রাখতে আবার বলে, 'ও-সব ঠিক আছে, আধমন গয়নার সবটাই তো সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

কালুর মন ছেলের ওপর ঘৃণায় ভরে যায়। সে নিজের আংটি থেকে এককণা ভেঙে বুড়ীর মুখে রেখে আসে।

দূরে বসে থাকা বৃদ্ধদের মধ্যে শঙ্করদা স্বগত বলতে থাকে, 'বলি-হারি ভগবান, তোমার লীলা! চিরটাকাল ওকে 'অপয়া অপয়া' করত আর সেই অপয়ার আংটি অন্তিম সময়ে কাজে এল!'

এ কথা শুনে লোকদের মনে হল, ভগবান যেন বুড়ীকে শিক্ষা দেবার জন্যে এই শাস্তি দিলেন।

কিন্তু সেই-সব লোকেরা কি আর জানত যে মালীকে উচিত শিক্ষার সাজা দেওয়া হল, সে মালী অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে, না হলে—কালুর দেওয়া ঐ রুপোর টুকরোটা 'থু' করে থুতু দিয়ে ফেলে দিত না?

চিতা নিভে যাওয়ার পর গায়ের লোকেরা চান করে বাড়ি ফিরে

আসে।

ঘরের দিকে তাকিয়েই রণছোড়-নানা চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, আর ছোটো বাচ্চাদের মতো জোরে জোরে শব্দ করে কাঁদতেই থাকে।

দুনিয়ার আর-সকলেও ওপর ঐ রকমই ভাব দেখায়। মুখে বলে, 'কান্না কেন আসবে না ভাই। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে বুড়ি ছেলেদের বড়ো করেছে। ন মাস ধরে পেটে ধরেছে। বাপ-মাকে কার না মনে পড়ে?' কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকলেই এই কান্নাকাটির আসল কারণ ঠিকই বুঝতে পারে, মনে মনে বলেও, 'বুড়ি মরেছে সে না হয় ঠিক আছে কিন্তু সাথে সাথে বাড়ির লোকদের সব মেরে গেছে যে। তা হলে কান্না আসবে না কেন?'

কিন্তু সামাজিক প্রথানুযায়ী কান্নাকাটি করা কি কপাল চাপড়ানোর সময়েও বউয়েরা চিৎকার করেই বলতে থাকে, 'যেমন বলত তাই করল রে শেষ অবধি···ও মাগো, হায়—হায়—হায়—বুকে বেঁধে নিয়ে গেল রে, বুকে বেঁধে।'

নানার খোঁড়া বউ গালাগালি দিতে থাকে, 'হতভাগী মাগীটা, পরতে তো দিলই না আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল। গত জন্মের শত্রু ছিল।'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে ছিল নানা, অপ্রিয় চক্ষুশূল খুঁড়ির বচনও তার মধুর লাগে। সায় দিয়ে সে গজগজ করে, 'এমন জায়গায় গেছে যে পেছনে ঘোড়া ছোটালেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না।' নানা মনে মনে তখন ভাবছিল যে বুড়ী যেন গয়নার পুঁটলি নিয়ে আকাশপথে চলে যেতে যেতে তাদের বলে যাচ্ছে— বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে, 'নাও হতভাগারা, এবার পরাও দেখি গয়না তোমাদের মাগীদের। আমি তোমাদের পইপই করে বলতাম আমাকে কষ্ট দিয়ো না। নিজেদের বউ-মাগীদের একটু শেখাও পড়াও— ওদের বলো যে আমার সাথে চোপা করে কথা না বলে··· বাবা রে বাবা! তোমাদের বউদের হাতে ভুট্টার রুটি খেয়ে তে

আমার মুখের মাড়ী ছড়ে গেছে···এখন বুঝে দেখ। পরাও গয়না তোমার নতুন বউকে···আমি বলি নি তোমাদের ?' ভাবতে ভাবতে নানা তার কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসে। রাগে অন্ধ হয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চীৎকার করে ওঠে, 'খুব পালিয়ে গেলি, ঠিক আছে যা··· কিন্তু মনে রাখিস ওখানে স্বর্গে পৌঁছেও যদি না তোর গলা দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে না ফেলেছি জানবি তোর পেটে আমি মানুষ নই, পাথর জন্মেছিলাম।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

জীবনের উত্থান-পতন

একদম নিঃস্ব হয়ে যাওয়া রণছোড়ের বাড়ির লোকেরা সকালে কী খাবে তা নিয়ে আজ ভাবনা ছিল না। গাঁয়ের লোকদেরই বরং লোক-লৌকিকতার ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছিল। শংকরদা কোদর প্রভৃতি কয়েকজন মিলে দুধ মাখন দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে অশৌচের খাবার খাইয়ে নিয়ম রক্ষা করে, কিন্তু বিকেলের খাওয়ার কী হবে?

রণছোড়ের ধনসম্পত্তি নাহয় চলে গেছে, কিন্তু তার মান-ইজ্জত তো রয়েছে। কিন্তু এখন তাতে কোনো কষ্ট হয় না। ডেগড়িয়া বা শেরপুরের বেনের দোকান থেকে ফসল কিছু ধারে আনা যেতে পারত কিন্তু এখন এই সময়ে গাঁয়ের বাইরে পা বাড়ায় আর এই পাঁচক্রোশ পথ ঠিকমতো সব-কিছু বাঁচিয়ে রেখে ফিরে আসার মতো বুকের পাটা কারুর থাকলে তো?

আর গাঁয়ে এখন···সব থেকে বেশি ফসল কালুর ঘরে এবং শংকরদার ঘরে ছিল। অন্যদের কারুর কাছে যদি হমন তো কারুর কাছে মোটে পাঁচ সের পড়ে ছিল। গাঁয়ের প্রায় অর্ধেকেই তো ডাকাত পড়ার আগেই ফসল সব শেষ করে বসেছিল। তেঁতুল গাছের শেকড় ছাল ইত্যাদি গুঁড়িয়ে সেদ্ধ করে খাচ্ছিল। সুতরাং রণছোড় মোড়লের জন্যে আর কে ভাববে? কালুকেই ভাবতে হয়। দশ সের ফসল রণছোড়ের বাড়িতে রেখে আসে, 'এখনকার মতো তো চালিয়ে নিন্।' নানার নেবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কী আর করবে? নিজের ভাগ্না আর ভাই নাথাই কিছু দিতে অস্বীকার করে যখন, তা হলে আর কে দেবে?—সন্ধেবেলা খাবার মুখে তোলার সময় তার আবার মনে পড়ে যায় যে, এর জন্যে এবার জীবনভোর কালিয়ার খোঁটা শুনতে হবে।

কালুও বুঝতে পারে যে নানার এধরনের ভাবনা আসতে পারে তাই পঞ্চম দিনে আবার দশ সের ফসল দিয়ে আসার সময়ে বলে, 'তোমার হয়তো মনে হতে পারে যে কালু উপকার কিংবা দয়া-দাক্ষিণ্য করছে, কিন্তু এ মোটেই সে-সব কিছু নয়, আর এতে নতুন কিছুই নেই। আমাদের দুজনের বাবা না হয় আলাদা আলাদা কিন্তু দাদু তো একই লোক ছিলেন। আর আমাদের এই যে সব জায় জমি তার কিছুটা তোমার মামার বাড়ির অংশ হলেও আমার ক্ষেত তো তোমার দাদুর জমি ছিল একদিন। তাই বলছিলাম যে এ নিয়ে মনে কোনো দুঃখ থাকা উচিত নয়।'

নানার অপছন্দভাব রণছোড়ের অজানা ছিল না। তাই সে কালুর কথার উত্তরে নানাকেই একরকম ঘুরিয়ে শোনায়, 'তা ভাই জমির কথাই-বা কেন বলছিস। তুই আমাদের লোক বলেই না তোর আমাদের জন্যে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে? নইলে এসময়ে তো কেউ— আরে আমাদের নাথাকেই দেখ না। আসলে যার অন্তরে সত্যি-কারের ভালোবাসা দরদ থাকে সেই মানুষের উপকারে এগিয়ে আসে নইলে তোর কাছেই-বা কী এমন জালা-ভর্তি ফসল রয়েছে?'

'চার মন মতো খাবার দানা আছে, আমাদের এই সকলের যদ্দিন চলে চলুক— তারপরে দেখা যাবে।'

'সে আমি জানি, কিন্তু এভাবে—' রণছোড় অদূরেই মৃত্যু সুনিশ্চিত দেখতে পায়, তার নিজেদের পরিবারের সকলের এবং সেইসঙ্গে কালু ও ভলীদেরও। তার চোখে জল এসে পড়ে, 'না কালু! এবারে নিয়ে এসেছিস ঠিক আছে কিন্তু এই শেষ···আর আনিস নি! অনেক করেছিস তুই···আমাদের জন্যে শেষ পর্যন্ত তুই কেন···'

'আপনি তো আচ্ছা লোক রণছোড় দাদা! আমরা অমনি অমনি না খেয়ে মরে যাব নাকি? এই উলঙ্গ ভীলগুলো বেঁচে থাকতে পারে আর আমরা পারব না?' কালুর গলার স্বরই শুধু নয়, তার চোখেও শৌর্যবীর্যের দীপ্তি ঝলসে ওঠে।

তাই দেখে রণছোড়ের চোখে জল থেমে যায়। সে কালুর মুখের

দিকে তাকিয়ে থাকে। একসাথে অনেকগুলো ভাবনার উদয় হয়, 'ও কি তবে জাত-ধর্ম খুইয়ে অধর্ম করার কথা বলছে, জন্তু-জানোয়ার মেরে খাওয়ার কথা নাকি···কিন্তু গোরু বলদই বা রয়েছে কোথায়? তবে কি আমরা নিজেরা আমানতদার হয়ে লুঠ করতে যাব?' সে জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি, কি ভাবে?'

'কি ভাবে তা আমি নিজেও জানি না এখন। কিন্তু যখন না খেতে পেয়ে মরার মতো অবস্থা আসবে সেদিন আপনার থেকেই সব-কিছু বুঝতে পেরে যাব।' একটুখানি চুপ করে থাকার পর মাথা নেড়ে শুরু করে, মনে হয় যেন তার অন্তরাত্মা কথা বলছে, 'উঁ হুঁ! খিদের জন্যে আমরা মরে যাব এ কথা আমি মানতে রাজী নই।' আর এমনভাবে সে উঠে দাঁড়ায় যেন 'উপায়টাকে' খুঁজতে চলেছে। 'কিন্তু এভাবে আপনারা মনের বল হারিয়ে ফেলবেন না। দরকার পড়লে আকাশ তোলপাড় করেও ফসল নিয়ে আসব ঠিক।' সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

রণছোড় বিড়বিড় করতে থাকে, 'আমি সাহস হারাই নি, কিন্তু বাড়ির লোকেরা— অর্ধেক তো 'আকাল আকাল' করতে করতে মরে যাবে।' পাশে বসে থাকা নানার দিকে চেয়ে বলে, 'তোর খোঁড়া বউ আর আমার তিন ছেলেমেয়ের মাথায় তো আকাল এখন থেকেই শেকড় গেড়ে বসেছে। তোর বউদি বলছিল যে আগের থেকে দেড়গুণ বেশি খেতে দিলেও খুঁড়ী খেয়ে ওঠবার সময় রোজ 'কবে যে আকাল দূর হবে দুটো পেট ভরে খেতে পারব কে কে জানে' এ কথা বলে, তবেই বোঝ কতটা খেলে ওর পেট ভরবে?'

'আমি সেজন্য আজ বউদিকে ব'লে দিয়েছি যে এক-এক বেলাতে বড়োদের জন্যে একটা চাপাটি আর ছোটোদের আর্ধেক। এর বেশি খেতে হলে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে!'

কিন্তু তুমি যাও ডালে ডালে তো সে যায় পাতায় পাতায়! লেংড়ি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা ফসলই খেতে শুরু করে দেয়। রণ-ছোড়ের বউ ধরে ফেলতে তাকে উল্টে শুনিয়ে দেয়, 'তোর নিজের

হাতে সব-কিছু বলে তুই দুটো চাপাটি খাস আর আমাদের বেলাতেই যত টানাটানি।' লেংড়ির কথা সত্যি ধরে নিয়ে নানার নতুন বউ চোখ নাচিয়ে বলতে থাকে, 'ঠিক কথাই তো, তুই নিজে নিজের ঝুলি ভরিস আর আমাদের তোর হাত-তোলা হয়ে···

কিন্তু এ ঝগড়া কেবল শুধু রণছোড়ের বাড়িতেই নয়, প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই একই ব্যাপার। কালুর নিজের বাড়িতেও স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হতে থাকে! কালু ভলীকে প্রায়ই বলত, 'ঘুম, খাওয়া, মোট-বওয়া—এ তিনটে কমালে কমানো যায়, যেমন বাড়ালে বাড়ে; এখন অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকিস, আগের মতো পরিমাণে এখন খাস নি।'

'আমি কেন না খেয়ে মরতে যাব?' ভলী বেহায়ার মতো বিদ্রোহ করে ওঠে, 'তুই নিজেদের ভাইদের বাঁচাতে চাস যখন তখন তুই না খেয়ে মরবি নিজে।'

জীবনে এর আগে কেউ কালুকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে নি। এক হয়তো সমাজে আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সব নষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে এই গালি-গালাজ মান-অপমান আর কেউ গায়ে মাখে না। সে যাই হোক-না কেন, কালু মারধোর করার বদলে শুধু এটুকুই বলে, 'আমার তো কিছুই যাবে আসবে না কিন্তু এটা খেয়াল রাখিস যত খাই খাই করবি ততই তাড়াতাড়ি তুই মরবি। তুই তো বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানিস না কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি যে-পরিমাণ দানা ফসল জন্মানোর বছর খেয়ে ওঠা সম্ভব নয়, এই অজন্মার বছরে তা খাওয়া হচ্ছে। আর তাতে ক্ষতি হয় কিনা মানতে না চাস তো আশপাশের মাঠে দেখে আয় কতজনে বসে বসে ধ্যার ধ্যার করে ছড়াচ্ছে। আরে ওই কঙ্কালরা সব রাস্তাময় ছড়াতে ছড়াতে গেছে।'

'তা আমিও কি রাস্তায় ছড়িয়ে এসেছি নাকি?'

'তোর খাওয়া যদি কম করে দিই আরে তুইও তা হলে কাঁচা শস্য মুঠো মুঠো খেয়ে ছড়াতে বসবি। যাকগে ও-সব কথা থাক।' কালু বাড়ির থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যায়।

কালুর এই কথা তার বাড়ি কিংবা গ্রামের জন্য নয়, সারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের পক্ষেই সত্যি। মানুষ হিসেব বুদ্ধি সংযম সব হারিয়ে বসেছে, যেন আপনি বাঁচলে বাপের নাম···

বাঁধা-ছাঁদা করে বেরোনোর কথা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা একসাথে মিলেমিশে ওঠাবসাও ভুলে যায়। বাড়ি ও জমির মায়া মরে গেছে ; জন্মভূমির দেশের মাটির টানও শেষ হয়ে যায়। কেউ কারুর সাথে দুটো কথা বলতে দাঁড়াত না যখন, একে অন্যের পরামর্শ নেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেউ আত্মীয়-স্বজনের কাছে গেল আর কেউ কেউ কে কোথায় গেল তার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। শ্মশানযাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে···

যে কালু একদিন জোর গলায় বলেছিল, 'না খেয়ে মরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না' তার বাড়ির উঠোনেও দুর্ভিক্ষ তার বিভীষিকা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সঞ্চয়ের মধ্যে কেবল আর দুদিন চলার মতো ফসল ছিল।

ভাবনাগ্রস্ত কালু চাতালে বসে বসে দাঁত খুঁটতে থাকে। গাঁয়েতে বেনে মুদীর কোনো দোকান ছিল না। চাষের কাজকর্মের সাথে সাথে কাসম ঘাঁচী কিছু নুন-লঙ্কা ইত্যাদি বিক্রিবাটা করত কিন্তু তার সবই লুট হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সে স্থির করল যে, 'সবাই মিলে ডেগড়িয়াতে যাওয়া যাক। সেখানে যে করে হোক খাবার দানা জোগাড় করে নেব।'

রণছোড়-নানা রাজী হয়ে যায়। কোদর আর শংকরদা তো বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিল। লুঠ হয়ে যাবার পরের দিন সকালে মুখ দেখাবার জন্যে কাসম ঘাঁচী গাঁয়ে অপেক্ষা করে থাকে নি। আর ধার নেওয়া দশসের করে দানা ফেরত দেবার ভয়ে বেচাতও গাঁ ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিল।

গাঁ ছেড়ে যাবার কথায় রাজী হবার পর রণছোড়-শংকরদা ভাবছিল, 'ঠিক আছে, বাঁধাছাঁদা করে বেরিয়ে পড়া যাক। আমাদের এমন কোনো ধন সম্পত্তি নেই যে সাথে নিয়ে যেতে বা এখানে ছেড়ে যেতে

হবে বলে ভাবনা। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। যেখানে খুশি ডেরা বাঁধা যাবে, উঠে বেরিয়ে পড়তে বাধা নেই কোনো!'

কিন্তু কালুর কিছুটা চিন্তা ছিল। লেপ তোষক আর খাটিয়া, বন্দুক, জাঁতা, দুটো ঘটি, একটা থালা আর কাঁসি, মাটির বাসনপত্র, মাখন তোলার কাঁটা, দড়ি-দড়া আর সেইসঙ্গে মঙ্গল— ঘরদোরের প্রায় সব জিনিসই ছিল।

কালু ভাবতে থাকে : কী রেখে যাবে আর কী সাথে করে নিয়ে যাবে, কিন্তু সাথে করে নিয়েই বা যাবে কি করে? খালি গাঁ দেখে কেউ যাতে জ্বালিয়েটালিয়ে না দেয় তাই মঙ্গলের মামা লীম্বাকে ডেকে এনে দেখাশোনার ভার দেবে ঠিক করে। কিন্তু বাড়ির থেকে কী কী জিনিস নিয়ে যাবে সে ব্যাপারে কিছু ঠিক করে উঠতে পারে না···শেষ পর্যন্ত সে মঙ্গলকে বাড়িতে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবুও কিছু কিছু জিনিসপত্র লুকোতে শুরু করে··· !

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দিনে রণছোড় মোড়ল তাকে খবর পাঠায়, 'তোর যদি দু-চারটে লেপ তোষক নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে তবে নিয়ে যেতে পারিস গোরুর গাড়ি এসেছে।'

'গোরুর গাড়ি?' কালু সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে যায়, রণছোড়ের দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আরে হ্যাঁরে, আমাদের অলকচাঁদ কারবারীর দুটো গাড়ি এসেছে। সঙ্গে দুজন সেপাই রয়েছে, ভাবনার কিছু নেই। সঙ্গে সরকারের লোক থাকবে রাস্তায় কেউ কোনো রকম বিরক্ত করতে সাহস করবে না।'

রণছোড় ঠিকই বলেছিল, তখনো পর্যন্ত সরকারের লোকের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করে নি।' তাদের ওপরে সকলের ভয় ভক্তি তখনো প্রবলভাবেই ছিল।

কালু জিজ্ঞেস করে— 'গাড়িতে কি আছে, ওরা জানিয়েছে কি, কখন এখান থেকে রওনা হবে?' তারপরে, 'ঠিক আছে' বলে ঘরে চলে যায়। একটা দেশলাই কাঠি নিয়ে চাতালে বসে, হাত-পা

চুলকোচ্ছিল, কিন্তু মাথায় অন্য আর-এক চিন্তা কুরে খাচ্ছিল। দাঁত খুঁটতে, শুধু দাঁতে নয় চোখের কোণেও যেন রক্ত জমা হতে থাকে তার। 'সারা এলাকার লোক ফসলের অভাবে এখানে ছটপট করছে— আর ওদিকে দেখ তলকচন্দ্র বেনে ফলাও ব্যবসা করছে। ব্যবসাই তো করছে···নইলে আগেও চার-ছটা গাড়ি নিয়ে গেছে। ওর এত আত্মীয়স্বজন আছে নাকি? আর থাকলেই বা আমাদের তাতে কি? এটা ন্যায় করছে না অন্যায় করছে?···ঐ ফসল তো আমাদেরই দেওয়া উচিত, তাই নয় কি? যাদের ফসল তারাই না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে আর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আমাদেরই চোখ রাঙিয়ে···এই ফসল পাওয়া গেলে সারা গাঁ একমাস বেঁচে যেতে পারে— এখন কিছু করতে হয় তাহলে। তুই বালা প্যাটেলের ছেলে, তুই যদি না করিস তো— তাহলে আর কে করবে? যেন তার বুড়ো বাবা সশরীরে সামনের খুঁটির কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কালিয়া, 'আমার রক্ত যদি তোর শরীরে থাকে তো অভুক্ত, ক্ষুধার্ত গাঁয়ের ওপর দিয়ে ফসলের গাড়ি যেতে দিবি না...উঠে পড়....তুই— তালকচাঁদের বাবা এলেই বা কী এসে যায়···এই সাংঘাতিক অবস্থায় আমার ছেলে হয়েও যদি প্রতিবাদ না করিস, তাহলে অন্যের কাছ থেকে আর কি আশা করা যাবে? নে উঠে পর, আর দেখিয়ে দে তোর ক্ষমতা; ওরে, একবার আমার মুখ উজ্জ্বল করে দে...ওঠ, না হলে আমিই আজ থেকে তোর নাম শুনলে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেব!··· '

বিধাতা যেন মুখ তুলে চেয়েছেন এমনি ভাব নিয়ে কালু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে গিয়ে জামা পরে, মাথায় পাগড়ী বাঁধে, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে গাঁয়ের তোরণের দিকে যেখানে তেঁতুল গাছের তলায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেদিকে রওনা হয়।

দুপুরের খিচুড়ী রান্না করে খেয়ে গাড়োয়ান গাড়ি জোতবার ব্যবস্থা করছিল। আর সরকারী সেপাই দুটো কল্কে টানছিল। একজনের হাতে তলোয়ার ও অন্যের কাছে বন্দুক রয়েছে। কালু দেখে নেয়

যে বন্দুকে কিছু সুবিধে করতে পারবে না, গাদা বন্দুক সেটা। বন্দুকের থেকেও ভয়াবহ লাগে তার বন্দুকধারীকে। যদিও বুড়ো কিন্তু 'বিলেতী' লোক (কাবুলীওলা)। কিন্তু আজকের কালু যমরাজেরও বাবা। 'ওই বুড়োর থেকেও আমার শক্তি কম হবে নাকি ? হ্যাঁ, নাহয় ওর বন্দুক আছে কিন্তু তাও তো গাদা বন্দুক। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি যদি এবং ওর টিপ যদি ঠিক হয় তবেই, নইলে একবার দাগবার পর সেই সাতকাণ্ড রামায়ন ! আবার তৈরি হওয়ার ফাঁকে তীর-ধনুক দিয়ে ততক্ষণে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাবে।' কালু গাড়োয়ানদের, 'কোথার থেকে আসছ তোমরা ? কোথায় যাবে ?' ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে ভাবতে থাকে।

'টুমি কে হে ?' বুড়ো ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কে আবার, এই গাঁয়ের মোড়ল আমি।' আর অনায়াসে তার আঙুলগুলো গোঁফে তা দিতে শুরু করে।

'বাঃ মোড়লের সঙ্গে তো এইমাত্র দেখা করে এলাম, কম বয়সী সেপাইটা বলে ওঠে, 'তুমি কোথাকার মোড়ল ?'

কে জানে কেন কালুর হাত-পা কাঁপতে থাকে, মাথা ঠিক রাখাও মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু কেবল মাত্র সেই চিন্তা 'গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ফসলে ভর্তি গাড়ি চলে যাবে আর তুমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ?' তাকে কিছুটা বল দেয়, সে চটে উঠে, 'সে আমার বড়ো ভাই হয়। কিন্তু সেপাই সাব, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি গাড়ি আর একপাও আগে যাবে না।' আর গাড়ি চালকের জন্যে তৈরি হতে থাকা গাড়োয়ানদের প্রায় হুকুম করে, 'বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকলে গাড়ি গাঁয়ের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

অল্পক্ষণের জন্যে সেপাইরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বুড়ো তো এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন ছোকরার কাণ্ড দেখে তার বেদম হাসি আসছে। নেহাৎ করুণা করে বলে, 'তুমি জান এটা কার গাড়ি ?'

'হ্যাঁ জানি। তলকচন্দ্র কারবারীর ফসল আর তার বাড়িতে পৌঁছনোর জন্যে যাচ্ছে। আর এও জানি এই দোকানদার মহামান্য

সরকারের বিশেষ পেয়ারের লোক এবং তার উপরে জমিদারের কথাও খাটে না। কিন্তু এই গাড়ি দুটোকে যদি যেতে হয় তাহলে আপনি অথবা আমি এ দুজনের মধ্যে কেউ একজন মরবে, তার আগে নয়।

কালুর গলার স্বরের থেকেও তার ক্রোধদীপ্ত চোখের দৃষ্টি, শক্ত হয়ে ওঠা ঘাড় এবং ফুলে ওঠা বুকের ছাতিতে একটা বেপরোয়া ভয়শূন্য দৃঢ়ভাব জেগে উঠেছিল। গাড়োয়ান কিছুটা শঙ্কিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

'এসো, মরো তাহলে,' দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিতে দিতে কাবুলীওলা উঠে দাঁড়ায়। কালুর সামনে এসে এখনি যেন তার গলা দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিড়ে ফেলবে— এভাবে ক্ষেপে উঠে বলে, 'আমি বিলিতি বাচ্চা, আমাকে বাধা দেবার কোথাকার কে তুই!'

কিন্তু কালু ভয় পাবার বদলে আরো বেশি রেগে ওঠে। তার সারা শরীরে টান টান হয়ে ঝংকার বেজে ওঠে যেন। তাকে দেখে মনে হয় সে এক্ষুনি এই বুড়োটার পাঁজরাগুলো ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে কিংবা একে মাথার ওপর তুলে আছাড় দিয়ে ছাতু করে দেবে।' যেন এই কথা ভাবছে, কিন্তু এবারের মত কেবল সাব, এবারের মত শুধু সাবধান করেই ছেড়ে দেয়, 'কে আবার, আমি তোর মতো অনেক কাবুলীওলার রক্তে হাত রাঙিয়ে তোলা বালা প্যাটেলের ছেলে। গায়ে হাত তুলে দেখ একবার তার পর দেখ কি হয়!'

কাবুলীওলা কালুর দৃঢ়তা দেখে কিংবা ক্রমশ গাঁয়ের লোক জড়ো হতে দেখে কালুকে সাবধান করে, 'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আমাদের রাস্তা আটকিয়ো না, নইলে—' সে নিজের হাতই কামড়ে ধরে। তা থেকে রক্ত বেরোলেও তার কোনো খেয়াল থাকে না। সে চীৎকার করে বলে, 'তোমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।' তার সারা শরীর আর বাদামী রঙের দাড়ি রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে। রণছোড় আর শংকরদা সেখানে পৌঁছে রেগে ওঠা কাবুলীওলাকে তার হাত বেয়ে রক্ত দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু কালুকে থামানো বা বোঝানোও কম হিম্মতের ব্যাপার নয়। তার ওপরে আবার ভগা, কোদর আর দু-তিনজন কালুর দিকেই ছিল। ভগা তো বলেই বসে, 'থানাদার, ওকে আপনি একা মনে করবেন না যেন। কাঁচা খান আর রেঁধে খান, যেভাবেই খান-না কেন আমাদের গাঁয়ের তোরণ থেকে এই ফসল…'

থানাদার বুঝতে পারে এরা নিজের জীবন নিয়ে খেলতে তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু সেই-বা কী করবে? তার শক্তি সামর্থ্যের ওপর ভরসা করেই তো তলকচন্দ্র কারবারী গাড়ি রওনা করিয়েছে। এখানে নিজের রাজ্যেই যদি হার স্বীকার করে তাহলে নিজের বংশের মান-সম্মান চলে যাবে, বিলিতি সাহেব হিসেবে যে হাঁক ডাক রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। সেই বদনামে অন্য সব বিলিতি থানাদারের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে যে!

তাই সে তার চাল বদল করে। গাড়োয়ানদের দিকে ফিরে বলে, 'গাড়ি চালাও, দেখি কে থামায় বিলিতি বাচ্চাকে।' সেই সাথে সে গাঁয়ের লোকেদের দিকে ফিরে বন্দুকের ঘোড়া লাগিয়ে নেয়। নিজের সঙ্গীকে হুকুম দেয়, 'কি দেখছিস কী, বার কর তলোয়ার।' এবং কালুকে ডেকে বলে, 'চলে আয় শুয়োরের বাচ্চা।'

বন্দুক তাক করে ধরতেই মেয়েরা আর ছোটো বাচ্চারা তো 'ফরফর' করে পালায়। শংকরদা ও রণছোড় পাশের ঝোপের দিকে সরে যায়। ভগা-কোদরও একপা পিছিয়ে আসে…

কেবল কালু এক চুল সরে না বরঞ্চ আরো উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ছাতি আরো ফুলে ওঠে। সে বলে, 'গুলী চালিয়ে দেখ, কী করি? কিন্তু মনে মনে আপসোস করে, 'শালা কায়দা করে বেরিয়ে গেল দেখছি।'

ওধারে গাড়োয়ানরা গাড়ির জুয়ার ওপর উঠে বসে। জুয়া সোজা হয়ে উঠতে বলদরা টান দেয়। গাড়ির চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে।

কালু আবার সাবধান করে, 'যাচ্ছ তো, কিন্তু ঐ সামনের নালা

পেরুতে দিলে জানবে আমি মানুষই নয়, বালা প্যাটেলের পেটে পাথর জন্মেছিল।'

'এখন কেন আটকাচ্ছিস না? ওখানে নালার কাছে গেলে হবে কী?

'বন্দুকের গুলি চালানোর অপেক্ষায় আছি।' কমলালেবুর কোয়ার মতো কালুর আয়ত চোখে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আত্মবিশ্বাসের ঢেউ বয়ে যায়। সে সুযোগ খুঁজতে থাকে।

'তোর জান নিয়ে ছাড়ব আজ,' থানাদার বিজয়গৌরবে হাসতে থাকে, হুঁঃ— ! তুই নিজেকে ভাবিস কী।'

'আর তুমি ভেবেছ যে তুমি বন্দুকে বারুদ ভরতে থাকবে আর সকলে তাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে!' কালু চোখ টিপে ভগাকে ইশারা করে।

ভগা বলে ওঠে, 'এমনিতে তো আমরা মরতেই বসেছি, না হয় বউ ও শাশুড়ীর সঙ্গে এক সাথে বিধবা হব।'

'তবে তুইও এদিকে সামনে আয়! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

'এই তো এসেছি? ভয় কিসের? ভগা লাঠি নিয়ে কালুর পাশে এসে দাঁড়ায়, আর শংকরদার চীৎকার ওঠে, 'এই ভগলা।'

'ভগলা ভগলা করবে না বলছি তাহলে!' কালু শংকরদার দিকে ঘাড় ফেরায়, দাদাফাদা মানব না, আপনাকেই প্রথমে এক হাত…' ভগার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে শংকরদার দিকে উচিয়ে ধরে, এই যে…এটা দেখছেন তো?' কেন, কে জানে ওর গলার স্বরটা কাঁপছিল, হয়তো ভয়েতে বুক ধরফড় করছে।

ধরফড় করবে না কেন? জীবন বাজী ধরে খেলতে লেগেছে যে। সেই লাঠি উঠানো অবস্থাতেই সে থানাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় যেন বিদ্যুতের বোতাম টিপতেই সোঁ করে পুতুল ঘুরে গেল। লাঠিটা ছুঁড়েই চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে, 'ভগলা, তলোয়ার-ওলাকে ছাড়িস না যেন।'

গুড়ুম করে বন্দুকের গুলি ছোটে। কালু ধুলোর সাথে গড়িয়ে

এগিয়ে কি পিছিয়ে আসছে মুহূর্তখানেক তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। ক্ষিপ্র বেগে সে কাবুলীওলার তুপায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে তাকে এক আছাড়েই চিৎপটাং করে দেয় এবং সঙ্গেসঙ্গেই তার বুকে চড়ে বসে। ততক্ষণে ভগা, কোদর তলোয়ারওলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ক্রোধে অন্ধ কালু হয়তো কাবুলীওলাকে গলাটিপেই মেরে শেষ করে ফেলতো কিন্তু, 'আরে থাম কালু, থাম থাম কী সর্বনাশ!' বলতে বলতে রণছোড় আর শঙ্করদা ছুটে আসে। তুদিক থেকে তুজন করে কালুর হাত চেপে ধরে। বিলিতি সাহেব চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল— যেন সে মুদিত নয়নে এই মারামারি দেখছে···

কারণ সে ইচ্ছে করলে তো বাঘের মতোই কালুকে ছিঁড়ে খেতে পারতো—ঘাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত।

তার বুকের ওপর বসে তখন কালু নয় যেন তার নিজের ছেলে— সবে গোঁফের রেখা উঠেছে তখন তার মুখে, আজ থেকে বছর দশেক আগে যে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।—তারই নিজের শেখানো চালে সে বাজীমাৎ করে দিয়েছে। লাঠি ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেই রকম ক্ষিপ্র গতিতেই আক্রমণ করে···ঠিক সেই তেজ আর সেই রকম বিক্রম।

বুড়ো বাপ হেন তার হৃদয়ের নিভৃতে সঞ্চিত সেই অন্তর সম্পদ নিয়ে মেতে ওঠে···ছেলের বাহাতুরি দেখতে, সেই সুখস্মৃতি আনন্দ উপভোগ করতে, বুকের ওপর চেপে বসে থাকা মৃত্যুকে ভুলে যায়। বরঞ্চ মৃত্যুর আগে ফিরে পাওয়া সেই কল্পনায় ডুবে যায়।

থানাদারের মুখে ও বুকে রক্তের দাগ দেখে রণছোর মোড়ল শিউরে ওঠে, 'সর্বনাশ হয়ে গেল হায় হায়! সিপাই যদি মরে যায় তো সারা গ্রামের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসবে, গ্রামেতে কামান দাগবে এবার ওরা এসে।'

'তুমি ঠিক করে দেখো দেখি! থানাদারের লেগেছে কোথায়? লেগেছে তো কালিয়ার—দেখছ না যে হাতেতে গুলি লেগেছে তাই?'

শঙ্করদা নিজেই কালুর হাতটা তুলে দেখায়। সত্যিই তাই। কালুর বাঁ হাতের কনুয়ের কাছে গুলি লেগেছিল আর এই সমস্ত দাগ তারই রক্তের। কিন্তু কালুর সেদিকে এখনো পর্যন্ত কোনো খেয়াল ছিল না। শংকরদা তার হাতে দড়ি বাঁধতে এলে সে তার ওপরে চটে ওঠে, 'তোমরা আমার হাতে দড়ি পড়াতে চাইছ? কিন্তু মনে থাকে যেন মোড়ল, তুই যদি সরকারের পক্ষ নিয়ে—'

'তুই তো আচ্ছা লোক দেখছি। তোর হাতে গুলি লেগেছে সেখানটা বাঁধতে হবে না?' রণছোড় বলে।

কালুর এবার খেয়াল হয়। হাত থেকে ফিনফিনিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কিন্তু তবুও সে পরোয়া না করে বলে, 'আগে এই হায়নাকে আচ্ছা করে বাঁধো, তারপর আমার হাতে পট্টি লাগিও।'

কিন্তু একি? বিলিতি সাহেবের চোখে আগুনের বদলে জল কেন? মুখে গালিগালাজের বদলে মুচকি হাসি কেন? কালু সেদিকে কোনো খেয়াল করে না। আর ভগা, কোদর সাবধান হবার জন্যে মাথার পাগড়ী খুলে বিলিতি সাহেবের এলিয়ে পড়ে থাকা হাত দুটো বেঁধে নেয়…

গাঁয়ে ফেরার পথে মিছিলটা যাবার কথা মোড়লের বাড়ি কিন্তু নানা রণছোড়ের কানে কানে কিছু বলে দেওয়ায় সেটা কালুর বাড়িতেই গিয়ে পৌঁছয়…

কালু গাঁয়ের লোকদের হাবভাব দেখে এখন মনে মনে আপশোস করতে থাকে, 'এতো দেখছি মূর্খদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের জীবনের ঝুকি নেওয়া।'

সে রণছোড়, শংকরদা, ভগা, কোদর প্রভৃতি পনেরো জনকে এক পাশে নিয়ে যায়, নানাকেও, বাড়ির থেকে ডাকিয়ে আনে।

'তোমরাই বলো ভাই এসবের এখন কী ব্যবস্থা করব?'

নানা বলে ওঠে, 'তুই কাজটা করার সময় আমাদের জিজ্ঞেস করিস নি কিছু, আর এখন তাহলে কিসের জন্যে জিজ্ঞেস করছিস।' অন্য সবাই ভাবে যে 'কালু ভাই ঝোঁকের মাথায় কাজটা তো করে

ফেলেছে কিন্তু এখন ভাবনা-চিন্তায় সাহস হারিয়ে ফেলেছে !'

কালু লোকদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল বলেই লোক দেখানোর জন্যে মুখে চিন্তার ভাবটা দ্বিগুণ ফুটিয়ে তোলে, 'হাঁ ভাই, আমি আর কি করে জানব যে তোমরা শেষকালে সরে পড়বে ?'

'সরে পড়ব না তো কি ? এ তো সরকারী সম্পত্তি চুরি করা ! তলকচাঁদ খুড়ো এবার পেছনমুখো করে ঘানি টানিয়ে তেল বার করে ছাড়বে।' নানা কালুকে ঠোকবার এমন সুযোগ আর কখনো পাবে না।

'কিন্তু সে সময়ে আমি ভেবেছিলাম যে সারা গাঁ কি শেষে না খেয়ে মরে যাবে।'

'কিন্তু পাগল, 'একবার আমাদের জিজ্ঞেস তো করতে পারতিস।' রণছোড় মোড়ল মাতব্বরি করে ওঠে। 'এখন তো একটাই উপায় আছে। ঐ বিলিতি সাহেবকে যেমন করে হোক রাজী করিয়ে সব কিছু ফেরত দিয়ে ভালোয় ভালোয় রওনা করিয়ে দেওয়া, কি বলো শঙ্করভাই ?'

শঙ্করদা এমনভাবে মাথা দুলিয়ে বলে যেন সে গভীর কিছু চিন্তা করছে, 'তোমাদের সকলের যা উচিত মনে হয় তাতেই আমার মত আছে ভাই।'

অন্যদেরও মনে হয়, 'খিদের জন্যে তো মরছিই এমনি, তার ওপরে এবার আবার সরকারী পেয়াদা এসে চোটপাট করবে। দু-চার জনে বলে, মোড়ল যা বলছে তাই করো ভাই ! যমরাজার চেলা এলে তাকে সহ্য করতে পারব কিন্তু নায়েবের পেয়াদাকে সহ্য করা মুশকিল। ওদের ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দাও।'

'ঠিক আছে, এই তোমাদের মত তো ?' কালু সকলকে আর একবার জিজ্ঞেস করে সঠিকভাবে তাদের মত জেনে নেয়, 'হ্যাঁ ভাই, এই আমাদের মত' গাঁয়ের লোকেরা উত্তর দিতেই সে সকলকে শুনিয়ে দেয়, 'আগে আপনারা সব যে যার নিজের পথ দেখুন।'

কালুর তিরিক্ষি মেজাজ আর এমনি গোলমেলে জবাব সকলকে

ভাবনায় ফেলে দেয়। সে এবার উঠে পড়ে বলে, 'আপনারা এখান থেকে যান তো দেখি, এই ফসলের যা করার আমি একা করব।'

কালুর মনের ইচ্ছে গাঁয়ের লোকেরা বুঝতে পারে। বাড়ির দিকে যেতে যেতে সে নিজেও বলে, 'বন্দুকের গুলি খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি, ওদের আবার ফিরিয়ে দেবার জন্যে নয়—!' সে হাসে, 'প্রতিবেশীদের জন্যে মোটেও এত কষ্ট করতে যাই নি। আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। আমারই মাথা খারাপ হয়েছিল দেখছি। নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনে, আপনাদের ডেকেছিলাম আমাকে বাঁচাবার জন্যে।' দরজার কাছ থেকে মুখ বার করে আবার বলে, 'নানার কথাই ঠিক। আমি তো হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে বসে আছি। আপনারা মিথ্যে মিথ্যে কেন আমার পেছনে পেছনে···। উঠুন···এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে একটু একলা ভাবতে দিন তো।' সে আবার ঘরের মধ্যে চলে যায়। হুঁকো নিয়ে বসে। এক হাত তার গলার সঙ্গে বাঁধা পট্টিতে ঝুলছিল!···এক হাতেই কল্কেতে আগুন দিতে দিতে লোকেদের চলে যাবার অপেক্ষা করতে থাকে।···

রকে বসে থাকা এই পনেরো-কুড়ি জন লোক পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সকলের চেহারাতে একটা কথাই প্রকট— কালু তো মনে মনে ঠিক একটা উপায় বার করবে আর সরকারের সাথেও একহাত লড়ে নেবে। ওর সাহস আছে বলেই তো এই ঝামেলার মোকাবিলা করল?···আর এ তো ভাই প্রায় প্রাণের বিনিময়ে মাল পাওয়া গেছে! — জিতলে পরে বেঁচে যাব আর হারলে, আরে এমনিতে তো মরে রয়েছি! মৃত্যু যখন মাথার ওপর ঝুলছে তখন আর—

ভগা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'সরকারের লোক ঘানিতে উল্টো মুখ করে বেঁধে ঘোরাবে তো ঘোরাক, কিন্তু পেটেতে এই ক্ষিদের জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি কালুর দলে আছি।' তার পেছনে পেছনে কোদর উঠে দাঁড়ায়, 'আমিই বা ছাড়া পাব কি

করে ? সেপাই মারার দলে আমিও সামিল ছিলুম তো !'

সকলের মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে কালুর কাছে যে যেতে পারবে সেই বেঁচে যাবে আর বারান্দায় যারা পড়ে থাকবে তাদের—ওরা আমাদের চোখের সামনেই রুটি পেয়ে যাবে তাও আবার, ভুট্টা আর গমের আটার তৈরি আর আমরা সরকারী পেয়াদার ঘোড়া পৌঁছনোর আগে বিনা মারেতেই ঝরে যাব।

কেবল নানা বাদে অন্য সকলেই কালুর দলে গিয়ে বসে পড়ে। রণছোড় বলে, 'নানিয়ার নতুন শ্বশুর বাড়ির অবস্থা ভালো, তাই ওর কোনো গরজ নেই। কিন্তু আমার তো আপনারা সকলে যা স্থির করবেন সে ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। প্রাণটাই যেতে বসেছে। মোড়লগিরি ফলিয়ে আর কি করব।' এই বলে সেও ঘরেতে গিয়ে বসে যেন মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জীবনের দেখা পেয়ে গেল।

একমাত্র নানা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজের অহমিকা ত্যাগ করতে পারে না। সে উঠে নিজের বাড়ি চলে যায়।

কালু, 'দেখবেন পরে মত বদল হবে না তো! এবার কিন্তু শক্ত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে....' ইত্যাদি সাবধান বাণী শোনানোর পরে ঘরের লোক গুণতি করে, ফসলের আন্দাজ লাগিয়ে কাকে কতঝুড়ি করে দিতে হবে ঠিক করে নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে শুরু করে দেয়। গাঁয়ে যেন হরিলুঠ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চাদের কাছ ব্যাপারটা প্রচণ্ড আনন্দের, বুঝদার লোকেদের কাছে কালু যেন দেবতা হয়ে ওঠে। আর আবুলদের কাছেও 'কালুকাকা খেল দেখালে বটে' গোছের ভাবছিল ভগা, কোদররা বলে, 'ভাই, কালুকে কিন্তু ডবল হিসেবে দিতে হবে। সত্যি বলতে গেলে এই সমস্ত ফসলের মালিক একলাই কিন্তু সে....'

কালু জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল সত্যিই কিন্তু তার বদলে তার বাঁ হাতটাকে প্রায় বিসর্জন দিতে হয়। কনুইয়ের নীচেই গুলি লেগেছে।

একধারে ফসলের ভাগ বাঁটোয়ারাতে যেমন হৈ-হট্টগোল হচ্ছিল তেমনি বারান্দায় রাখা জাঁতার কাছেও সেই একই অবস্থা। 'তোর পরে আমার দান···আরে মোটামুটি পিষে নে,···নে ওঠ তিনজনের লোকের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছে।'

দালানে জাঁতা আশপাশের এই দৃশ্য কিংবা উঠোনে রাখা গাড়ির কাছে কেউ ফসল কাঁচাই মুঠোমুঠো খাচ্ছে দেখে বা খাবার জন্যে মারামারির ঘটনা দেখে কিংবা ফসল নিয়ে যাওয়া মায়েদের ঘাঘরার সঙ্গে সেঁটে থাকা ছেলেদের খাবারের জন্যে আর্তনাদ শুনে সেই কাবুলীওলার চোখে জল এসে যায়। শংকর, রণছোড় তার সামনে বসে নিজেদের গাঁয়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনাচ্ছিল। কিন্তু তাদের দিকে তার কোনো খেয়াল ছিল না···তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার নিজের দেশ কাবুলের ছবি। পরনের বেশভূষা আর ভাষারই শুধু যা তফাৎ। নইলে সেই একই দুরবস্থা। একই ভিখিরিপনা···। এই উঠোনও যেন কালুর বলে মনে হয় না, অবিকল তার নিজের বাড়ির উঠোন···

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ফসল জাঁতার মধ্যে কয়েক পাক ঘুরে উনুনে চাপাতে না চাপাতেই লোকদের পেটে পৌঁছে যায়···আবার গাঁয়ের লোকেরা খালি গাড়ি আর বিলিতি সাহেবের ব্যাপারটা মিটমাটের জন্যে জড়ো হয়। কিন্তু ততক্ষণে সেই বিলিতি মানুষ নিজেই বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, 'মোড়ল, তুমি কিছু ভেবো না, আমি কাউকে কিছু বলব না—তোমাদের কিছু করব না। এই সারা এলাকাতে আমি কেবল একটা মরদের বাচ্চা দেখলাম !···তার কথাও সত্যি···গাঁয়ের প্রজারা না খেয়ে মরতে বসেছে আর···জোয়ান ছোকরা যা বলেছে ঠিকই বলেছে। তোমাদেরই দেওয়া শস্য তোমরাই নিয়ে নিয়েছ। ওপরওলার কাছেই এর ন্যায় বিচার হবে।'

'একথা এখন যদি বুঝলে তো আগে কেন সেটা বুঝতে পারলে না, থানাদার সাহেব।' ভগা বলে ওঠে।

'কী করতে পারি ? আমি হুকুমের চাকর। আমাকে পাঠিয়েছে

বলেই আমাকে আসতে হয়েছে।' বুড়ো সত্যি সত্যি আক্ষেপ করতে থাকে।

'এখন তো আপনাকে সব কথাই কারবারীকে ব্যাপারটা খুলে বলতে হবে....'

কাবুলী হাসে, 'আমি বিলিতির বাচ্চা, ব্যবসাদারকে আর কখনো মুখ দেখাব না, মোড়ল।'

'তাহলে কী করবেন।' কালু জিজ্ঞেস করে।

'যা হোক কিছু একটা করব কিন্তু মরে গেলেও আর কখনো ফিরে যাব না, বেটা।' বুড়ো যেন নিজের মনে বলে ওঠে।

সাহেবের ধিক্কার শোনা যায়, 'চুচ্চচ্ চ্চ চক্ চক্। কী বলছো কি। আমরা সাহেবরা কখনো পেছনে ছুরি মারি না। লড়াইয়ের সময় লড়ি কিন্তু পরে সে সব ভুলে যাই।' আর সে অর্ধনিমিলিত চোখে কালুর দিকে তাকায়, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?···আত্ম-মর্যাদা বুঝতে পারো ?—ঠিক আছে !' বলতে বলতে বুড়ো পিঠ টান টান করে বসে, 'সেই আত্মমর্যাদার দিব্যি খেয়ে বলছি যে....

কালু বলে ওঠে, 'না, না, সেপাই সাব, আপনার দিব্যি মানার কোনো দরকার নেই, আমি মরতে অতটা ভয় পাই না। এই দুর্ভিক্ষের জন্যে তো আমরা সকলে এক রকম মরেই রয়েছি।' সে ভগাকে বলে, 'এর হাত খুলে দে।'

ভগা-কোদর প্রভৃতির সেটা ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কালু তাদের জোরের সঙ্গে ভরসা দেয়, 'সাহেবের বাচ্চারা কখনো দু ধরনের কথা বলে না বলেই লোকদের কাছে শুনেছি। আর তাই যদি করে তাহলে—ঠকব বটে কিন্তু মানুষ জানা হয়ে যাবে।'

• হাত খুলে দিতে সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। কালুর দিকে এগোয়। গাঁয়ের লোকদের হৃৎকম্প শুরু হয়। কালু নিজেও একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাহেবকে তার নিজের হাত ধরতে সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরে যায়। সেও উঠে দাঁড়ায়। নিবিড় ভাবে সে আলিঙ্গন করে কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে যেন মিলিত

হচ্ছে…

ছাড়াছাড়ি হবার সময় দুজনের চোখেই জল এসে যায়।

'আমি আমার এত বছর বয়স অবধি তোমার মতো এমন জোয়ান আগে কখনো দেখিনি। তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'…তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝড়ে পড়তে থাকে। আপন মনে মৃদু গলায় সে বলে, 'ভগবান আজ আমার ওপর যথেষ্ট কৃপা করেছেন, নইলে তোমার মত এমন ছেলেকে আমি নিজের হাতে খুন করতে…

শঙ্করদা কথার মধ্যে বলে ওঠে, 'ওর বাবা বালা তো ঠিক আপনার মতো দেখতে ছিল, ঠিক এমনিই দোহারা চেহারা আর এমনিই লম্বা। তফাৎ যদি কিছু ছিল তো তা কেবল দাড়ীর রঙেতে। আর বুড়ো বালা চিবুকের কাছে দাড়িতে সিঁথি কাটতো, আপনি তা করেন না, ব্যস এইটুকুই যা তফাৎ।'

গাড়ি দুটো ও অন্য সিপাইকে বিদায় করে দেওয়া হয়। কালু তার বন্দুকটাও গাড়িতে তুলে দিয়ে বলে, 'কারবারীকে বোলো যে বিদেশী আর কখনো মুখ দেখাবে না…

এরপরে কাবুলী গাঁয়ের লোকদের তার নিজের বাড়ির আর ছেলের কথা বলে। গাঁয়ের লোকেরা আফিম নিয়ে আসে। খাতির যত্ন করে, তাকে খাওয়ায়। সন্ধ্যে হয়ে আসতে সে উঠে পড়ে।

'এখন এই সময়ে যাবেন কাবুলী কাকা… ?' কালু তো ইতিমধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছে।

বুড়োর চোখে আবার জল এসে যায়। 'এখন আর আমার সকাল-সন্ধের কি আছে, বেটা।' কাবুলীর কথার স্বরে বেদনা ছিল।

'কিন্তু এই সময়ে আপনি যাবেনই-বা কোথায় ?' শঙ্করদা জিজ্ঞেস করে।

'যেখানে হোক, বিদেশ থেকে যখন এদিকে এসেছিলাম তখনও এ বুড়ো কোনো কিছু ভাবেনি, ব্যস ! সেরকমই আজও বেরিয়ে পড়ব।'

কালুর চিন্তা হতে থাকে, 'তাই বলে, আজ তো এখানে থেকে যান কাকা, গল্পগুজব করা যাবে, আর কালকে না হয় আপনি আপনার পথ দেখবেন আর আমরাও আমাদের পথে বেরোবো। আমাদেরও এই দেশ-গাঁ ছেড়ে যেতে হবে। আমরা সবাই ডেগডেগিয়ার পথে বেরোবো…

কিন্তু বুড়ো কিছুতেই মানতে চায় না। তার চেহারায় একটা নিরুপায় বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে। কালুর মনে হয়, 'যদি বেশি জেদ করতে থাকে তো বুড়ো চীৎকার করে কেঁদে ফেলবে।' সে আর জোর করে না, 'আপনার তাহলে যেমন ইচ্ছে।'

কিন্তু সিপাই সাহেবের হাত খালি দেখে আবার থামায়, 'এক মিনিট দাঁড়ান কাকা, আমি এক্ষুনি আসছি…' কালু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকে।

সে একটা পুরোনো আমলের বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসে, 'নিন কাকা! আমি আপনারটা নিয়েছি। এবার আপনি নিজের জিনিস ফেরত নিন!' বলে কালু হেসে ওঠে।

'নিজের জিনিস শুনে কাবুলীকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে গ্রামবাসীরাও খুশি হয়ে ওঠে। ভগা বলে ওঠে, 'ঠিক হয়েছে, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।'

'আচ্ছা বেটা!' বুড়ো কালুর কাঁধে হাত রাখে, 'আমি তোমাকে কোনোদিন ভুলব না, তোমার এই উপহার চিরকাল মনে থাকবে—'

'আর কাকা, 'আপনিও কিছু কম উপহার দেন নি!' খোঁড়া হাতটা বার করে দেখিয়ে সে হাসতে থাকে— 'এটা তো আপনার কথা জীবন ভর মনে করাবে…'

'ওটা তো ক্ষমতার, শক্তির নিশান হয়ে রইল, আয় আর একবার বুকের মধ্যে আয়…'

সেই দুই সাহসী পুরুষের—পিতাপুত্রের মিলন, ছাড়াছাড়ি আর অশ্রুনয়নে বিদায় দৃশ্য দেখে গ্রামবাসীদের চোখেও জল এসে যায়। বিদায় দেবার সময় গলার আওয়াজ কান্নায় ভারী থাকে, 'থানাদার

সাহেব !...কাবুলী কাকা ! বেঁচে থাকি কি মরে থাকি সুযোগ হলে একবার খবর নেবেন, আর কখনো যদি ফুরসৎ পান...'

কালু অনেক দূর অবধি এগিয়ে দেয়...পাহাড়ের আড়ালে ক্রমশ অস্তমান সূর্যের ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে কাবুলী কাকার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অনিমেষ নয়নে দেখে কালু...তারপর পেছন ফিরে চোখ মোছে, বিড় বিড় করে বলে, 'একে তো একটা নাটকই বলতে হবে, তাই নয় কি ?...কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একজন অন্যজনকে প্রাণে মারতে প্রস্তুত ছিলাম, আর এখন— বিদায় নিয়ে অন্যের চলে যাওয়া অসহনীয় মনে হতে থাকে। আর বিষণ্ণ হাসি হেসে আবার বলে, 'নাটক ছাড়া একে আর কী বলতে পারি ?'

॥ ছত্রিশ ॥

দুঃখের দিন

কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু হয়। কিন্তু এ বছর ক্ষেতের খড়-কুটো আকাশে ওঠে না, থাকলে তবে তো উড়বে? 'লু' বইছিল আর পৃথিবীর ধুলো উড়ছিল, সেই সাথে উড়ছিল কিছু লোকের মাথার শুকনো চুল।

প্রত্যেক বছর এই ঝোড়ো হাওয়া কৃষকদের প্রাণেও আলোড়ন তুলত, তাদের উৎসাহ জাগত, মনে আশা-আনন্দ অঙ্কুরিত হত। 'কালকের মতো সব কাজ সেরে নিতে পারব কি? বর্ষা তো এই এসে পড়ল বলে।'

এ বছরের কথা আলাদা ছিল। হায় ভগবান! এখনো তো পুরো জ্যৈষ্ঠ পড়ে রয়েছে। যেন এক যুগ কাটাতে হবে। আর সত্যি সেটা একটা যুগই বটে। একদিন একবেলা কাটানোই মুশকিল ছিল। তখন এক কুড়ি আর দশ দিনের কথা ভাবাই যায় না।

কালু রণছোড় প্রভৃতিরা ডেগড়িয়াতে এসে দেখে পাঁচ-সাতশো ঘরের বসত সেই শহরতলী একেবারে লোকে গিজগিজ করছে। তাদেরই রক্তমাংসের বিনিময়ে গড়ে ওঠা সেই শহরতলীতে তাদেরই কোনো জায়গা ছিল না। বহু কষ্টে গ্রামের এই পনেরোটি পরিবারের থাকার জন্যে একটা ঘর পাওয়া গেল এবং তাতেই আবার কালুর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এসে উপস্থিত হল।

কালু ভেবেছিল, 'এই জ্যৈষ্ঠটাকে যদি কোনোমতে পার করে দিতে পারি তবেই আষাঢ়ের আশায় বুক বাঁধতে পারব…' কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠকে পার করাটাই মুশকিল ছিল। সেই দু'গাড়ী থেকে ফসল সত্তর আশী মণ পাওয়া গেলেও এক-এক বাড়ির ভাগে দু'মণ করে

পড়েছিল। রণছোড় শঙ্করদার মতো পরিবারে প্রায় ছ'মণ করে খাবার গেল ঃ নানার খোঁড়া বউয়ের ভরণ-পোষণের ভার রণছোড়কে নিতে হয়েছিল। এখানে এই পঁচাত্তর-একশোজন লোকের দেখা-শোনার দায়িত্ব ছিল শঙ্করদা, ভগা, কোদর আর কালুর ওপরে।

কিন্তু সত্যি ধরতে গেলে এদের ভার বইবার দায় কালুর ওপরেই ছিল। সে সবাইকে সাবধানে চলতে পরামর্শ দেয়।

'হিসেব করে চলে যদি তো ঠিক আছে, নইলে বাঁচা-মরার আসল সমস্যা এখনই সব থেকে বেশি। এক একবেলা কাটানো কঠিন এসময়। আমার কথা যদি মেনে চলতে চাও তো সকলের রান্না একসাথে করার ব্যবস্থা করো। এক-এক জন লোকের জন্যে মাথা-পিছু দশসের করে ফসল এক জায়গায় জমা করে নাও আর যেখান থেকে পারো রান্নার জন্যে বড়ো বাসনপত্রের ব্যবস্থা করো।'

এর পরে কালু মেয়েদের একসাথে মিলেমিশে থাকার পরামর্শ দেয়, কম করে খাওয়ার উপদেশ দেয় এবং পাঁচ জন বউকে রান্নাঘরের দায়িত্ব অর্পণ করে ; পাঁচজনের মধ্যে রণছোড়ের স্ত্রী, ভগার মা, তার নিজের শাশুড়ি, কোদরের মা এবং অন্য আর-একজন স্ত্রীলোক ছিল।

একবেলা রান্না শেষ হতে না হতে...রান্নার ছিলই-বা কী? বড় ঘরায় ঘোল ছিল—মাখন তোলা দুধ তো স্বপ্ন! এখন তাই জল মিলিয়ে তৈরী করা, তার সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয় গাছের ছাল সেদ্ধ। পেটে শক্ত কিছু পড়া চাইতো। তবুও কোদর, ভগার বউদিদের মুখ ভার হয়ে ওঠে। সকলকে একসাথে বটগাছের পাতায় দু-হাতা করে পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তাদের রাধুনীদের ভাগে বেশি পড়েছে বলে ধারণা হতে থাকে। খেতে খেতে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে আধ-সেদ্ধ করে আটাটাই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, কেউ নুন বেশি হয়ে গেছে বলে জানায়। রান্নার বাসন কে পরিষ্কার করবে তা নিয়ে সবার মধ্যে রেষারেষি লেগে যায়।

—

কালু তাদের অনেক করে বোঝায় যে ভিতরে কিছুই অবশিষ্ট বেঁচে নেই। ধুলে ঘড়ার ভিতরের ময়লা ছাড়া আর কিছুই বেরুবে না; কিন্তু কেউ কথা শুনলে তো? রোজ রোজ এক কথাই কাহাতক বোঝানো যায়।

চটে গিয়ে কালু রান্না আর বাসন ধোয়ার দায়িত্ব ছেলেদের ওপরে দেয়। বউদের বলে দেয়, 'এখানে খেতে এই রকমই পাওয়া যাবে এবং তাও একবেলা করে। এর বেশি খেতে হলে কাজকর্ম খুঁজে দেখো।'

কিন্তু কাজ কোথায় পাবে। কালু নিজে ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এসেছিল আগেই, এখনও ঘুরছে...

পাঁচদিনের দিন অনেক চেষ্টায় একজন লোকের কাজ জোগাড় হল, মোটে আধ সের ঘাসের দানার মজুরিতে সারাদিন তেলের ঘানির বলদ হাঁকাতে হবে, তাও আবার কাসমঘাচীর সুপারিশ ছিল বলে জুটলো কাজটা।

ভোরবেলাতেই কালু তার শ্বশুরকে কাজেতে বসিয়ে সে তাদের শেঠের বাড়ী দেখা করতে যায়।, যে করেও হোক অন্ততঃ ; জনাপাঁচেক লোকের কাজের ব্যবস্থা করে দিন।

'কিন্তু কোথা থেকে কাজ নিয়ে আসব? কাজ থাকলে তো খুশি হয়েই দিয়ে দিতাম, আমাদের পেটের গর্ততো—সে যাক তবু আর্ধেক করেও ভরা চাই তো?'

'হাঁ, কাশী কাকা! পেটের জন্যেই এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা··· তাহলে ধার দিন অন্ততঃ। যা হোক একটা কিছু করুন, এই পেটের জ্বালা আর সহ্য হয় না, আমি আপনার দয়া কখনো ভুলব না।' কালুর চোখে জল এসে যায়।

তুই একি কথা বলছিস বল তো! আরে পাগলা, আমাদেরও ভবিষ্যতে খেয়াল রাখতে হয়। গ্রাহক বেঁচে থাকলে আজ না হয় কাল একদিন ফেরত দেবেই। কিন্তু আমার নিজের ঘরে থাকলে তবে তো দেব?'

'তাহলে বীজের আশাই-বা কী করে করব কাকা ?'

কাশীদাস শেঠ হেসে ওঠে, 'আগে বৃষ্টি তো পড়তে দে।' একটু থেমে আবার বলে, 'বীজ যদি না দিই তাহলে তোদের ঘরের থেকে আমি পাবই বা কী করে ?'

এ কথায় কালু জোর ফিরে পায়, 'বীজ যদি পাওয়া যায় তবে ঘরেতে মঙ্গলের কাছে যে মণ খানেক ফসল বেশি রাখা আছে সেটা নিয়ে আসা যাবে।' একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। সেদিকে যেতে যেতে সে বলে, 'দেখি ওখানে যদি একজনের কাজও জুটে যায়।'

কিন্তু সে সুযোগ আর কোথায় ? বাড়ির মালিকেরই কিছু করবার উপায় ছিল না। সকালবেলাতে আগে গিয়ে যে কনিক-কোদাল ধরতে পারবে সেই কাজে লেগে যায়। মজুরিও কম করতে করতে পাঁচশো দানা থেকে দেড় পোতে এসে নেমেছিল। বাড়ির মালিকের কথা সত্যি হলে লোকে তো ভাই আধ পো'—এমন-কি, এক মুঠো দানার বদলেও কাজ করতে রাজী আছে। কিন্তু আমি তো আর সে অন্যায় করতে পারি না। মাথার ওপরে ভগবান রয়েছেন।'

কথাটা মিথ্যে নয়। ডেগড়িয়াতে এত লোক এসে জড়ো হয়েছিল যে মনে হয় ভয়াবহ কোনো অসুখেতে এই ছোটো শহরতলীর পেট ফুলে উঠেছে।

থানার পুলিসদের ভয় হতে থাকে। শহরের ব্যবসায়ীরা সোজা সরকারের কাছে আর্জি লিখে পাঠায়। 'যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন তাহলে ডেগড়িয়া লুঠ হয়ে যাবে।'

কালুদের দলবলের এসে পৌঁছনোর আটদিন বাদেই শহরে কথা রটে গেল, 'গোরা সাহেবরা বন্দুক পাঠিয়েছে। 'কেমন বন্দুক ? পলতেওলা বা গাদা বন্দুক নয়, টুপী লাগানো বন্দুক সব। বারুদ ভরার লোহার গুলি ভরে ঠাসবার ঝামেলা নেই। বন্দুকের নলের মাথায় ঢাকনা লাগানোরও দরকার নেই। কল দাবলেই বন্দুকের

নল মাঝখান থেকে আলাদা হয়ে যায় আর টোটা দিতেই গুড়ুম্! এমনি নতুন ধরনের বন্দুক।'

পরের দিনই শহরের পুলিস পাহারাদার গলায় কার্তুজের মালা পরে আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে বাজারে টহল দিতে বেরুল। কিছুক্ষণের জন্যে সেই অভুক্ত লোকেরা ক্ষিদে পর্যন্ত ভুলে যায়। সেই কার্তুজ আর বন্দুকের দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে।

'ব্যস খতম, ডেগড়িয়া আর লুঠ করা যাবে না ভাই!' ডেগড়িয়ার লোকেরাই নয়, আশপাশের অঞ্চলের অসৎ, বদ লোকেরাও আশা ছেড়ে দেয়।

কালুর মতো লোকেরাও ভীষণ নিরাশ হয়ে পড়ে, 'নিজেরা আগ বাড়িয়ে ডাকাতি করতে যাবার তো সাহস ছিল না কিন্তু অন্য কোনো লোকেরা তৈরি হলে তাদের দলের মধ্যে অন্তত ভিড়ে যাওয়া যেত।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, 'দূর মুখপোড়া মিনসেরা! গাড়ি থেকে বন্দুক আর গুলি না নামিয়ে খাবার দানা নামাতে তো পারতে বোকারামরা! ···দূর খুনীরা! মৃত্যু তো এখানে চলতে ফিরতে পায়ের সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে। তবুও তোরা সেই প্রাণ নেবার জন্যে বন্দুকই গাড়ি থেকে নামালি! তার বদলে প্রাণে বাঁচবার মতো কিছু নামাতে পারলি না···মারবার তো অনেক কায়দা রপ্ত করেছিস, বাঁচার কোনো ফন্দি খুঁজে বার করতে পারলে জানতুম মস্ত বড়ো ওস্তাদ তোরা!···'

রাত্রিতে পাহারা দেবার জন্যে পুলিসদেরও এই কার্তুজওলা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে কালু আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়ে। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে, 'শেষ পর্যন্ত কিছু যদি না পাওয়া যায়, তবে অন্তত ফসল চুরি করতে হবে।' চুরি করবার উদ্দেশ্যে দু-এক জায়গায় ভাঁড়ারের খোঁজ খবরও নিয়ে রেখেছিল।

'কি ধরনের অন্যায় একবার তোমরা দেখো দেখি', শহরের বাইরে মাঠের থেকে গাছের ছাল বাকল জোগাড় করার সময় কালু, কোদর, ভগা প্রভৃতিদের বলে, 'এই কষ্টের দিনে কোথায় ভাঁড়ার থেকে ফসল

বার করে দেবে তা নয়, উল্টে টোটাওলা বন্দুকের পাহারা বসিয়েছে ? ···না খেয়ে মরছে কারা ? বেনে দোকানীর তো ভাঁড়ার ভর্তি আছে আর ব্রাহ্মণরা তো প্রায় সকলেই বিদেশে চলে গেছে। কিন্তু সব থেকে বেশি অসুবিধেতে পড়েছি আমরাই— কিষাণরাই সব মরতে বসেছে।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'ভগবানের বিচারের মধ্যে অন্যায় রয়েছে দেখছি। নইলে ফসল যারা তৈরি করে তারাই ফসলের অভাবে মরে যাবে, এমন আশ্চর্য কাণ্ডও দুনিয়াতে হতে পারে···কাদের ফসল ভরা রয়েছে এই-সব ভাঁড়ারের মধ্যে জিজ্ঞেস করোতো দেখি, কে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেখুটে তৈরি করেছে ? কার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেছে ?'

এমন জ্বালাময়ী কথা তো অনেকেই বলেছিল। শোনার লোকেরও কোনো অভাব ছিল না কিন্তু কি লাভ হচ্ছে তাতে ?

'তুই তো ভেবেচিন্তেই অর্ধেক শুকিয়ে গেছিস।' কোদর বলে। ভগা গাছের ছাল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বলে, 'হাকিম নিজে রোগা কেন— এ তর্কে তো সারা শহরই এখন মেতে উঠেছে।'

উচিত কথা বলাতেও কালু ওদের ওপর চটে ওঠে, 'আমি করব কী বলতে পারিস···তাছাড়া ভুল কিছু বলেছি নাকি ? যে পেট দিনে দেড় সের করে দানা খেত তাকে অর্ধেক তো অন্ততঃ দিতে হবে ?··· না ভাই না, সত্যি বলছি কোদর, আমি আর এই ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। আর কেনই-বা সহ্য করতে থাকব ? তার চেয়ে বরঞ্চ ঐ ডোবায় ঝাঁপ দিয়ে দুজনে যেমন ডুবে মরেছে তেমনি আমিও কেন মরব না তুই বল তো একবার ?'

ভগা-কোদরদের ক্রমশ মনে হতে থাকে যে কালু বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে পাগলের মতো বকবক করছে। তারা তার কথায় আর কোনো মন দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালু সারা রাস্তা বকবক করেই যেতে থাকে।

'কিসের জন্যে বেঁচে থাকা ? রোজগার করে সরকার আর ব্যবসাদারদের ভাঁড়ার ভর্তি করার জন্যে ?···তলকচন্দ্র কারবারীর

শালা-সম্বন্ধীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে? আর তাকে সোনা-রুপায় মুড়ে রাখার জন্যে···না ভাই না, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না···'

কালুর এ ধরনের প্রলাপে রণছোড়-শঙ্করদা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যায়। তাকে বকাবকি করে কিন্তু তা সত্বেও তার সেই একই কথা, একই অস্থিরতা! তার ওপর আবার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। ঘুম আসতে চায় না।

ভলীও তাকে ধমক দেয়, 'বকবক বন্ধ করে, সকলকে এখন শুতে দেবে কি? নাও কত খাবে খাও এখন। আমি তো পই পই করে বারণ করেছিলাম যে উপকার করা ছাড়ো। তা ছাড়বে কেন···! কুশালজীর (কালুর ঠাকুরদা) বংশ লোপ হবে তো তাতে ওনার কি? পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, 'খাও এখন বোকাচন্দর! কাঁদো ডাক ছেড়ে....'

বারান্দার পাশের ঘরে শুয়ে ছিল কালু, ভীষণ রেগে যায় সে। গালাগালি দিলে শ্বশুর-শাশুড়ী শুনতে পাবে, আর মারপিট করতো —'আমি জানি তুই আজকাল বিপথগামী হয়েছিস। কিন্তু এখন আমার উপায় নেই। বেঁচে থাকি যদি তো একেবারে টিট করে দেব।'

'সে তুই খুব করেছিস দেখা আছে।' ভগার যুবতী বোন রুখী ভলীর মুখ চাপা দেয়, 'চুপ কর বউদি... !' চুপি চুপি বলে, 'না খেয়ে মরে যদি তাতে তোর কি? তুই তো আর এখন না খেয়ে মরবি না?'

আর তোর নিজের কি?...মুখপুড়ী পাজী।' ভলী রুখীকে টিটকিরি দেয়।

'ক্ষিদেয় তো সিংহ বেচারীর মরে যাবার মতো অবস্থা।' ভগার বউ কোদরের বৌয়ের সাথে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে।

মেয়েরা ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। কিন্তু একটা দরজা খোলা থাকায় এবং নিস্তব্ধ গভীর রাত বলে সব কথা না শোনা গেলেও অর্ধেক শোনা যাচ্ছিল। বাইরের পুরুষেরা হয় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল

নয়তো জেগে থেকেও কালা হয়ে গিয়েছিল।

কালু কালা সেজে চুপ করে পড়ে থাকে, ঘুমোতে পারে না। আর কি করেই বা ঘুম আসবে ? যুবতী স্ত্রীদের না হয় কিছু বলার নেই, কিন্তু শঙ্করদার স্ত্রী-যে কি বলে ঐ যুবতী স্ত্রীদের কাছে গিয়ে— এবং নিজের মেয়ে রুখীকেই মিনতি করতে থাকে, 'ক্ষিদেয় মরে গেলাম রে ; এমন ব্যাপার হলে হতভাগী আমাকেও কালকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যাস।'

কালুর জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, 'হাঁ হাঁ, নিজের বয়সকালে যেটুকু কম ছিল এখন তা পুরো করে নাও !'....কালু এত রেগে যায় যে তার ইচ্ছে হচ্ছিল কোনো বাড়ির উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। আর হয়তো করেও বসতো....কিন্তু কে জানে তাতেও মৃত্যু হবে কিনা ?

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে সে মনে মনে ঠিক করে যে, 'কাল থেকে মেয়েদের কাউকেই বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।'

সকাল হতেই সে এই সিদ্ধান্ত অন্য পুরুষদের বলে শোনায়। কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে আগ্রহ উৎসাহ কম বলে মনে হল। খোদ শঙ্করদাই বলে বসে, 'এমন সময় লজ্জাসরমের কথা চিন্তা করে আর কি হবে, কালু ? ধরিত্রীর অসীম সহ্য গুণ বলতে হয় যে সব-কিছুই ঘটতে দিচ্ছে।'

শঙ্করদার শেষের কথাটা যে কত সত্যি, কয়েকদিনের মধ্যে কালু তার প্রমাণ পেয়ে যায়।

ভগার এক জায়গায় কাজ জুটে যায়। তুষর ভর্তি ছাই চালতে হবে, একটা রুটি মজুরি পাবে। কিন্তু কালু ভাই, বলে, 'আমি তো তিনটে রুটি পেয়েছি— 'যে দিয়েছে সে লোক ভালো বোধ হয়।'

'এমনি এমনি ভালো নাকি—'

কালু যেন তক্ষুনি ব্যাপারটা বুঝতে পারে, 'চেপে যা চেপে যা, বাজে গুল মারিস কি। বাড়ির মালিক তোদের দুজনকে একা ছেড়ে দিয়ে মাঠে গোরু চরাতে চলে গিয়েছিল, এই বলতে চাস তো··· ?'

'তুই আমার কথাটা পুরো আগে শোন তো? বাড়ির মালিক বাড়িতেই ছিল। তবে সেও উপরের ঘরের কোণের দিকে অন্য কারোর সাথে ফসলের সঙ্গে ছাই মিলিয়ে রাখছিল।'

'তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না! এরকম সময় কেউ বাড়িতেই ঢুকতে দেয় না আর তুই বলছিস শেঠ বাড়ির অন্দরমহলে লোক নিয়ে গিয়ে—'

'লোক নয়'। সে ইঙ্গিত করে কালুর কানের কাছে মুখ নিয়ে যায়।

কালু উঠে বেরিয়ে যায়, 'কে জানে এই দুনিয়ার কি হবে শেষ পর্যন্ত।'

কালু যদি তার অবচেতন মনকে জিজ্ঞেস করতো, তাহলে বুঝতে পারতো তার এই রাগ-বিরক্তি 'দুনিয়া গোল্লায় চলে যাওয়ার জন্যে নয় বরং তাকে রুটি খাওয়ানোর মতো কাউকে সে পাচ্ছিল না বলেই, তাই হয়তো সে বিড় বিড় করে বলে, 'একবার যদি কেউ পেট ভরে খাওয়াতো···সারা জীবন তার কেনা গোলাম হয়ে থাকতাম।'

সেই আশাতেই সে ডেগড়িয়ার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'কিছু কাজ আছে তোমাদের··· একটা রুটি দিলেই চলবে···একগাল ভাত খেতে দিলেও অনেক হবে।'

একদিন দুপুরবেলা গোরুকে খাওয়ানোর জন্যে এক বিধবা মহিলা এক থাল ভাত নিয়ে বাইরে এলো, গোরুর খাবার বুঝতে পারা সত্ত্বেও কালু তাকে মিনতি করে, 'এটা আমাকে দিন, বোন আমি আপনার বাসন মেজে দেব।'

'আ মর নির্বংশের বেটা! গোরুর মুখের খাবার খেতে বেরোল কোত্থেকে দেখো দেখি!' বিধবা গাল পাড়লেও পরের মুহূর্তে আবার বলে, 'চল্ মেজে দিবি চল্, 'তোকে অন্য খাবার খেতে দেব।' কিন্তু ঠিক মতো পরিষ্কার হওয়া চাই।'

'ঐ হুলোর থেকে আমি অনেক বেশি ভালো করে···' বলতে বলতে অন্য আর-একটা লোক সেই জড়ো করে রাখা বাসনের পাশে বসে পড়ে। তাকে মহিলাটি ভাগিয়ে দেয়, 'আগে এ বলেছে।'

কালু খুশি হয়ে ওঠে, 'আমার হাত একটু সিধে হয় না বটে কিন্তু একবার দেখুন আপনি…' আর খোশামোদ করার প্রয়োজন ছিল না তবুও সে ছেঁড়া কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে বাসনের পাশে বসতে বসতে বলে, 'আয়নার মতো চক্‌চকে করে দেব—মুখ দেখা না গেলে তখন বলবেন।'

সত্যিই কালুর বাঁ হাত কিছুটা অক্ষম হয়ে গেলেও বাসনগুলো চক্‌চক্‌ করতে থাকে। বউটি জল ঢেলে দিচ্ছিল, 'দেখুন দেখি, মুখ দেখা যাচ্ছে কিনা।' কালু সেই গোলগাল যুবতীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিন্‌সে, নে নে ঠিক আছে। আদিখ্যেতা না করলে তো …নে তোর হাতে জল দিয়ে দিই আর বাসনগুলো ঐ দালানের চৌকো পাথরের ওপর উপুড় করে রেখে দে, তা হ্যাঁ, কি জাত তোর ?

'প্যাটেল' কালু সগর্বে বলে।

ঠিক আছে তাহলে, নিয়ে আয় ভেতরে বলে মহিলাটি ঘরের মধ্যে চলে যায়।

সেইদিন কালু পেটপুরে না হলেও আধপেটা খেয়েছিল। ঐ মহিলার রাতের জন্যে ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ খাবার ! এর জন্যে তাকে প্রতিদান হিসেবে কিছু খোয়াতে হয় না। দয়া ও মানবতার খাতিরেই জুটে যায়। তবুও যেন সে ভেতর ভেতর কিছুটা আশাহত হয়েছিল। ভগার কথা সত্যি মনে হলেও সেটাকে মিথ্যে বলে ধরে নিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে ; মিথ্যে ডেঁপোমি দেখাতে আজেবাজে কথা বকে।'

সে যাই হোক এটা সত্য যে, মানুষ তার মানবতা ভুলে গিয়েছিল, সংযম ত্যাগ করেছিল। সাথে সাথে লজ্জা-শরম, মান-ইজ্জত সব জলাঞ্জলি দিয়েছিল। দয়া, ধর্মকর্ম, ইত্যাদিকে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ঢেকে রেখে এসেছিল। কেবল একটাই ভাবনা-চিন্তা ছিল। কেমন করে পেটের গর্ত ভরবে, ক্ষিদের জ্বালা কমবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ; বেঁচে কি করে থাকা যেতে পারে ?

এই একমাত্র লক্ষ্য ছিল সবার আর কাজও সবাই এইভাবে করতে থাকে। ডেগড়িয়ার অলিতে-গলিতে হাজার মানুষ তাই কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। শংকরদা-রণছোড়ের মতো অন্য অনেকে লজ্জা-শরম টান মেরে একধারে ফেলে দেয়। সবার আগে খোন্তা-কোদাল ধরার জন্যে মুরগী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে তারা…কোনোদিন গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে আর কোনোদিন বা কাজ পেয়ে যায়। সারা দিনের খাটুনির পর একপোয়া দেড় পোয়ার মতো চাল-ডাল নিয়ে আসে। কিন্তু সেই চাল-ডাল সেদ্ধ করে খাওয়ার পরে যখন ঘুমোতে যায়, সারা গায়ে-গতরে তীব্র ব্যথা-বেদনায় মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে।…দু-চারবার এটা অনুভব করাতে ঐ দেড় পোয়া খিচুড়ীর বদলে এখানে তেঁতুল গাছের ডগার সাথে যে এক মুঠো দানা পাওয়া যেত, তাই খেয়ে পেটে হাঁটু চেপে থাকা, অনেক লাভদায়ক বলে মনে হতে থাকে। যদি কিছু জুটে যায়, সেই আশায় দুপুরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে, খোলা দরজার সামনে ভিক্ষের জন্যে হাত পাতে, ‘ওগো, চাষার ছেলেদের দিকেও একটু ফিরে তাকাও! বেঁচে থাকি যদি আমরাই আপনার গোলাঘর ফসলে ভরে দেব।’

কোথাও মানুষ আর কুকুরের মধ্যে এক টুকরো রুটি নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।…

একদিন যারা অন্য সকলকে দান করতো তারাই আজ অন্যকে দেওয়া ফসল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ব্যবসায়ীদের গুদাম থেকেও কেড়ে নিত হয়তো। কিন্তু কার্তুজওলা বন্দুকের খেলা দিনদিন যেন বেড়েই যাচ্ছিল। লোকেদের মনে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে লুঠ করার আগেই বন্দুক থেকে গুলী ছুটে আসে— প্রাণ নিয়ে নেয়, তবে কি বন্দুকটা আগেই বুঝতে পেরে যায় নাকি? সরকার তো আর পাগল নয় যে এমনি এমনি লোককে মারবে! নিশ্চয় ওই বন্দুকের মধ্যে কিছু কারসাজি আছে। ওই টোটাতেই যদি কোনো অপদেবতা ভর করে তো আশ্চর্যের কিছু নয়।

সে যাই হোক, লোকে চুরি-ডাকাতির কথা চিন্তাই করতে পারে না। তবুও ডেগড়িয়ার লোকেরা প্রতি মুহূর্ত লুঠপাঠের গুজব শুনতো আর শহরের বাইরের লোকেরা এদের মৃত্যুর খবর। এই দুই গুজবের মধ্যে বন্দুকের 'ধাই ধাই' শব্দও বেশ শোনা যেতে লাগল।

দিনের পর দিন বন্দুকের শিকারের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে আর কালুর শ্বশুরও একদিন এই সংখ্যা আর একটু বাড়িয়ে দেয়।

একদিন রাতের সময় ক্লান্তিতে ও ক্ষিদেয় আধমরা অবস্থায় কালুর শ্বশুর একমুঠো খাবার দানা নিয়ে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ তার কানে পাশের দরজা থেকে আওয়াজ ভেসে আসে—আয় আয় কুকুর.... তু...তু...তু!'

বুড়ো দরজার দিকে এগোয়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দরজা খোলার অপেক্ষা করে থাকে। কুকুরটাও এসে পৌঁছয়, নখ দিয়ে দরজার গায়ে আঁচড়াতে থাকে 'আঁউ আঁউ' আওয়াজ করে।

বৈষ্ণব লোকটি অল্প একটু দরজা খুলে রুটির টুকরোটা কুকুরের মুখে দিয়ে দেয়। দরজা বন্ধ করতে যাবে কিন্তু পাশেই একটা লোককে লুকিয়ে থাকতে দেখে উদ্দেশ্য ধরে ফেলে চেঁচিয়ে বলে—'পালা শালা চোর! ওদিকে যা! —'সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শির অন্য বৈষ্ণবরা ব্যাপার কিছু না বুঝেসুঝেই সাহায্য করতে দৌড়ে আসে…'

বাজারের চাতালে বসে থাকা থানাদার কার্তুজওলা বন্দুক নিয়ে দৌড়ে এসে কিছু জিজ্ঞেস না করে বুড়োর বুকে বন্দুকের নল চেপে ধরে গুড়ুম্ করে গুলী চালিয়ে দেয়। বৈষ্ণবরা তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দেয়, 'হায় হায় সর্বনাশ হয়ে গেল! থানাদার গুলী চালিয়ে দিলে....এখন আমাদেরই মাথায় সব পাপ এসে পড়লো....হায় হায় ভগবান...'

কালু এতে খুশিই হয়। চিতা জ্বালানোর সময় বলেও ফেলে, 'আপনার দুঃখতো শেষ হয়ে গেল। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন কিন্তু আমাদের কপালে সে সৌভাগ্য—'

আর অন্য লোকদের বলে, 'আরে ভাই, তোমরা হয়তো মানবে না।

তোমরা এই টোটাওলা বন্দুক কিংবা ইংরেজকে যতই খারাপ বলো-না কেন আমার তো বেশ ভালো লাগছে। তোমরাই বল, কুকুরের মতন খালি ঘেউ ঘেউ করে ঘুরে মরার চেয়ে এই মৃত্যু খারাপ কোথায়? কোথায় পান থেকে চুন খসলো কি অমনি তোমার দুঃখেরও শেষ হল!' কিন্তু পরে রাজুকে কান্নাকাটি করতে দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গভীর একটা নিশ্বাস নিয়ে সে তার নিজের মনের আসল ভাব ব্যক্ত করে—'ধিক্ খুনী সাহেব তোদের! তোদের জ্ঞানবুদ্ধিকে ধিক্কার! —বন্দুক উঁচিয়ে তোরা বর্ষার দিনের প্রায় কাছে এসে পৌঁছনো মানুষকে খতম করে দিচ্ছিস...আমরা ভাবতাম তোরা বুঝি কোনো দেবতা এসেছিলিস, কিন্তু না ভুল আমাদেরই, তোরা তো দেবতার রূপ ধরে সব দানব উপস্থিত হয়েছিস।' কালু এত রেগে যায় যে তার দাঁতে দাঁত লেগে যায়, নিজের অশক্ত ফুলো হাতটাও মুঠো করে ধরে, 'কিন্তু কি আর করতে পারি....যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে সমস্ত কিষাণদের মেরে ফেলতুম। তারপরে দেখতাম তোদের কোন্ বাপ আসে লাঙ্গল চালাতে, আর কে মেমেদের গমের আটার পাতলা রুটি খাওয়ায়?'

এই দীপ্ত কথার চেয়েও কালুর অন্তর অনেক যেশি আলোড়িত হয়ে ওঠে; কিন্তু ও কি করতে পারে? সরকার আর হতভাগা ব্যবসায়ীদের কাছেও ঐ বাহাদুর বন্দুক ছিল। ভগবানকে তো কোথায়ও দেখা যায় না। রাগ আর কার ওপর দেখাবে? নালিশই-বা কাকে করবে, কারণ যার কাছে নালিশ নিয়ে আবেদন করতে যাবে, দেখা গেল সে নিজেই অপকর্মের মূল।

সে মরার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। তার কাছে যা কিছু ছিল সব শেষ হয়েছিল। মরবার সময় তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে সর্ববিদ্যা বিশারদ সাহেবরা হোক, সরকার হোক, তাগড়া পেটমোটা ব্যবসায়ী হোক কিংবা ভগবান, এই চার জনকে যদি নাও, হয়তো চারজনের একজন কাউকে হাতের কাছে পেলে তাকে ক্ষিদের জ্বালায় জ্বালিয়ে একবার দেখো, যে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

তারপরে তার রক্ত চুষে খেতে খেতে মরতো সে....কিন্তু কি আর করবে। এই সব চারজনের কাউকেও দেখতে পাওয়া যায় না। এদিকে এধারে তার নিজের পাড়ার ভগা-কোদর অবধি তার প্রতি কোনো নজর দেয় না। শুধু তাই নয়, ডেগড়িয়ায় যে হাজার খানেক লোক ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যেও কেউ তাকে দেখতে পারতো না। ভলী তো যেন তাকে চিনতেই পারে না। সকলেই যে যার নিজের ধান্ধায় ঘুরছিল— কেউ কারুর জন্যে নয়, কেবল নিজের চিন্তাতেই মেতে ছিল। তখন কালুর খেয়াল আর কে করবে ?

হ্যাঁ, কেবল রাজু ছিল, সুবিধে হলেই সে তার কথা শুনত আর তাকে সে প্রায় চোখে চোখে রেখেছিল।

কালু তার সেই রেগে যাওয়া আর বাজে বক-বক করা সবকিছুই ছেড়ে দেয়, যেন অন্তিম সময় এগিয়ে এসেছে। এই জগতে নিজের জীবনে যা কিছু সত্য ছিল তার যাচাই শেষ করে নেয়, 'সব মিথ্যে ! সব কিছুই অর্থহীন চেষ্টা। সত্য শুধু দুটো জিনিসে আছে : এক ঐ রাজুর মধ্যে আর দ্বিতীয় মৃত্যুতে।'

অদূরেই মৃত্যুর উপস্থিতি সে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে। তাই রাজুর সাহচর্য ও সঙ্গ সে বাড়িয়ে দেয়, এইভেবে যে শেষ দু-চার দিন এক সাথে ঘুরে নিই। সে লজ্জা, সঙ্কোচ ও এছাড়া যদি অন্য কিছু থাকে সব ছেড়ে রাজুর সাথে মিশতে থাকে। রাজুকে বলে, 'আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, দু-চার দিন আর—'

রাজুই বা কতদিন বেঁচে থাকবে ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, "মৃত্যুর ক্ষণ গুণছি বসে বসে বল না কেন !...'

সেই দুজন প্রাণী, সর্বজ্ঞ ইংরেজ, কার্তুজওলা বন্দুক আর ফসলে ভরা গোলাঘর— সব কিছু ত্যাগ করে সব ভুলে গিয়ে, একে অন্যের ছায়া হয়ে বাঁচার শেষ কঠিন প্রহরগুলো কাটাতে থাকে। একজন অপরজনকে আশা-ভরসা দেয় আর মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে, 'কখন মৃত্যু আসবে আর এই কোলে মাথা রেখে শেষ ঘুম ঘুমোব।'

॥ সাঁইত্রিশ ॥

অন্তহীন বেদনা

আশা ছিল এক বছরের অনুপস্থিত বৃষ্টি—জ্যৈষ্ঠের শেষে পনেরো দিনের মধ্যে নিশ্চয় এসে যাবে, কিন্তু বরুণদেব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন কিংবা তাঁর সব জল শেষ হয়ে গেছে অথবা ফেরবার সময় রাস্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

পৃথিবীতে তখন মৃত্যুর বৃষ্টি হতে থাকে! হাটে বাটে মাঠে যে দিকে তাকাও কেবল মৃতদেহ আর মৃতদেহ। কাকে জ্বালাবে, কোথায় কাকে কবর দেবে! অতএব শোক প্রকাশ, অশৌচ আর শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকাজ ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপার। মৃত্যুতে এখন পিছনে রেখে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনেরা আপদ বিদায় হবার মতো স্বস্তি অনুভব করতে থাকে। তারা খুশি হয়ে ওঠে, তারা ঠিক করে নিয়েছিল না দেখলে তো দুঃখ পেতে হয় না। তাই চোখ কান বন্ধ করে থাকবে।

রণছোড় দাদা আর শংকরদার মৃত্যুতে এই দুঃখ, কষ্ট এবং ক্ষিদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল দেখে কালুর তো ঈর্ষা হতে থাকে তার ওপর। ওরা তো অমর হয়ে গেল! আর আমরা পড়ে রইলাম, না জানি কতদিন আর এইভাবে ক্ষিদেয় ছটফটানি ভাগ্যে লেখা আছে।

খাবার ফসল শেষ হয়ে যায়। মুদির কাছ থেকে, 'শেঠ বীজ চাইতে আর আসবো না' বলে দু'মন ঘাসের দানা যে এনেছিল তাও শেষ হয়ে যায়। দু'মনের অর্ধেক তো কুঁরো আর কাঁকরে ভর্তি ছিল আর এমন চিট্‌চিটে হয়ে গিয়েছিল পড়ে থেকে থেকে যে ধুতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। তা সেও আবার রাজু খুড়-শ্বশুর, শাশুড়ী তিনটে ছোটো বাচ্চা, ভলী আর সে নিজে এই সাত-আটজনের কদিন বা চলবে?

অবশ্য ফসল যেমন কম হতে থাকে ওদিকে তেমনি লোকও কমতে

থাকে। শাশুড়ীর মৃত্যু হল, খুড় শ্বশুর ছোটো ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে পরপারের পথে পা বাড়ায়। কালু এক দিক দিয়ে যেমন খুশি হয় অন্যধারে আবার তেমনি দুঃখিত। নিষ্কর্মারা সব বেঁচে রয়েছে আর যারা কাজের তারা সকলে মরে যাচ্ছে। 'নিষ্কর্মা ছিল তখন একমাত্র ভলীই।'

এই ধরনের চিন্তার জন্যে পরে নিজেই নিজেকে শাসন করে থাকে, 'অন্যের মৃত্যু কামনা করছিস, দেখবি তুই-ই আগে মরবি !....

কথায় আছে আজন্মার বছরে 'মাস বেশি থাকে'। সময় এমন পড়েছে যে মনে হয় যেন এই দুর্ভিক্ষকে দেখেই কথাটা রটেছিল।

আষাঢ়ের মেঘবিহীন স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশ দেখে মনে হয় যেন গোরু-বলদ আর জনমানব শূন্য সমতল চাষের ক্ষেত। দিগন্তে কোথাও কোনো মেঘের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। এই আষাঢ়ের রোদের তেজের কাছে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রোদও হার মেনে যাবে।

কালু ভাবতে থাকে, এখন বাঁচার জন্যে একটাই রাস্তা খোলা আছে লুঠপাট। কিন্তু সে একলা কি করবে ? ভগা, কোদর তো সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।....

ওদিকে ডেগড়িয়ার ব্যবসায়ী মহাজনেরাও কিছুটা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। বিত্তবানেরা বাড়ি তৈরি করিয়ে লোকদের কাজ দিতে থাকে এবং ফসলের মালিকরা 'হ্যাঁ-না' করতে করতেও অল্প সল্প করে ফসল সুদের বিনিময়ে দিতে থাকে। কিছু লোক পরামর্শ দেয়, 'ইংরেজ সরকার রেলের লাইন বসাচ্ছে আর কুলি-মজুরদের টাকা-পয়সা দিচ্ছে। বাঁচতে যদি চাও তো সেখানে চলে যাও।'

কিন্তু কোথায়, কে ইংরেজ আর কোথায় রেলের লাইন ! এদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউ ছিল না যে কখনো ডেগড়িয়ার বাইরে কোথাও গেছে। অতএব তাদের কাছে আহমেদাবাদ কিংবা বরোদা তো পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের দেশ। তবুও কিছু লোক রওনা হয়ে পড়ে—ডেগড়িয়া থেকেই শুধু নয় আশপাশের গাঁ থেকেও।

তাদের মধ্যে কতজনে রেললাইন পাতার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছতে

পেরেছিল আর কত জন যে রাস্তাতেই মরে পড়ে ছিল তা ঈশ্বরই জানেন, আর···না, না। ঈশ্বর ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না সে কথা। কারণ কে কে যে রওনা হয়েছিল আর কে কোথায় রয়ে গিয়েছিল তার হিসেব কেউ জানত না। আর স্বামীর স্ত্রীকে পর্যন্ত কোনো প্রয়োজন ছিল না। তা না হলে নানার খোঁড়া বউ মুসলমানদের সঙ্গে চলে যায় আর নানা স্রেফ না দেখার, না শোনার ভান করে থাকে !

এদিকে ডেগড়িয়াতে পেট ভরে খাবার মতো অবস্থাপন্ন লোকেদেরও মৃত্যু হতে থাকে। এর কারণ হয়তো অতিরিক্ত গরমও হতে পারে বা বিদেশ থেকে এসে জড়ো হওয়া লোকেরাও হতে পারে। যেমন ডেগড়িয়ার সুন্দরজী শেঠ বলে ওঠে, 'বুভুক্ষু চাষাদের অভিসম্পাত লাগছে বলে এমন হচ্ছে।'

অন্য একজন বৈষ্ণব তুলসীদাসের সেই দোঁহাটা উদ্ধৃত করে সুন্দরজী শেঠের বক্তব্যকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। 'ঠিক কথা বলেছেন। তুলসীদাস বলেছেন ঃ

"কহে তুলসীদাস গরীবের অভিশাপ ব্যর্থ নাহি যায়,
মৃত পশুর চর্ম ক্রমশঃ ঘর্ষণে লৌহ ভস্ম হয়।"

কারণ সে যাই হোক-না কেন ডেগড়িয়ার মহাজনেরা এবার সুন্দরজী শেঠের কথায় মন দেয়, 'বৃষ্টি যদি না পড়ে তাহলে আমাদের যাদের কাছে যথেষ্ট ফসল আছে তারাও কেউ বাঁচবে না; আর বৃষ্টি যদি পড়ে তবে এই লোকেরাই একগুণের বদলে অনেকগুণ বেশি ফেরত দিয়ে দেবে। আমরা তো আর কোনো দিন মাঠে লাঙ্গল চষতে যেতে পারব না···

ডেগড়িয়ার মহাজনেরা গুদাম থেকে শস্য বার করে দিতে রাজী হয়ে যায়। দামও অর্ধেক ধরতে থাকে। বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী করতে থাকে।

প্রথম দিকে এই দান-খয়রাতী ফসল নেবার লোকের সংখ্যা অনেক কম ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন সে সংখ্যা বাড়তে থাকে।

পেটের জ্বালা ক্রমশঃ সকলের আত্মসম্মান বোধ নষ্ট করে দেয়। কালুকেও রাজু বোঝাবার চেষ্টা করে।

'তুমি তো বলতে যে এই-সব গুদামে আমাদেরই নিজের ফসল আছে?'

'হ্যাঁ আমাদের তো?'

'তাহলে মহাজন যখন দিচ্ছে আর আমাদেরও নেওয়া দরকার তখন তাতে লজ্জার কী আছে?

'যে লজ্জা-শরম মানে তার কাছে লজ্জার কারণ বৈকি! তাছাড়া আমাদের ফসল বলেই তো লজ্জাটা আরো বেশি করে লাগছে। আমাদেরই শস্যের জন্য আমাদের হাত পাততে হবে, ভিক্ষে চাইতে হবে!'

'হয়েছে-হয়েছে! বসে বসে কেবল এ-সব কথা ভাবো যদি তাহলে আমিও আনতে যাব না, বলে দিচ্ছি। এই তোমার দিব্যি রইল বলে দিচ্ছি তখন এই ছেলে দুটো আমাদের সঙ্গে মরতে বসলেও যাব না।'

একতাল মাটির দলার মতো হয়ে পড়েছিল কালু কিন্তু একথার পরে তাকে উঠতেই হয়। তবে এক শর্তে সে ওঠে, 'আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি বটে কিন্তু হাত পাততে পারব না।'

'ঠিক আছে হাত পেতো না। তোমার হয়ে আমি হাত পাতব, তাহলে তো আপত্তি নেই?'

'দূর পাগলী!…' কালুর কোঠরাগত চোখে, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালের হাড়ে হাসি খেলে যায়। বলে, 'এই দেড় পো চাল-ডালের খিচুড়ি আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছিস তুই? দু'সের করে দিলেও আমার পেট আর ভরে না।' এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'তুই বুঝি ভাবছিস যে এবারে বৃষ্টি হবে! এবার তো প্রলয় হবে বুঝলি বোকা! কেউ আমরা বেঁচে থাকব না, ঐ মহাজনেরাও নয়! তবে…কিসের জন্যে বোকা, কিসের জন্যে এই মরণের মুখে এই চাষার ছেলেকে হাত পাততে বাধ্য করছিস!…না না রাজু, তুই একলা যা, আমি যেতে পারব না।' সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দূরের সেই

ভিখিরিদের লম্বা লাইনের দিকে জলভরা উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের সেই অর্ধনগ্ন অস্থিপাঁজরের মধ্যে প্যাটেল ও ব্রাহ্মণ দু'জাতই ছিল। কিছু বেনেও ছিল আর ঠাকুর বংশধরেরা তো প্রচুর সংখ্যায় ছিল। তেলী, সোপাই ইত্যাদি মুসলমানেরাও ছিল লাইনের মধ্যে, কিন্তু এদের অধিকাংশের পেশা ছিল চাষ-আবাদ। কালুর পা যেন অবশ হয়ে যায়, 'ভগবান বাঁচিয়ে রাখতে চান যদি তো গাছের ছাল খেয়েই বেঁচে…'

'কিন্তু আমাকে পৌঁছে দেবে তো! নাকি আমাকেও না খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও? তোমার এই দুজন কুটুমের কথাটা তো একবার চিন্তা করে দেখো?' রাজু গজগজ করতে থাকে।

আমার জন্যে তোরা কেনই-বা মরবি? নে চল!' এই বলে সে পা বাড়ায়।

কাছে পৌঁছে সে চারধারে তাকিয়ে দেখতে থাকে। উঁচু চাতালওলা মন্দিরের দালানে বসে সুন্দরজী শেঠ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এমনি ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী তার—সোনালী কল্কা দেওয়া লাল পাগড়ী। গলায় চাদর ঝুলিয়ে গোল পাশবালিশে হেলান দিয়ে চারধার আলো করে রয়েছেন। অন্য মহাজনেরাও আশপাশে বসে ছিল।

টোটাভরা পিস্তল হাতে নিয়ে চেয়ারে পুলিস সার্জেণ্ট বসে। সেই কার্তুজওলা ভয়ংকর বন্দুক নিয়ে হাবিলদার দাঁড়িপাল্লার পাশে দাঁড়িয়ে চারধারে নজর রাখছে। কিন্তু সেপাই লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা আসছে তাদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে আর যারা নিচ্ছে তাদের সাবধান করে দিচ্ছে, 'ভুলেও যদি দ্বিতীয়বার নিতে এসেছ কি ঐ বন্দুকের গুলী সোজা বুকের ভেতরে সেঁধিয়ে যাবে মনে রেখো।'

রাজুকে অন্য দিকের লাইনে পৌঁছে দিতে যাবার সময় কালু দেখতে পায় গোলাঘর থেকে ব্রাহ্মণ, যতটা ফসল বয়ে নিয়ে যেতে পারে তাই দান করে দিয়েছে এমন লোক, আবার বাড়িতে ফসল

রাখার মতো জায়গা হত না সব ভরে যেত এমন লোকও রয়েছে। যে লুঠপাট করাকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করত আর খুশি মনে দিলেও ভাইয়ের কাছ থেকে নিত না, তাকেও ভিখিরির মতো লাইনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

'হায় হায়, ওরে!...পেটের জ্বালাই যত নষ্টের মূল—' কালুর চোখে জল এসে যায়। 'যে মহাজনের কাছে সমস্ত দুনিয়া— বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা ও শেঠও হাত পাততে আসে আজ তাকেই হাত পাততে হচ্ছে! আর তাও মাত্র দেড় পো খিচুড়ির জন্যে।...ধিক্ এ জন্মকে!'

কেবল কালুই যে শুধু এ কথা ভাবছিল তা নয়। এমনি আরো কিছু লোক ছিল যারা এখানে হাত পেতে দাঁড়াতে আসে নি কোন দিন। শংকরদা আর রণছোড় বেঁচে থাকলে তারা আর যা খুশি করুক না কেন, এইভাবে লাইনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের চোখের সামনে হাত পাতত না!

কালু, রাজু আর ছেলে দুটোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে ফেরবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা বাড়ায়। সেপাই টিটকিরি দিয়ে ওঠে, 'এই নুলো, ওভাবে যাচ্ছিস কোথায়?'

'নিজের ডেরাতে' কালু না ফিরেই উত্তর দেয়।

'আরে দাঁড়িয়ে থাক বেটা ছুঁচো! কি রে শুনছিস না যে?'

কালু দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'আমি খেতে চাই না।'

'কেন খাবি না শালা? সকলে নিচ্ছে আর তুই নিবি না কেন? লাট সাহেব হয়ে উঠেছিস দেখছি।'

কালুর কাছে এই জবরদস্তি বিচিত্র লাগে আর সেও নিজেকে হারিয়ে ফেলে, 'লাট হলে তো নিয়েই নিতুম। কিন্তু আমি চাষী তাই নেব না। আমাকে মেরে ফেললেও আমি নেব না। গুলি চালিয়ে দিতে চাস তো চালা গুলি এই দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মানুষের দল ঘাড় ফিরিয়ে কালুকে —ধরিত্রীর সেই সন্তানকে দেখতে থাকে। সেই পুলিস সার্জেন্ট

আর সুন্দরজী শেঠও মাথা উঁচু করে দেখে এবং...

সেপাই চোটপাট কিছু করে বলার আগেই সে অন্য আর-একজন মহাজন পাঠিয়ে কালুকে নিজের পাশে ডেকে আনায়, জিজ্ঞেস করে, 'কেন ভাই মোড়ল, তুই এই দানছত্র থেকে ফসল নিবি না?'

কালু এর কী জবাব দেবে? আর দিলেও সে জানত এরা আমার জবাব—চাষার অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারবে না। সামনে পড়ে থাকা এই স্তূপীকৃত শস্যে আমাদেরই হবে না উল্টে বুকে গুলী চালিয়ে দেবে। অবশ্য কিছু নিশ্চয় করা যেতে পারত, যদি এই ফসলের যারা প্রকৃত মালিক তারা সকলে হাত পেতে ধরার বদলে হাত ওঠাতে পারতো। তাহলে এই বন্দুকওলারাও লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পেত না।

'কিসের জন্যে ভাবনা করছিস ভাই। আমার কথার জবাব তো দিবি'। সুন্দরজী শেঠের ভাষা শুধু যে মিষ্টি তাই নয়, অন্তরকেও যে স্পর্শ করে যায় এমনি তার আবেদন। তাই কালুর আগুনের জ্বালা ধরা চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়তে থাকে, 'কী আর বলব শেঠ! আমাদেরই নিজের হাতে তৈরি করা এই ফসলের কাঁড়ি দেখে আমার বুকের মধ্যে যে কী হচ্ছে—'

কথা শেষ করার আগেই কান্নায় স্বর বুজে যায় তার; কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

এত বড়ো বড়ো সব শেঠ মহাজন আর পুলিস সার্জেন্টদের সামনে দাঁড়িয়ে নুলো কালুকে মুখে মুখে জবাব দিতে দেখে দূরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা নানা হিংসেয় জ্বলে যায়···। কালুকে কাঁদতে দেখে এবং ব্যঙ্গ করার এমন সুযোগ আর কখনো আসবে কিনা ভেবে সে চীৎকার করে ওঠে, 'হাত যদি পাততে না চাস তো এখন বিধবা মাগীর মতো কাঁদতে বসেছিস কেন?'

এই কথাগুলো সুন্দরজী শেঠ ও ফৌজদার দুজনকেই কিছুটা বিরক্ত করে তোলে। নানার সৌভাগ্য বলতে হবে যে কালু তাকে কথাটা বলতে দেখতে পায় নি। আর ততক্ষণে সুন্দরজী শেঠ বলতে

শুরু করে, 'আমি বুঝতে পারি ভাই, 'নিজের প্রাপ্য জিনিসের জন্যে হাত পাততে লজ্জা আসে। কিন্তু এইভাবে দানসত্র খুলে বসতে আমাদেরও ঠিক তেমনই লজ্জা হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীকে যারা ভরণ-পোষণ করে তাদের আমরা কদিনই বা পালন করতে পারি। সে তো মেঘের কাছে জল নিয়ে যাবার মতো হাসির ব্যাপার।' শেঠ বিব্রতভাবে মলিন হাসে। গভীর নিশ্বাস নিয়ে সে বলে, 'কিন্তু এছাড়া কি করা যেতে পারে বল পাগলা তুই! বিধাতার সামনে আমরা সকলেই নিরুপায়···কই মুখ তুলে তাকা একবার আমার দিকে।'

কালু মাটির থেকে মুখ তোলে।

'তোর হয়তো মনে হবে যে দয়া করে ভিক্ষে দেওয়া হচ্ছে— হাত পাততে সঙ্কোচ বোধ করিস তো কাল থেকে এই চাতালটা ঝাড়ু দিয়ে যাস। আর নায়েবের কাছ থেকে বালিশ বিছানা চেয়ে এনে এখানে বিছিয়ে দিস তাহলে ঠিক হবে তো? তাহলে মনে হবে না তো মাগ্‌নায় খাচ্ছি?'

শেঠের এই নির্দেশ কালু মাথা পেতে নেয় আর চোখ দিয়েই যেন তাকে অভিনন্দন জানায়। মনে মনে বলে, 'কারবারী হলে যেন এমনি উদার হৃদয় হয় সকলের।'

শেঠ পুনরায় বলে, 'তোর মতন যদি অন্য আরো কেউ থাকে তো তাদের বুঝিয়ে বলিস। বলিস যে এ তোমাদেরই জিনিস তোমাদেরই দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে দান খয়রাতের কোনো কিছু নেই।'

কালু মাথা নেড়ে সায় দেয়। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে সে সুন্দরজী শেঠকে, 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' বলে চলে আসে এবং সকলের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে— 'আমাদের জিনিস আমরাই নিচ্ছি···আমার তৈরি ফসলও নিশ্চয় আছে এর মধ্যে। সেই বটগাছের পাশের জমিতে বোনা ধান, নিজের এই হাতে যে ধান নেড়েচেড়ে দেখেছি তারই চাল, দেখতে চাও যদি তো এর মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করে দেখাতে পারি।'

সেপাইদের কাছে কালু যেন চোখের বালি হয়ে ওঠে, শুধু বালি নয়—যেন লঙ্কার গুঁড়ো। কিন্তু খোদ সার্জেণ্ট শেঠজীকে সেলাম জানায়। সেই শেঠজী আপ্যায়ন করে সামনে ডেকে নিয়ে যখন কথা বলছে তখন তাকে আর কি করতে পারে? কালুর ওপরে তাদের রাগ তারা অন্যের ওপরে দেখাতে থাকে, 'শালা পালনকারীকে দেখনি কখনো !···শূয়োর, ঠিক করে লাইনে দাঁড়িয়ে থাক।'

চাল ডালের সেই দেড় পো খিচুড়ি পরনের ছেঁড়া ধুতির আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসার সময় কালুর হাসি পেয়ে যায়। এ তো সাধুর একূল ওকূল দুকূল যাবার মতো অবস্থা হল। ধর্ম হারাতে হল, এবারে প্রাণটাও যাবে।'

কালুর কথা মিথ্যে নয়। এতদিন এক পো দেড় পো মতনই জুটছিল কিন্তু তা ভুট্টা বা ঘাসের দানার মতো গুরুপাক ছিল, আর এখন এই চাল ডাল কালুর ভাষায়, 'একটা ঢেঁকুর তুললেই এই দেড় পো খিচুড়ি হজম হয়ে যাবে।' তার অপেক্ষায় বসে থাকা রাজুকে বলে সে।

'রাজু, যে ঐ কথাটা বলেছিল, ভগবান! কী বিচিত্র তোর লীলা, কে রোজগার করে আর কে তা ভোগ করে···ঠিক বলে ছিল সে।···আমাদের ভাগ্য যেমন ছাতামারা এই ভিক্ষেও তেমনি জুটেছে।

রাজু চটে ওঠে, 'আমার ভাই আর ভগা যা বলে একটুও অন্যায় কিছু বলে না। চোখ পাকিয়ে বলে, 'খবরদার আর কখনো এই ধরনের কথা বলবে না। আধেক শরীর তোমার তো এইসব ভাবনাচিন্তা করেই গেছে। নিজের শরীরের দিকে তো একটু খেয়াল রাখবে। তুমি জানো কি সবচেয়ে ভয়ংকর শয়তান কে?

কালুর কাছে রাজুর গালমন্দও মধুর লাগে। আর এ তো শুধু রাগ দেখানো, নিতান্তই মিষ্টি। হাসতে হাসতে কথার মধ্যে উত্তর দেয় সে, সব থেকে বড় শয়তান তো ক্ষিধে কিন্তু··· '

কিন্তু রাজু এ সময়ে বিন্দুমাত্র হাসিঠাট্টা পছন্দ করছিল না। সে

বলে ওঠে, 'না! শয়তান হল চিন্তা। মানুষের হৃদয়কে কুরে কুরে খায়।

রাজু এরপরে তাকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে।

'ঠিক আছে ভাই, আর আমি আজেবাজে কথা একদম বলব না।'

একথা বলে কালু আবার গম্ভীর হয়ে যায়। বলে 'কিন্তু খারাপের মধ্যে চরম খারাপ কি হতে পারে, তা তুই জানিস কি?

'ক্ষিধে!'

'না! আমিও সবচেয়ে বদ ক্ষিধেকেই বলতাম কিন্তু আজ তার থেকেও খারাপ অন্য জিনিস দেখলাম…'

নিজের কাপড়ের সেই ছোট্ট পুঁটলী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সেটা রাজুর দিকে তুলে ধরে। উৎসুকভাবে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'জানিস কি তুই? ক্ষিধের থেকেও খারাপ হল ভিক্ষে। ক্ষিধে হয়তো শরীরের হাড়-মাংস গলিয়ে শেষ করে দেয় কিন্তু এই ভিক্ষে— ' কালু যেন নিজেকে নিজে বলতে থাকে, 'রাজু! সত্যি বলছি, আমাদের সম্মান, আমাদের আত্মমর্যাদা সব কিছু নষ্ট করে দেয়। একেবারে শেষ করে দেয়। আর মনে রাখিস— '

রাজু আর সহ্য করতে পারে না। মা যেমন ছোটো বাচ্চাদের ধমক লাগায় তেমনি তাকে ধমকে ওঠে, হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'তুমি চুপচাপ বাড়ি যেতে চাও তো চলো, তা না হলে— ' কিন্তু এরপরেই তার গলা অবশ হয়ে যায়, 'কেন তোমরা সকলে মিলে আমার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছ।' এই বলে সে বাচ্চাদুটোকে ধাক্কা দিয়ে বলে, 'এর থেকে তো আমি মরে গেলে আপনাদের—

রাজুর এই রাগ কালুর চেতনা ফিরিয়ে আনে, যেন মাতালের নেশা ছুটে যায়। নিজের মনে অনুশোচনা করছে এমনভাবে করুণ গলায় বলে, 'তোর দিব্যি দিয়ে বলছি রাজু! এখন থেকে আমি আর বাজে কথা বলব না, ভগবান নিজে জিজ্ঞেস করতে এলেও নয়— '

'তাহলে এবার চুপ করে চলো দেখি!' কালু সুবোধ বালকের

মতো এগিয়ে গিয়ে ছেলে দুটোর সঙ্গে এক সাথে চলতে থাকে।

আর রাজু যেন বিরক্ত রেগে যাওয়া মায়ের মতো তাদের পেছনে পেছনে গজগজ করতে থাকে, আহা এমন কথাবার্তা যেন বাড়িতে জমিদারি রয়েছে। মৃত্যু তো পায়ের তলায় মাথাচারা দিচ্ছে আর এদিকে ওনার আত্মসম্মান ও ভিক্ষে নিয়ে যত-সব গালভরা কথা?'

কালু কিছু বলবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই নইলে তার বন্ধুদের ফেরার পথে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে তার অন্তর দগ্ধ হতে থাকে। খাওয়াপরার চরম দুরবস্থা তো ছিলই। তার ওপরে আজ এই ভিক্ষে নিয়ে নেওয়াতে তার মনে হতে থাকে একেবারে ঠিক যেন ভিখিরি মহল্লা হয়ে গেছে···কালুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে মনে বলতে থাকে সে, আষাঢ় মাস আর্ধেক শেষ হয়ে গেছে তবুও বৃষ্টি এল না। এখন হাঁড়িকাঠে গলা পেতেই আছি। আর অপেক্ষা করছ কেন ঠাকুর? এই দেড় পা খিচুড়ীর প্রলোভন কিসের জন্যে! এবার কোপ লাগানো আরম্ভ করে দাও না। এই ক্ষিদে আর এই ভিক্ষে দুটোই সইতে পারছি না। এবার তোমার গদা চালাতে শুরু করে দাও...' বাড়ির রোয়াকে উঠতে গিয়ে সে নিজেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। হয়তো উত্তেজনায়, ক্ষিদের জ্বালায় কিংবা অন্য কারণে মাথা ঘুরে গিয়ে থাকবে।

রাজু ভয় পেয়ে গিয়ে চীৎকার করতে থাকে, 'কোদর-ভগা, ছুটে এসো, কেউ জল আনো শিগ্‌গির। চোখ একেবারে কপালে—'

কোদর, ভগা প্রভৃতি চার-পাঁচজন পুরুষ আর ভলী, রুখি, চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক, বাড়ির সবাই বাইরে রোয়াকে ছুটে আসে।

রাজু কপালে মাথায় হাত বুলাতে থাকে, ভগা, কোদর মাথায় জল দিতে থাকে। ভলী গালি পাড়তে থাকে, নাও এবার বোঝো, বে-আক্কেলে! খুব খাওয়াতে থাকো, ভাইদের আর মায়েদের (রাজুকে) বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে, এবার নিজে মরো! লোকের তো খুব উপকার করতিস সারাক্ষণ, সে-সব নিয়ে এবার ওপরতলায় গিয়ে ওঠ। সেখানে তোর ঠাকুরদাদা (ভগবান) তোকে

রাজ-সিংহাসনে বসাবেন !'

কিন্তু ভল্পীর কথায় কেউ কান দেয় না। কেবল রুথী ফুলতোলা ঘাঘড়া পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মুখ মুচকে মৃদু হেসে সে ভল্পীকে বলে, 'নে এবার থাম দিকিনি, মরে যায় যদি তবে তোকে তো আর কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে না ! তুই কিসের জন্য এত ?… '

॥ আটত্রিশ ॥

নিঠুর আকাশ

আষাঢ়ের আকাশকে মেঘশূন্য পরিষ্কার দেখে লোকেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। দিন দিন বৃষ্টির আর বেঁচে থাকার আশা মানুষের মিলিয়ে যেতে থাকে। মানুষ পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে থাকে। যে বেঁচে ছিল তখনো সে কামনা করে, 'ঠাকুর আর তো ক্ষিদে সহ্য করতে পারছি না!···তোর কাছে মৃত্যু কি কম পড়লো নাকি? যে-কোনো একটা নিষ্পত্তি করে দে। হয় মৃত্যু, নইলে বৃষ্টি।

ওদিকে কালুর কিন্তু অন্য রকম ভাবনা হচ্ছিল, 'দেখো, ঠিক তীরে এসে তরী ডুববে, আমার মৃত্যুই হয়তো সব মাটি করে দিতে পারে নইলে— না আগে না পরে। ঠিক বৃষ্টি শুরু হবার মুখেই আমার প্রাণ নিয়ে নিয়ো।'

সত্যি সত্যি তাই যদি হয় কালুর মৃত্যুতেও শান্তি থাকবে না। বৃষ্টির পথ চেয়ে থাকতে থাকতে সে ক্রমশঃ এত অধীর হয়ে ওঠে যে মৃত্যুর কথাও ভুলে গিয়েছিল। বরুণদেব কবে নীচে নেমে আসবে আর সমস্ত ক্ষেতে বীজ বুনে দেবে। ক্ষুধার্ত পৃথিবীকে পেট ভরে খাইয়ে দেবে। ফসলে— কেবল ফসলেই সব ভরিয়ে দেবে। কিন্তু বরুণদেব নীচে নেমে এলে তবেই না এ-সব সম্ভব?···কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ গেল, আজ দ্বিতীয়া। দ্বিতীয়াতে যদি বৃষ্টি না হয় তো তৃতীয়ার দিন তো বৃষ্টি হবেই···তৃতীয়া কেটে গেল···চতুর্থীকে নিশ্চয়ই এমন চক্‌চকে পরিষ্কার থাকতে দেবে না।

কিন্তু চতুর্থীও চলে যায়···আর পঞ্চমীর দিন আকাশের দিকে চেয়ে কালু মাটিতে পা ঠুকে প্রায় ভেঙেই ফেলে পা, বৃষ্টি আর হবে না, ধ্বংসের দিন এসে গেছে দেখছি।

তবুও তার অন্তরাত্মা যেন মনের গভীরে বলতে থাকে, 'আসবে

আসবে ! পঞ্চমীও কেটে গেল সপ্তমী কিংবা একাদশীর দিন তো—'

মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আর মনের আশাও। জ্যৈষ্ঠের শেষ পনেরো দিন থেকে ধরলে দেড় মাস অবধি লম্বা হয়ে গিয়েছিল। যদিও একাদশীর দিন মেঘের দেখা পাওয়া গেল কিন্তু তেমন বিদ্যুৎ চমকাল না, অথবা মেঘ গর্জন করল না। দু-এক মুহূর্তেই সব থেমে গেল। সাথে সাথে লোকদের আশাও মরে যেতে থাকে, 'কিছু হবে না ভাই, কিছু না, এ তো এমনি এমনি তড়পাচ্ছে।'

কালুর তো ক্রমশঃ ধারণা হতে থাকে যে বৃষ্টির আর আশা করাই বৃথা...চতুর্দশীর দিন তো এতকাল কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখো দুটো বলদের জন্যে, একটা তার ও একটা রণছোড়ের। শুকনো পাতা নিয়ে আশা ছেড়ে দেয়। রাজুকেও যেতে দেয় না সে, আর অল্পক্ষণের জন্যে আমি আছি। শেষ সময়ে অন্ততঃ তুই আমার কাছে... '

রাজুর শরীরে এমন ক্ষমতা ছিল না যে তাকে সেবাযত্ন করবে। আসলে সে কালুর থেকেও বেশি অসমর্থ, দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্ষিদের জ্বালা সে বেশি সহ্য করেছে। তা ঐ বারান্দায় খেলা করতে থাকা বাচ্চা দুটোকে দেখলেই যে কেউ বলতে পারে।

কিন্তু এখন সেও ক্ষুধার তাড়নায়, জীবনের এই ভার বহনের দায়িত্ব পালনে হেরে গিয়েছিল। গাছের ডালপালা বা পাতা নিয়ে আসা ছেড়ে দেয় সে— 'মিছেমিছি ঐ বোঝা বয়ে আনা। বৃষ্টি হবার যদি হোতো তাহলে জ্যৈষ্ঠের শেষের পনেরো দিন থেকে নিয়ে এই আষাঢ় পর্যন্ত কি বৃষ্টি হতে পারত না।' সেও চুপ করে ঘরে পড়ে থাকে।

কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতাই কালু রাজুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বাড়িতে রুখী-ভলীর খুশিতে ভরা কথাবার্তা আর কোদর-ভগার অবশ-অথর্ব অবস্থার মধ্যে থাকার চেয়ে বাইরের মাঠ অনেক ভালো।

পরস্পরে না বললেও তাদের দুজনের ইচ্ছে হতে থাকে— কালু তো কল্পনায় ছবি আঁকতে শুরু করে দিয়েছিল, 'একজনে অন্য জনকে হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ঐ বটগাছের তলায় পড়ে

আছে আর হাসতে হাসতে যেন মৃত্যুর আনন্দকে উপভোগ করছে। এক সাথেই তুজনে চোখ বোজে···তাদের প্রাণ-পাখি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসে একে অন্যের সাথে ডানা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে স্বর্গের পথে রওনা···'

পরের দিন সে নিজেই তৈরি হয়ে নেয়। সেই দেড় পো খিচুড়ী জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিয়ে একটুখানি বিশ্রাম করে। বিকেল হতেই তুজনে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

কালু কোদর-ভগার কাছ থেকে বিদায় নিতে থাকে আর রাজু ছেলে তুটোকে আদর করতে থাকে— শেষের চার-পাঁচ দিন বাচ্চা তুটোকে ছেড়ে বাইরে যাবার দরকার পড়লেই রাজু তাদের আদর করত কিন্তু আজ এত বেশি আদর করতে থাকে যেন নিশ্চিতভাবে মরতে চলেছে সে। বাচ্চা তুটোর কাছ থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না রাজু।

তৈরি হয়ে রাজুর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কালু বিরক্ত হয়ে ওঠে, সে বলে, 'বউ স্বামীকে ত্যাগ করেছে, মা তার ছেলেকে ছেড়েছে আর তুই এই ভাইপোদের···'

'ওদের তো ছেড়েই দিয়েছি···আর তু-এক দিনের জন্যে— হয়তো কেবল আজকের দিনের মতো আমি অতিথি।' রাজুর ঠোঁট তুটো গুনগুনিয়ে ওঠে এবং এমনভাবে সে চলতে আরম্ভ করে যেন তাকে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে।

বাড়ির এই লোকেদের ভিড় থেকে, বিশ্বজগতের কোলাহল থেকে দূরে চলে যাবার, কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকার বাসনা ছিল তাদের কিন্তু একসাথে মরবে বলে এ পর্যন্ত বেঁচে থাকা রাজু-কালুর কাছে এই আধ মাইল পথটুকু কাটানোও মুশকিলের হতে পারত। যেতে যেতে রাস্তাতেই তাদের সব স্বপ্ন ও কল্পনার শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

শেষের কদিন থেকেই তাদের এমনি অবস্থা। আর সেই একই ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাময় একাদশীও কেটে গিয়েছিল···

সমস্তটা পথ কালু চুপ করে থাকে। হয়তো ঈশান কোণে মেঘের উঁকিঝুঁকি মারা দেখে বৃষ্টি আসার আশা করতে থাকে, 'আজ আমাবস্যার দিনেও কি বৃষ্টি পড়বে না?' কিন্তু পরক্ষণেই সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'নাঃ সব মিথ্যে আশা, সব মিথ্যে। এমন তো আগেও তিনবার মেঘ ছেয়ে এসেছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি। এবারও আমাদের মেরে ফেলবে বলেই ঠিক করেছে।' এমনিভাবেই সে মনের মধ্যে অঙ্কুরিত আশাকে নির্মূল করে দেয়। পাহাড়ের পাদদেশে পত্রবিহীন সেই বটগাছের নীচে— তাদের ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছে সে নীরবতা ভাঙে— এই সব-কিছুকেই মৃত্যু গ্রাস করছে কেবল আমাদের বেলাতেই ফাঁকি। হাঁটুতে হাত দিয়ে গাছের তলায় পড়ে থাকা শুকনো পাতার ওপরেই বসতে বসতে কালু বলে।

'জন্মানোর সময় কাকের মাংস খেয়ে এসেছিলাম কিনা তাই।' রাজুও তার পাশে বসে শুকনো পাতা জড়ো করতে করতে ব্যঙ্গ করে।

'সত্যি বলছি রাজু আমি আর এই খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। ইচ্ছে হচ্ছে আত্মহত্যা করে দেহ থেকে প্রাণ বার করে দিই।'

রাজু ঐকান্তিক ভাবেই এ পর্যন্ত তার নিজের এবং সাথে সাথে কালুর মৃত্যু চাইছিল কিন্তু এই মুহূর্তে কালুর চেহারায় যে তীব্র বেদনাবোধ এবং গলার স্বরে যে নিরুপায় হতাশা ফুটে ওঠে তা দেখে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বীভৎস ভাবে ঠেলে বেরিয়ে-আসা কালুর শরীরের হাড়-পাঁজরের দিকে তাকিয়ে থাকে সে কিছুক্ষণ। তারপর তার কোঠরাগত চোখের দিকে চেয়ে সে বলতে যাচ্ছিল, 'প্রাণ বেরিয়ে গেলে সেও এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছুটে পালাত। কিন্তু....'

কালুর সাথে তার দৃষ্টি মিলিত হতে তার সেই ফেলে-আসা শক্তি যেন দেহে ফিরে আসে। সেই হারিয়ে যাওয়া হাসি— হাসির ছায়া তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আয়ত দুচোখের কোণে যেন ফুটে ওঠে। সে কেবল বলে, 'ছিঃ, পুরুষমানুষ হয়ে…'

কালু পাতা জড়ো করা ছেড়ে দেয়। নিজের দুলো এবং সমর্থ

হাতের কনুইয়ের সাহায্যে শরীরটাকে পেছনের দিকে এলিয়ে পা দুটোকে ছড়িয়ে দেয়। জবাব দেবার জন্যে রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে— একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে শব্দ ভেসে আসে যেন, 'পুরুষমানুষ তো বটেই, কিন্তু তাতে আর কি হবে? অজন্মার সঙ্গে খিদের যন্ত্রণার সঙ্গে কি আর যুদ্ধ করা যায়, রাজু?'

রাজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড়-পাঁজরও বেরিয়ে এসেছিল। তার সেই উজ্জ্বল আয়ত চোখ কোঠরে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও কোথায় যেন তার চেহারায় অতীতের সেই লাবণ্য, সেই মধুরতা তখনো প্রকাশিত ছিল। সে বলে, 'মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে পারি যদি, তবে এই খিদের সঙ্গে কেন লড়তে পারো না কালু?'

কালুর মনের পর্দায় রাজুর সেই-সব লুকোনো দিনের স্মৃতি—তার সেই-সমস্ত বুদ্ধি-দীপ্ত কথা ভেসে উঠছিল। সে বলে ওঠে, 'এখনো তুই সেই আগের মতোই রয়ে গেছিস। এখনো সেইরকম শক্ত শক্ত জ্ঞানের কথা বলছিস— এত কষ্টের পরেও ভুলতে পারলি না সে সব?' কালুর চোখেতে কিছুটা রাগ আর বিরক্তি।

রাজু একথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। মাটির দিকে তাকিয়ে পাথর ঠুকতে ঠুকতে সে বলে, 'ঠিকই বলেছ,' তার চোখের দুকূলে অশ্রু ভরে ওঠে, টপ টপ করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

কালু মনে ব্যথা পায়। বিচলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার গলার স্বরে সেই বিরক্তি ভাবটা তখনো ছিল, 'মাটির বুকে ফসল যা-কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, জলও সব শুকিয়েছে, কিন্তু তোর চোখের জল কেবল এখনো ফুরোল না।' আর কেন কে জানে তার নিজের চোখেও জল এসে পড়ে।

'এই জীবনও শেষ হবে না।' রাজুর ঠোঁট দুটি শুধু ধ্বনিত হয়। তারপর যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে 'এবার ওঠো, ফিরে চলো,' বলতে থাকে সে, 'সমস্তই যেন শেষ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে, তাই না? চলো, দেখি কিছু ছাল-

বাকল যদি পেয়ে যাই কোথাও।'

কালু কিন্তু ওঠার বদলে আরো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মৃদু হেসে বলে, 'মানুষের জীবন নিয়ে জন্মেও অনেক দিনই তো ঘাস আর গাছের ছাল-বাকল খেলাম, কিন্তু আর— 'সে রাজুর দিকে তাকায়' 'তুই ফিরে যা, রাজু। আমি ব্যস, এখানেই আজ— ' তার মুখের দিকে চেয়ে-থাকা উৎকণ্ঠিত রাজুর কিছুটা রাগত চোখে চোখ রেখে: কালু আবার বলে, 'সত্যি বলছি, আমার দেহে আর একবিন্দুও ক্ষমতা নেই, যেন ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে এমনিভাবে পাশ ফিরে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না-ধরা গলায় বলে, 'তুই ফিরে যা...গিয়ে আমার মৃত্যুর খবর দিস সকলকে।' তারপরে আপন মনেই বিড় বিড় করে, 'কিন্তু কাকে খবর দিবি ? ঘরের বউ তো— না, যাকগে সে-সব ! মরবার সময় ওকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। দোষ তো এই পোড়া পেটের···খুব ঠিক কথা যে পেটের জ্বালাই সব নষ্টের মূল, নইলে মানুষ ততটা খারাপ নয়···' সে আবার সোজা হয়ে শোয়।.. পরিতৃপ্তির চোখে রাজুর দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে থাকে, 'ব্য···স ! যার কাছে শেষ বিদায় নেবার ছিল সে তো এখানেই—'

রাজু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। প্রবল ঝঞ্ঝায় এই বটগাছের একটা ডাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল যেন এমনিভাবে সে কালুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চোখের জলের স্রোতে ভেসে ভেসে যেতে যেতে দুটি আত্মা, দুটি প্রাণ তখন বারবার শুধু কামনা করতে থাকে, 'মৃত্যু যেন এখন এভাবেই তাদের নিতে আসে।'

কিন্তু চাইলেই যদি মৃত্যু এসে যেত তাহলে মানুষের জীবনে আর ভাবনা কি ছিল ?

একান্তভাবে কামনা করা সত্ত্বেও দুজনের কারুরই মৃত্যু আসে না···ক্লান্ত হয়ে রাজু কালুর বুকের ওপর থেকে মাথা তোলে, নিজের মনে মনেই বলে, 'অভাগীর ভাগ্যে কি আর এমন মৃত্যু লেখা আছে ?' তারপরে কালুকে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'চলো, এবার ওঠো, এভাবে

ছেলেমানুষের মতো এ কী করতে বসেছ, মনকে একটু অন্ততঃ শক্ত করো !'

'শক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু, রাজু—' কালু রাজুর মুখের দিকে তাকায়, তাকে যেন বোঝাতে থাকে, সাবধান করতে থাকে, 'এমন সুখের মৃত্যুর সুযোগ আর কখনো আসবে না কিন্তু !' তার স্বর শিথিল হয়ে ভেঙে আসে যেন শুকনো-কাঠের মতো কোনো আওয়াজ গলা থেকে আসছে।

তার চেহারা দেখে রাজু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়, 'আমাকে এমনি-ভাবে একা ফেলে রেখে চলে যাবে নাকি ?'

কালুকে সত্যিই ভয়ংকর দুর্বল, মরণাপন্ন লাগছিল ; তা দেখে রাজুর ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যাওয়া অকারণ কিছু নয়। মনে একসাথে তার অনেক চিন্তা উদিত হয়—' বটগাছের এই কচি ডগাগুলো, তাই ভেঙে নিয়ে এসে মুখে দেব কি ? অন্য কোনো গাছের— এখানে ধারে কাছে কোনো তেঁতুল গাছই নেই···বহেড়া গাছের তো কথাই ওঠে না ! কী খাওয়াবো তাহলে— হায় রে, জল নেই কোথাও যে, তাহলে তো···'

'জল' শব্দটা মনে আসার সাথে সাথেই তার মাথায় এক চিন্তা এসে যায়— কালুর দৃষ্টিও তার দুই বুকের দিকে স্থির নিবদ্ধ ছিল।

রাজু একটা গভীর নিঃশ্বাস নেয়। সে কালুর চোখে চোখ রেখে ম্লান, বিষণ্ণ কিন্তু মধুর মাদকতাপূর্ণ হাসি হাসে, বলে,—'এখানে আর কী পাবে ? আঙুলে যদি কিছু থাকতো তাহলে....' সে তার ছিন্ন কাঁচুলীতে হাত রাখে···

কে জানে কেন কালুর রক্ত-তরঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। কনুইয়ে ভর দিয়ে সে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু তার আগে রাজু নিজেই নত হয়, এগিয়ে আসে। আর....

রাজুর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে ঝরে পড়ছিল, কিংবা মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাইরে আসছিল কিনা কালু তা জানে না কিন্তু তার গলার দাহ কমে আসে এবং শরীরের ভেতরটা যে শান্ত-শীতল হয়েছে এটা সে

নিজে অনুভব করতে পারে। তবে চোখের তারায় প্রাণের স্পন্দন ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে এবং চেহারায় তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে এটা রাজুও দেখতে পায়।

ঈশাণ কোণের দিকে তাকিয়ে-থাকা কালুর চোখ হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে ওঠে, কান খাড়া হয়ে যায় আর ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়, 'কিছু কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে নাকি, রাজু?' সে উঠে বসে।

রাজুও কিছুক্ষণ কান দুটো সজাগ করে থাকে, তারপরেই···আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। কালু উঠে দাঁড়ায়, যেন পতনোন্মুখ গঙ্গাকে ধারণ করতে মহাদেব মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

উল্লাসের কারণ ছিল। ঈশাণ কোণ মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। দূর-দিগন্তে তাদের গর্জন শোনা যায়— পৃথিবীর মানুষদের এই চরম দুর্দশার জন্য বিরক্ত হয়ে অথবা খুশি হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে কিংবা আনন্দিত হয়ে···

কিন্তু যে জন্যেই গর্জন করুক-না কেন তাদের এই বিরক্তি, এই ব্যস্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা মানুষের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ, সমস্ত পৃথ্বীর জন্য মঙ্গলময়!···

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তবু কালু-রাজু বসে থাকে। আকাশের মাতামাতি দেখতে, মেঘের ছুটে আসার শব্দ শুনতে আর বৃষ্টি পড়ার প্রতিক্ষা করতে থাকে তারা— তবুও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাদের চিন্তা হচ্ছিল, 'এত সব কিছু হওয়ার পরেও যদি চলে যায় এ মেঘ তাহলে আমরা আর কীই-বা করতে পারি।'

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঐ অমৃতের ঝর্নাধারা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। বিন্দু বিন্দু করে কালুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, প্রতি লোমকূপে যেন চেতনা ফিরে আসতে থাকে, শক্তি জেগে উঠতে থাকে— এবং···

মৃত্তিকার সেই সন্তান বুঝতে পারছিল না এখন সে কী করবে— এই বৃষ্টিতে ভিজে সে আনন্দে নাচবে নাকি অবধুতের মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থির বসে থাকবে; প্রাণ খুলে গান গাইবে নাকি চোখের জলে ভেসে কাঁদবে?

এই বৃষ্টি নামাতে কালু খুশিতে উন্মাদ হয়ে ওঠে আর কালুর এই আনন্দ-উন্মাদনা দেখে রাজু আত্মহারা হয়···উদ্‌বেলিত হৃদয়কে শান্ত করতে কিছুক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে— 'এবার ওঠো, ফিরে যেতে হবে, না হলে আবার অন্ধকারে—'

কালু সুস্থ সবল মানুষের মতো উঠে দাঁড়ায়। 'অন্ধকার হলেই-বা কি হয়েছে?' রাজুর কাছে সরে এসে গাঢ় নিবিড় স্বরে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, 'আঁধার হলেই বা কি? আজ আমায় যে জীবনের পথ দেখালো—' আকাশের দিকে চেয়ে বলে, রুক্ষ নিষ্ঠুর আকাশ তো এই সবে মাত্র বর্ষালো···' আবার রাজুর দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই অন্ধকারে এমনিভাবে তাকে বিব্রত অবস্থায় ছেড়ে যাই কখনো?'

মুহূর্তের জন্যে রাজুর মনে হ'ল এ যেন কালু কথা বলছে না। সত্যিই তাই। কালু নয় তার অন্তরাত্মা—তার বিবেক কথা বলছিল।

কিন্তু কালুর এই কথাগুলো রাজুকে কিছুই যেন বিচলিত করে নি এমনি ভাব দেখিয়ে সে বলে, 'এখন চলোতো চুপ করে, লক্ষীটি। নিষ্ঠুর আকাশ বর্ষণ করেছে বলে বুঝি—' আবার কালুকে আপত্তি করতে তৈরি হতে দেখে রাজুর নিরাভরণ হাত তার মুখ চেপে ধরে। 'আমার দিব্যি রইল তুমি যদি আবার ওসব কথা কিছু বল···'

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই কালুও তার পঙ্গু হাত দিয়ে রাজুকে থামিয়ে দেয়, কথা বলতে দেয় না।

আর এদিকে মাটির বুকে, ঝোপঝাড়ের ওপরে বৃষ্টির ধারা, বাতাসের ছুটোছুটি, বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন— যেন বারো মাসের বিচ্ছেদ কাটাতে তাণ্ডব লীলা শুরু করে দেয়···

আস্তানার দিকে ফেরার পথে কালুর পা মাটিতে মৃত্যুর ছন্দে নেচে উঠছিল। আর তার ডানপাশে চলতে চলতে রাজুর মনে হতে থাকে, স্থির বিশ্বাস জন্মায়— এখন স্বয়ং যমরাজ এসে উপস্থিত হলেও তার ক্ষমতা নেই যে এই মানুষটিকে মারতে পারে, ধরিত্রীর বুক থেকে মুছে দিতে পারে।